বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা : জল

# বিজ্ঞান অন্বেষক

ISSN 2582-5674
RNI : WBBEN/2003/11192

২১ সংখ্যা ৫, ৬
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর : ২০২৪
মূল্য : ১০০ টাকা

www.bigyananneswak.org.in
whts : 7980121478/9143264159

# পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার

ক্যাস্পিয়ান সাগর *(৩, ৯২, ৬০০ বর্গ কিমি., ২১১ মি. গড় গভীরতা)*

মালানা সাগর *(তেলেঙ্গানা, কৃত্রিম জলাধার, ২২.৬ কিমি. লম্বা)*

সর্দার সরোবর ড্যাম *(গুজরাট, ১২১০ মি. লম্বা, ১৬৩ মি. উচ্চতা)*

ভেমবানাদ লেক *(কেরালা, ২০৩৩ বর্গ কিমি. লম্বা)*

বৈকাল হ্রদ, রাশিয়া ৩১,৭২২ বর্গ কিমি.

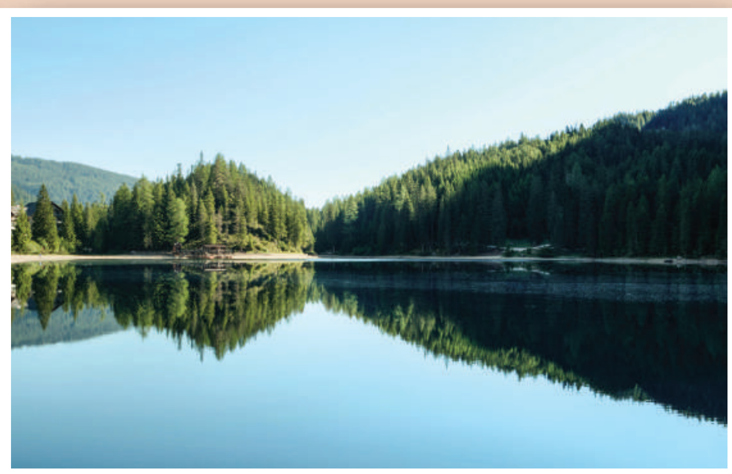

ধেবর হ্রদ, রাজস্থান ৮৭ বর্গ কিমি.

# বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

**প্রবীর বসু**



সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দনসুরভি দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার কান্তি নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাজদার, উজ্জ্বল কান্তি রায়, রিঙ্কু দাস, মোহা: গোলাম হামজা (রাহুল), কিঞ্জল বিশ্বাস

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্করকুমার নাথ, দীপককুমার দাঁ, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতিম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা, সৌমেন বিশ্বাস, সমীর নাগ



: website :
www.bigyananneswak.org.in/
ssu2011.com/bigyananneswak
e-mail :
bigyanannesak1993@gmail.com.
Mobile & Whatsapp No.
9830676330 / 9143264159/7980121478



প্রচ্ছদ : সুদীপ্ত জানা

পরিকল্পনা : টিম বিজ্ঞান অন্বেষক


## আমাদের কথা

'ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

## জল

প্রাণের সম্ভার সৃষ্টির মূলে রয়েছে জল। জল ছাড়া জীবন অসম্ভব। সেই জীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য জল নিয়ে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার এবারের বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা।

পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় শতকরা ৭৪ ভাগ জল দ্বারা আবৃত। পৃথিবীর ১০০ ভাগ জলের ৯৭.৬ ভাগ লবণাক্ত আর ২.৪ ভাগ স্বাদুজল। পৃথিবী পৃষ্ঠে জলের পরিমাণ ১৪৬ কোটি ঘন কি.মি.। পৃথিবীর মিষ্টি জলের উৎসে নদীবাহিত জলের পরিমাণ ৪২ হাজার ৭০০ ঘন কি.মি. এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ২১ ঘন কি.মি.। কিন্তু এই বিশাল জল ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর ৩১ টি দেশের প্রায় ৪৬ কোটি মানুষ মারাত্মক জল সংকটের মুখে। ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতসহ ৪৮ টি দেশের ২৮০ কোটি মানুষ চরম জল সংকটের মুখে পড়তে চলেছে। রাষ্ট্রসংঘের মতানুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ ৪২০ কোটি মানুষ প্রতিদিন মাথাপিছু ৫০ লিটার জল পাবে না।

ইন্ডিয়ান ওয়াটার রিসোর্স সোসাইটি সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন রাখছে — জল সম্বন্ধে সচেতন হও, জলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক হও। এক প্রতিবেদনে তারা জানিয়েছেন ভারতের ২০২৫ সালের মধ্যে জলের প্রয়োজন হবে ১০২৫ ঘন কি.মি.। গার্হস্থ্য কাজকর্মে লাগবে ৫২ ঘন কি.মি., কৃষিতে লাগবে ৭৭০ ঘন কি.মি. এবং নানান শিল্পে লাগবে ২২৪ ঘন কি.মি.।

আমাদের দেশে ভূগর্ভস্থ জল পাওয়ার সম্ভাবনা ৪৫০ ঘন কি.মি. এবং উপরিভাগ থেকে জল পাওয়া যেতে পারে ৭০০ ঘন কি.মি.। কিন্তু ভারতের প্রায় সব নদীর জলই দূষিত। বিশেষ করে গঙ্গা ও তার শাখা-প্রশাখার তীরে জনবসতি যেমন নিবিড়, তেমনি কল-কারখানা প্রচুর। শহর, শহরতলি কল-কারখানা থেকে যে দূষিত জল নির্গত হয় তার পরিমাণ ৩ হাজার কোটি লিটার। এই বিষাক্ত জলের অতি সামান্যই পরিশোধিত হয়। বাকি সবটাই নদীপথে বাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ে। ফলে নদীর জল গ্রহণযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য নয়।

এছাড়াও সারা পৃথিবীর ১৬ শতাংশ মানুষ ভারতের অধিবাসী এবং ১৫ শতাংশ গবাদি পশু ভারতে পালিত হয়। এই কারণে গার্হস্থ্য এবং কৃষিকাজে প্রাপ্তি জলের ৮০ শতাংশ ব্যয়িত হয়। এছাড়া রয়েছে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির মত সমস্যা।

এই জল সংখ্যাতে উল্লেখযোগ্য লেখা গুলি হল- জলের উৎস, জলচিত্র, জল চক্র, জল বিভাজিকা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জল সংকট ও সমাধান, অচিন জল, জল বাহিত রোগ, জলের জীব বৈচিত্র্য, জলাশয় ও খাল বিল, জল যোদ্ধাদের কাহিনি, জলের অপচয়, জল মাটির বিপন্নতা, আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ,বৃহৎ নদী পরিকল্পনা, ছোট-বড় সহ প্রায় ৪০ টিরও বেশি প্রবন্ধ বিভিন্ন লেখকদের কাছ থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি। কিন্তু জলের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

আমরা সচেষ্ট থাকবো যাতে জল বিষয়ে আরো কোন সংখ্যা আগামী দিনে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবলম্বন করে আমরা বুঝেছি জল মোটেই সহজিয়া নয়, বরং বেশ জটিলতায় ভরা। জল ছাড়া জীবনের স্পন্দন থেমে যাবে। সভ্যতার চাকা হয়ে যাবে গতিহীন। তাই প্রাপ্তিযোগ্য জলের সঠিক সমীক্ষা করে চাহিদা অনুযায়ী সর্বাধিক অনুকূল বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জলের অপচয় এবং দূষণ প্রতিহত করতে হবে।

আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে এই পৃথিবীকে সুন্দর এবং বসবাসযোগ্য রাখতে জল বন্টন ব্যবস্থাকে সুষম রাখতেই হবে।


ISSN 2582-5674

9 772582 567004

*বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।*

*অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯*

*যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪/৮২৪০২৪৪৩২৩*

# সূচি


| | |
|---|---|
| পৃথিবীর জলের উৎস কোথায় | বিমান নাথ ০৩ |
| জলসঙ্কট ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণ | তপন সাহা ০৫ |
| ভারতবর্ষে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ : ফিরে দেখা | রাহুল রায় ০৯ |
| পৃথিবীর জলসঙ্কট ও প্রতিকারের উপায় | অরুণ কুমার পাল ১৩ |
| জলের অভাব মেটাবে, পৃথিবীর গর্ভে সদ্য আবিষ্কৃত জলভান্ডার | অজয় কুমার মজুমদার ১৬ |
| জলের ফুটপ্রিন্ট বা পদচিহ্ন | প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত ১৭ |
| জলের ওপর দস্যুবৃত্তি | এ.কে.এম. বজলুল হক ২০ |
| জল ও মাটির বিপন্নতার ধারাবাহিকতা | মানস প্রতিম দাস ২১ |
| জলের অপচয় | অনুপম পাল ২৪ |
| মানবদেহ, স্বাস্থ্য ও জল | অর্কজিৎ সেন ২৮ |
| স্মার্ট ওয়াটার | অসীম বসাক ৩২ |
| জল বিভাজিকা প্রকল্প কী ও কেন | প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত ৩৪ |
| জল ও নগরায়ণ | সৌমেন বিশ্বাস ৩৭ |
| জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি | রাজা রাউত ৪১ |
| অবাক পৃথিবীর জলকথা | পান্না মানি ৪৩ |
| খাল, বিল ও জলাশয় : গুরুত্ব ও সংরক্ষণ | সূর্যেন্দু দে ৪৫ |
| জল ও জলাশয় সংরক্ষণ | ঋতুশ্রী চক্রবর্তী ৪৮ |
| অচিন জল | বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯ |
| ভারী ধাতু জনিত জলদূষণ : একটি সমীক্ষা | শতাব্দী দাশ ৫১ |
| পরিবেশে ফ্লোরাইড দূষণ | সায়ন ভট্টাচার্য ৫২ |
| বিষয় : আর্সেনিক দূষণ : একটি সাক্ষাৎকার : ড. দীপঙ্কর চক্রবর্তী | সাক্ষাৎকার : মানস প্রতিম দাস, অনুলিখন : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ৫৪ |
| জল : খাচ্ছি, কিন্তু ভাবছি কি? | সোমা বসু ৫৮ |
| গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণ এবং ধানগাছে আর্সেনিকের সঞ্চয় : ক্ষতিকর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের উপায় | সায়ন ভট্টাচার্য ৬০ |
| সবুজ রসায়নে জলের ভূমিকা | তপন দাস ৬৪ |
| জলসংকট ও আমাদের ভবিষ্যৎ | পারমিতা রাহা ৬৭ |
| রঙিন জলের বিপদ | অসীম বসাক ৬৯ |
| সাগর দ্বীপের জলের সংকট : একটি কথিকা | সুদীপ্তি মিশ্র হালদার ৭২ |
| পুরুলিয়ার ফুসফুস সাহেববাঁধ আজ সংক্রমিত | নয়ন মুখার্জী ৭৩ |
| আর্সেনিক দূষণ সমীক্ষা | বিজ্ঞান দরবারের প্রতিবেদন ৭৫ |
| নাটিকা : জলের অপচয় বন্ধ কর | ছাত্র-ছাত্রীদের কলম ৭৯ |
| জল ও জলাশয়ের সংরক্ষণ : আইনের চালচিত্র | বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ৮০ |
| উত্তপ্ত পৃথিবী এবং পার্বত্য হিমবাহ সংকোচন | প্রবীর বসু ৮২ |
| জলবাহিত রোগ ও তার প্রতিকার | সুশীল বিশ্বাস ৮৩ |
| প্রাণীদের জলবাহিত রোগ ও তার প্রতিকার | তাপস সরকার ৮৬ |
| প্রাণী সম্পদ উৎপাদনে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা | প্রদীপ কুমার দাস ৮৮ |
| প্ল্যাঙ্কটন : জলের প্রাণ কণিকা | তুষার কান্তি নাথ ৯০ |
| জল : রোগে আর বিশ্বাসে | ভবানী প্রসাদ সাহু ৯৪ |
| একটি নিছক অবাস্তব গল্প | নির্মাল্য দাশগুপ্ত ৯৬ |
| পরিবেশ বান্ধব : প্রতিমা নিমজ্জন-বিজ্ঞান বনাম শাস্ত্র | সতীনাথ ভট্টাচার্য ৯৮ |
| পৃথিবীর জলসম্পদ ও তার বন্টন | রাজদীপ ভট্টাচার্য ১০০ |
| আজকের দৃষ্টিতে পূর্ব ভারতের তিনটি বড় নদী পরিকল্পনা | দেবাশিস সেনগুপ্ত ১০২ |
| জলের জন্য সমর্পিত চার যোদ্ধা | প্রকাশ দাস বিশ্বাস ১০৮ |
| জল নিয়ে কবিতা | জগন্ময় মজুমদার, বিজ্ঞানবন্ধু ভট্টাচার্য, সুনীল শর্মাচার্য, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতাভ দে ১১৫ |
| বাংলায় জল নিয়ে বইপত্র | সুরাজ পাল ১১৬ |

লেখক পরিচিতি ১২০

**বি মা ন  না থ**

# পৃথিবীর জলের উৎস কোথায়?

আমরা বলি 'সসাগরা' পৃথিবী। আমাদের গ্রহের উপরিভাগের এক বড় অংশ যে জলে ঢাকা, এই নামেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই সাগর, তাই দূর থেকে আমাদের গ্রহ নীল রঙের দেখায়। এটিই সৌরমণ্ডলের একমাত্র গ্রহ যেখানে জল রয়েছে তরল অবস্থায়। তাই নীল রঙ দেখে দূর থেকেও চেনা যায় আমাদের গ্রহ। এই জলের অস্তিত্বই আমাদের গ্রহের বাতাবরণ করে তুলেছে প্রাণের অনুকূল। জল না থাকলে প্রাণের উদ্ভবের জন্য দরকারি রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্ভব হত না। তাই জল যে আমাদের পৃথিবীর এক জরুরি উপাদান তা আলাদা করে বলে দিতে হয় না। এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে এই জল কোথা থেকে এসেছে?

পৃথিবীর জল কি জন্মমুহূর্ত থেকেই ছিল? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য গ্রহে জলের পরিমাণ তুলনায় কম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব একটা সহজ নয়। কারণ আমাদের প্রতিবেশী গ্রহগুলোতে বর্তমান জলের পরিমাণ মেপে সেগুলোর জন্মের সময় কত জল ছিল তা আন্দাজ করা কঠিন। যেমন, মঙ্গল গ্রহে বর্তমানে জল শুধু বরফের আকারে রয়েছে, এবং আগে জল ছিল বলে অনেকের ধারণা হলেও তেমন প্রমাণ এখনও মেলেনি। শুক্রগ্রহে বর্তমান জল শুধু বাষ্পের আকারেই রয়েছে, এবং খুব সম্ভবত জন্মের পর অনেক জল বেরিয়ে গেছে বাষ্পের আকারে। অর্থাৎ, এখন যা দেখা যাচ্ছে তা থেকে আগে কেমন ছিল তা বোঝা কঠিন।

তবে একটি পরীক্ষায় এই 'শুরু থেকেই ছিল' প্রস্তাবটি নিয়ে মনে সংশয় জাগে। আমরা জানি যে জলের অণুতে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। আমরা এও জানি যে হাইড্রোজেনের পরমাণুকেন্দ্রে যে প্রোটন থাকে তার সঙ্গে একটি নিউট্রন জুড়ে দিলে আমরা পাই ডিউটেরিয়াম। এই পরমাণুর রাসায়নিক চরিত্র হাইড্রোজেনের মতোই, ওজনে একটু বেশি, এই যা তফাৎ। তাই হাইড্রোজেনের বদলে ডিউটেরিয়াম দিয়েও জল তৈরি করা যায়। এর নাম ভারি জল। পৃথিবীতে যে জল পাওয়া যায় তার কিছু সামান্য অংশ হল এই ভারি জল। খুব কম, তবে নগণ্য নয়। দশ লক্ষ জলের অণুর মধ্যে প্রায় দেড়শো অণুতে হাইড্রোজেনের বদলে ডিউটেরিয়াম মজুত থাকে। এই অনুপাতটি লক্ষণীয়। কারণ সূর্য থেকে যে সৌরঝড় পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাতে দশ লক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে মাত্র কুড়িটি ডিউটেরিয়াম থাকে। বৃহস্পতি এবং শনিগ্রহের ক্ষেত্রেও অনুপাতটি এই মাপের। পৃথিবীর মোট জলের মধ্যে ভারি জলের অনুপাত এই তুলনায় অনেক বেশি। প্রায় সাতগুণ বেশি। তাই পৃথিবীর জল সৌরমণ্ডলের ইতিহাসের শুরু থেকেই ছিল বলে মনে হয় না। সেরকম হলে এই অনুপাতটি সৌরমণ্ডলের সর্বত্র একই মাপের হত।

তাহলে কি পৃথিবীর জলের সিংহভাগ পরবর্তীকালে এসে জমা হয়েছে? সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে— কোথা থেকে এসেছে এই জল? সেই বাইরে থেকে আসা জলের উৎস কোথায়? ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই প্রশ্নটির এক সম্ভাব্য উত্তরের সন্ধান দিয়েছিলেন কার্ল সাগানের ছাত্র ক্রিস্টোফার চাইবা। তিনি বলেছিলেন ধূমকেতুর কথা। প্রাচীন কালে এক সময় ছিল যখন হঠাৎ করে উল্কা এবং ধূমকেতু এসে পড়ার হার বেড়ে গিয়েছিল। সে প্রায় তিনশো আশি কোটি বছর আগেকার কথা। পৃথিবীর জন্মের প্রায় সত্তর-আশি কোটি বছর পরে এসেছিল এই উল্কা-ধূমকেতু-বৃষ্টির যুগ। বিজ্ঞানীরা এই সময়কালের নাম দিয়েছেন 'লেট হেভি বম্বার্ডমেন্ট' যুগ। পৃথিবীর জলবায়ুর দৌলতে অবশ্য তার বুক থেকে সেই অশান্ত যুগের চিহ্ন হারিয়ে গেছে। জল এবং বাতাসের যৌথ প্রভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে হতে সেযুগের গহ্বরগুলোর এবড়োখেবড়ো অংশগুলো আজকাল আর দেখা যায় না। কিন্তু চাঁদে জল নেই, বায়ুও নেই। সেখানে সেই সময়কার উল্কাপাতের চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। চাঁদের গহ্বরের পরিসংখ্যান থেকে প্রাচীন কালে ধূমকেতু এসে পড়ার হার আন্দাজ করে ক্রিস্টোফার চাইবা হিসেব করে বলেছিলেন যে পৃথিবীর জলের এক বড়ো অংশ সেই সময় এসে থাকতে পারে।

*আইলেন্দে উল্কাপিণ্ডের একাংশ। এটি Carbonaceous meteorite এর একটি উদাহরণ এবং এরকম উল্কাপিণ্ড থেকেই পৃথিবীর জলের এক বড় অংশ এসেছে বলে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা।*

এক একটা ধূমকেতু আসলে ধুলোবালিতে মোড়া বরফের চাঁই। এগুলো সৌরমণ্ডলের আদিম যুগে নেপচুনের বাইরের অংশে জড়ো হয়েছিল। সৌরমণ্ডলের ভেতরের দিকে যেমন বুধ-শুক্র-পৃথিবী এবং মঙ্গলের মতো পাথুরে গ্রহ জন্ম নিয়েছে, তেমনি বাইরের দিকে সৃষ্টি হয়েছিল গ্যাস ভর্তি গ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুনে। সূর্যের কাছে উত্তাপ বেশি বলে সৌরমণ্ডলের ভেতরের দিকে বরফ থাকাও সহজ ছিল না। সূর্যের তাপ এবং সৌরঝড়ের চাপে এই অঞ্চলের জল এবং বরফ বাষ্প হয়ে বাইরের দিকে চলে গিয়েছিল। নেপচুনের বাইরে যা কিছু ছিল সেগুলো মিলে মিশে গ্রহ তৈরি করতে পারেনি। ফলে আদিম যুগে সেই ঠাণ্ডা অঞ্চলে যে বরফ জমেছিল তা থেকে জন্ম নিয়েছে এই ধূমকেতুগুলো। এমনিতে এগুলো নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকেই সময় কাটায়। তবে মাঝে মাঝে ভারি গ্রহগুলোর কাছে এলে মহাকর্ষের প্রভাবে ধূমকেতু চলে আসতে পারে সৌরমণ্ডলের ভেতরের দিকে। তখন পৃথিবীর কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা থাকে। টক্করও লাগতে পারে। সুতরাং সেই ধূমকেতুগুলো থেকে পৃথিবীতে এসে জল জমা হতেই পারে।

তবে এক্ষেত্রেও ডিউটেরিয়াম এবং হাইড্রোজেনের অনুপাত নিয়ে খটকা লাগে। হ্যালি, হেল-বপ ইত্যাদি কয়েকটি ধূমকেতুতে এই অনুপাত মাপা হয়েছিল, এবং তা ছিল পৃথিবীর জলের ক্ষেত্রে অনুপাতটির দ্বিগুণ। সেরকমই বা হবে কেন? তবে এক ধরনের (carbonaceous chondrites) গ্রহাণুর ক্ষেত্রে এই অনুপাত পৃথিবীর সঙ্গে মিলে যায়। মনে হতে পারে গ্রহাণুগুলো পাথুরে, সেগুলোতে জলের পরিমাণ কম। তবে একেবারেই যে নেই তা নয়। এবং প্রাচীন কালে উল্কাপাতের সঙ্গে এসে পড়া গ্রহাণুর সংখ্যা যদি বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তার পিঠে করে এখানে জল জমা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ধরনের উল্কার ওপর গবেষণা চলছে আজকাল।

এই ধারণার সঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার ফল মিলে যায়। যেমন, চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে বরফ আবিষ্কারের গবেষণা। সেই বরফে ডিউটেরিয়াম এবং হাইড্রোজেনের অনুপাত পৃথিবীর মাপের সঙ্গে মেলে। অর্থাৎ, চাঁদ এবং পৃথিবীর জলের বৈশিষ্ট্য এই দিক দিয়ে সমান গোত্রের। সেই জন্য পৃথিবীতে জলের উৎসের কথা বলতে গিয়ে চাঁদের বরফের উৎসের কথা আসবেই। ২০১৬ সালে এক দল বিজ্ঞানী হিসেব করে জানিয়েছিলেন যে চাঁদে বরফের মূল উৎস খুব সম্ভবত গ্রহাণু।

এদিকে আরেকদল বিজ্ঞানী যে গ্যাস থেকে সৌরমণ্ডলের জন্ম হয়েছে সেই গ্যাসে কত পরিমাণ জল ছিল তা হিসেব করার চেষ্টা করে চলেছেন। আমরা যদিও জেনেছি যে পৃথিবীতে ডিউটেরিয়ামের পরিমাণ অনুপাতে সৌরঝড়ের তুলনায় বেশি, তাঁদের মতে এই হিসেবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমন হতে পারে যে সূর্য যখন নক্ষত্র হিসেবে জন্ম নিয়েছিল তখন সেই তরুণ সূর্যের আলোর প্রভাবে এক জটিল প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে ডিউটেরিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা আরও বলেছেন যে সৌরমণ্ডলের আগে এই জায়গায় যে গ্যাস ছিল তাতে বেশ কিছু পরিমাণে বরফ ছিল। এবং তাঁদের হিসেব অনুযায়ী সেই বরফের অনেকটাই গ্রহ নির্মাণ পর্যায়ের পরেও টিঁকে ছিল। সেই থেকে পৃথিবীর সাগরের জলের এক বড়ো অংশ তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন তাঁরা। তবে এই বিষয়ে এখনো প্রচুর গবেষণা বাকি রয়ে গেছে। ভবিষ্যতের গবেষণা থেকে জানা যাবে এই তথ্যের যথার্থতা।

তবে পৃথিবীতে যে শুরু থেকেই বেশ পরিমাণে জল ছিল সেই ধারণার সাপেক্ষে কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক হিলস অঞ্চলে বিজ্ঞানীরা কিছু প্রাচীন জারকনের সূক্ষ্ম টুকরো পেয়েছেন যাতে জৈব কার্বনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই পাথরগুলোর বয়স প্রায় ৪১০ কোটি বছর। অর্থাৎ পৃথিবীর জন্মের মাত্র ৫০ কোটি বছরের মধ্যেই জৈব কার্বন দেখা দিয়েছিল। আরেকভাবে বলা যায় যে, আমরা সাধারণত প্রাণের উদ্ভবের সময়কাল সম্পর্কে যা ভেবে থাকি তার অনেক আগেই প্রাণের জন্য দরকারি উপাদান তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল আমাদের পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, প্রাচীন উল্কাবৃষ্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ সেই অশান্ত পরিবেশ প্রাণের পক্ষে ছিল প্রতিকূল। জ্যাক হিলসে পাওয়া জারকনের টুকরো সেই ধারণা বদলাতে বাধ্য করছে। শুধু প্রাণের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে নয়, এই প্রাচীন পাথরের গবেষণা পৃথিবীতে জলের অস্তিত্বের কথাও জানান দেয়। কারণ জল ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই সেই সময়কার জৈব কার্বন বলে দেয় যে তখন পৃথিবীতে জল ছিল। উল্কাবৃষ্টির যুগের অনেক আগেই।

আরেকটি সাম্প্রতিক আবিষ্কারও বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছে। ব্রাজিলে একটি নদীর উপকূলে একটি ছোটো হিরের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল ২০০৮ সালে। কানাডার অ্যালবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিকদের চোখে পড়েছিল এই অদ্ভুত দেখতে পাথরের টুকরোটি। পরে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে এই পাথরে রিংউডাইট নামক একটি খনিজ রয়েছে। এই খনিজ সাধারণত মাটির নীচে এক গভীর স্তরে পাওয়ার কথা, প্রায় ৫০০ কিলোমিটার নীচে। এই খনিজটির বৈশিষ্ট্য হল এই যে অন্যান্য খনিজের তুলনায় এতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। ফলে এই আবিষ্কারের সূত্র ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে পৃথিবীর অন্দরমহলে জল থাকতে পারে। মাটির প্রায় ৫০০ কিলোমিটার নীচে যদি এই খনিজ প্রচুর পরিমাণে থাকে তাহলে সেখানে জল থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে। সেই জল হয়তো সহজে পাওয়া যাবে না, কারণ তা এই খনিজের মধ্যে লুকোনো থাকে। তবে পৃথিবীতে মোট কত পরিমাণ জল রয়েছে সেই হিসেবে কাজে লাগতে পারে এই আবিষ্কার।

এই সব গবেষণা থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে জলের উৎস সম্পর্কে যেমন আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত, পৃথিবীতে ঠিক কত পরিমাণ জল রয়েছে সেই নিয়েও আরও গবেষণা দরকার। অথচ এই জল যে আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য তা আর নতুন করে বলে দিতে হয় না। আমরা যেভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জলের অপব্যবহার করে থাকি তাতে আমাদের ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পায়, পৃথিবীতে জলের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা নেই। যে জল আমাদের এই গ্রহকে বাসযোগ্য করে তুলেছে, এবং যে জলের জন্য দূর থেকে সুপরিচিত নীল রঙ দেখেই আমাদের পৃথিবীকে চেনা যায়, সেই জলের ভবিষ্যতের জন্যও যে আমরাই দায়ী তা ভুললে চলবে না। না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের মার্জনা করবে না কখনও।

## আগুন নেভাতে জল

আগুন নেভাতে গেলে বা আগুন যাতে আরো ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য আগে দরকার অক্সিজেনকে আটকানো। অক্সিজেন তো জ্বলতে সাহায্যই করে। দেখতে হবে সে যেন জ্বলতে আর মদত না দিতে পারে। আর দরকার তাপ কমানোর, যা জ্বলছে তা জ্বলতে থাকার মতো যেন তাপ না পায়। আগুনে জল ঢাললে দুটো কাজই হয়। জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে জল বাষ্প হয়ে যায়। সেই বাষ্প আগুন লাগার জায়গাটাকে ঢেকে ফেলে। অক্সিজেন আগের মতো আসতে পারে না। তার উপর ঐ জলের বাষ্প হতে যে প্রচুর তাপের দরকার হয় তা ওই আগুন থেকেই পেয়ে যায়। তাতে যে জিনিসটা জ্বলছে তা জ্বলতে থাকার মতো তাপ আর পায় না। ফলে আস্তে আস্তে আগুন নিভে যায়।

তবে এখানে একটা কথা। তেল বা ঐ জাতীয় কোনো জিনিসে যদি আগুন লাগে তাহলে কিন্তু ওখানে জল দেওয়ার আগে একটু ভাবতে হবে। কেননা, তেল হাল্কা বলে জলের উপর ভেসে আগুনকে আরো ছড়িয়ে দিতে পারে। আবার বৈদ্যুতিক তারের কোন গোলযোগে যদি আগুন লাগে তাহলেও জল ঢালার আগে ভাবতে হবে। কেননা, সাধারণভাবে যে জল আমরা ব্যবহার করি, নিত্যনৈমিত্য দেখছি তা বিদ্যুৎ পরিবাহী। জল ঢাললে বিদ্যুৎ সংযোগে বিপদ হতে পারে।

*—যুগল কান্তি রায়*

ত প ন  সা হা

# জল সংকট ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

### সারা পৃথিবী আজ জল সংকটের সম্মুখীন

২০২৩ সালের মার্চ মাসে নিউ ইয়র্ক শহরে রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত 'ইউনাইটেড নেশনস ২০২৩ ওয়াটার কনফারেন্স'—এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল যে পৃথিবীর প্রায় দুশো কোটি মানুষ মল দ্বারা দূষিত জল পান করে, অর্ধেক মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের কোন ব্যবস্থা নেই এবং ২৯ শতাংশের সাবান ও নিজস্ব বাড়ির জল দ্বারা হাত ধোয়ার কোন সংস্থান নেই। ৫০ শতাংশ বিদ্যালয়ে সাবান ও জল দিয়ে হাত পরিষ্কার করার ব্যবস্থাই গড়ে ওঠেনি। প্রতিদিন ৫ বছরের নীচে ৭০০ শিশুর দূষিত জল, অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবস্থা ও দুর্বল স্বাস্থ্যবিধির কারণে মৃত্যু ঘটে। ঐ সম্মেলন উল্লেখ করেছে জল সংকট এমন পর্যায়ে পৌছাচ্ছে যে ২০৩০ সালের আগেই চাহিদার তুলানায় ৪০ শতাংশ জল পাওয়া যাবে না। এই রকম জল সংকট সত্ত্বেও মনুষ্যকৃত আবহাওয়া পরিবর্তনের মাধ্যমে জলচক্রের ঋণাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়েই যাচ্ছি যা জল সংকটকে আরো তীব্রতর করছে। অনেক দেশের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ জলের উৎস নিজের ও আশেপাশের দেশের জলের বাষ্পীভবনের উপরে নির্ভর করে যাকে আমরা 'সবুজ জল' বা 'Green Water' হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি, জঙ্গল, মাটি, প্রাণিকুল ধ্বংস সহ সার্বিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন ঘটিয়ে মনুষ্যকুল এই 'সবুজ জল'-এর উৎসেরও বিনাশ ঘটাচ্ছে।

২০২২ সালের জুলাই মাসের ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট-এর 'Aqueduct' প্রকল্পের রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর ১৭টি দেশ যেখানে এক-চতুর্থাংশ মানুষের বাস তাঁরা সেখানে এখন খুব চরম মাত্রার (Extremely High) জল সংকটের মধ্যে বাস করছে, ঐ অঞ্চলে সেচ, শিল্প-কারখানা ও শহরে দেশের মোট ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণের ৮০ ভাগ জল প্রতি বছর খরচ হয়ে যাচ্ছে, ফলতঃ বৃহৎ অংশের গ্রামীন অঞ্চলের মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ৪৪টি দেশ যেখানে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার বাস সেখানেও জলের অভাব দেখা যাচ্ছে, এই অংশে প্রতি বছর ব্যবহারযোগ্য সরবরাহকারী জলের ৪০ শতাংশ ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে। মধ্য, পূর্ব ও উত্তর আফ্রিকার ১৭টি দেশের মধ্যে ১২টি দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জল সংকটের দেশ হিসাবে চিহ্নিত। ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনকে জলশূন্য শহর হিসাবে ঘোষণা করতে সরকার বাধ্য হয়েছিল। বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত জল সংকট পৃথিবীর অর্থনীতিকে বিপদাপন্ন করে তুলবে, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে আভ্যন্তরীন উৎপাদন ৬ থেকে ১৪ শতাংশ হ্রাস পাবে।

২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলের চাহিদা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়ে দূষিত বর্জ্য জল ও আবর্জনা নিক্ষেপের ফলে নদীনালা, জলাশয় সহ অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ জলাধার ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ টন বর্জ্য নদীনালা ও সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ১.৫ কোটি থেকে ১.৮ কোটি ঘনমিটার ব্যবহারযোগ্য ভূপৃষ্ঠস্থ জলভাড়ার প্রতি বছর জীবাশ্ম জ্বালানী উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় দূষিত হয়। ব্যবহার পরবর্তী ৮০ শতাংশ অপরিশোধিত দূষিত বর্জ্য জল পরিবেশে (নদীনালা, জলাশয়, সমুদ্র ও কৃষিক্ষেত্র) নিক্ষেপ করা হয়। নিম্ন আয়ের দেশগুলির শিল্প ও শহর নির্গত ময়লা জলের মাত্র ৮ শতাংশ পরিশোধন করা হয়। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলির মোট বর্জ্য জলের ২৮ শতাংশ পরিশোধন করা হয়ে থাকে। জলের অভাবের কারণেই অনেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও অভিবাসন ক্রমাগত বাড়ছে। জলের অভাব অভিবাসন-এর একটি মূল কারণ। অনেক ক্ষেত্রেই জলের সমস্যা কোন একটি দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, কিছু অঞ্চলে এটি সামাজিক ও আন্তর্দেশীয় রাজনীতির অন্তর্ভূক্ত। আন্তর্দেশীয় নদীগুলি থেকে ৬০ ভাগ ব্যবহারযোগ্য জল পাওয়া যায় এবং প্রায় ৫৯২টি আন্তর্দেশীয় ভূগর্ভস্থ জলস্তর আছে। বর্তমান পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অবস্থা এবং বর্তমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫০ সালে প্রায় ৯৭০ কোটি হওয়ার সম্ভাবনাকে বিবেচনার মধ্যে রেখে **আন্তর্দেশীয় জলচুক্তিগুলি যথেষ্ট রূপায়ণযোগ্য হওয়া উচিৎ।**

*বৃষ্টির জল সংরক্ষণ*

### ভারতে জলের সংকট

২০২৩ সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রসংঘ 'Interconnected Disaster Risks Report 2023' শিরোনামে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে গণবিলুপ্তি, ভূগর্ভস্থ জল হ্রাস, পাহাড়ের বরফ গলন, মহাকাশে আবর্জনা, অসহ্য গরম ও অবীমাকৃত ভবিষ্যৎ ছয়টি পরিবেশগত বিপর্যয় উল্লেখ করতে গিয়ে চিহ্নিত করেছে যে ইন্দো-গাঙ্গেয় অববাহিকায় ভূগর্ভস্থ জল হ্রাস ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে যাতে ২০২৫ সালের মধ্যে অনেক স্থানে ভূগর্ভস্থ স্তরে জল পাওয়া যাবে না। চিন ও আমেরিকা মিলিতভাবে যে পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে তার থেকেও বেশি ব্যবহারের জন্যে ভারতবর্ষ ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারে পৃথিবীর পরিমাণগত দিক দিয়ে এক নম্বর দেশ। ২০২২ সালের জুলাই মাসের ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট-এর 'Aqueduct' প্রকল্পের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে

চূড়ান্ত জল সংকটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপরের দিকে থাকা ১৭টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান হচ্ছে ১৩ তম।

২০১৮ সালের জুন মাসের ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশের বাস কিন্তু পৃথিবীর মোট জলসম্পদের মাত্র ৪ শতাংশের অধিকারী। ২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না। আগামী ২০৩০ সালে ৪০ শতাংশ মানুষের বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান থাকবে না। আমাদের দেশের ৬০ কোটি মানুষ চরম জল সংকটের সম্মুখীন হবে। আমাদের দেশের ৭০ শতাংশ জল দূষিত। পরিমাণগত ও গুণগতভাবে বিশুদ্ধ জলের অভাবে প্রতি বছর প্রায় দু-লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। ৭৫ শতাংশ বাড়ির ভিতরে জলের কোন সংস্থান নেই। ৮৪ শতাংশ গ্রামীণ বাড়ীতে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের কোন সংস্থান নেই। ২০২০ সালেই নিউ দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এবং হায়দ্রাবাদ সহ ২১টি শহরে ভূগর্ভস্থ জল নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তাতে প্রায় ১০ কোটি মানুষ ভুক্তভোগী হবে। ২০৫০ সালে জল সংকটের কারণে দেশের আভ্যন্তরীন উৎপাদন ৬ শতাংশ হ্রাস পাবে। জলের অভাবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্নের সম্মুখীন হবে। ২০১৯ সালেই গ্রীষ্মের সময় চেন্নাইতে ১ লিটার জল ৪০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত ভারতেও রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে জল সম্পদের বৈষম্য চরমভাবে দেখা যায়। ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে কোন গ্লেসিয়ার নির্ভর নদী নেই, প্রায় সমস্ত নদী বৃষ্টির জল ও ভূগর্ভস্থ জলের উপরে নির্ভরশীল, তাই জল সংকটও অনেক তীব্র। অনেক ক্ষেত্রেই নদীতে অল্প জল থাকায় আন্তঃরাজ্য নদীগুলির জল বন্টন নিয়ে প্রতিনিয়ত বিবাদ লেগেই আছে। পশ্চিমবঙ্গ গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার নির্ভর গঙ্গা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ও অনেক নদনদীর অবস্থান এবং এখনও বেশিরভাগ অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর দ্রুতহারে নামলেও টিউবওয়েল থেকে এখনও জল পাওয়া যায়। তাই এই রাজ্যে জলের অভাব বা সংকটের অনুভূতি বোঝার মত মানসিকতা গড়ে ওঠেনি।

রকেটগতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্ত ক্ষেত্রে জলের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সারা পৃথিবীতেই মাথাপিছু মোট জল পাওয়ার পরিমান কমছে। ১৯৫১ সালে ভারতে মাথাপিছু জল পাওয়ার পরিমাণ ছিল ৫১৭৭ ঘনমিটার। ২০০১ ও ২০১১ সালে হ্রাস পেয়ে হয় যথাক্রমে ১৮১৬ ও ১৫৪৫ ঘনমিটার। ২০১৯ সালের ভারত সরকারের 'সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন'-এর রিপোর্ট উল্লেখ করেছে যে ২০২১ ও ২০৩১ সালে মাথাপিছু জল পাওয়ার পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১৪৮৬ ও ১৩৬৭ ঘনমিটার। কোন দেশে বা রাজ্যে বা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যদি মাথাপিছু জল পাওয়ার পরিমাণ ১৭০০ ঘনমিটারের নীচে হয়, সেই জায়গায় জলের অভাব সৃষ্টি হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়, যদি মাথাপিছু জল পাওয়ার পরিমাণ ১০০০ ঘনমিটারের কম হয় সেই অঞ্চলটি তীব্র জল সংকটের অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয়। পৃথিবীতে প্রাত্যহিক মাথাপিছু জল ব্যবহারের বৈষম্য প্রকট। এশিয়ায় এই পরিমাণ হচ্ছে গড়ে ৮৭ লিটার, আফ্রিকায় ৮৪ লিটার, ব্রিটেনে ৩৩৪ লিটার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৮৭ লিটার। ভারতবর্ষে অধিকাংশ অঞ্চলে এই পরিমাণ হচ্ছে ৫০-৬০ লিটার। ভারতবর্ষে একমাত্র কলকাতা পৌরসভা তার অন্তর্গত শহরবাসীদের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত প্রতিদিন মাথাপিছু ১৩৫ লিটারের মাত্রার থেকেও বেশি পরিমাণ জল সরবরাহ করে, সেই পরিমাণ হচ্ছে গড়ে প্রায় ২০২ লিটার।

জল সংকট মোকাবিলায় চাই সমন্বিত জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Integrated Water Resources Management)-র পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ। নদী-নালা, পুকুর, হ্রদ, খাল-বিল ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ, ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ, বৃষ্টির জল, বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার ও বর্জ্য জলকে পরিশোধন করে ব্যবহার ইত্যাদি সমস্ত জলসম্পদকে অন্তর্ভূক্ত করেই সমন্বিত জল সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে।

### জল সংকট মোকাবিলায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যক্তিগত বা সামাজিক স্তরে রূপায়ণ করা সম্ভব। কুয়োর জল ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় হরোপ্পা সভ্যতায়, ঐ সময় থেকেই পরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার শুরু হয়। যদিও তার অনেক আগে থেকেই পুকুর খননের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও অজান্তে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার শুরু হয়। সিন্ধু সভ্যতায় অধিকাংশ বাড়িতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ করা হত। শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে নদী, পুকুর ও বিভিন্ন জলাশয় থেকে পরিশোধন করে জল ব্যবহারের প্রচলন শুরু হলেও উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে তা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে নলকূপ খনন করে হ্যান্ডপাম্প ও মোটর চালিত পাম্পের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল আহরণ বৃদ্ধি রকেটগতিতে বৃদ্ধি পায়। পরিশোধিত ভূপৃষ্ঠস্থ জল ও নলকূপ খননের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল প্রাপ্তির ফলে পুকুর খনন বা অন্যান্য পদ্ধতি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও কুয়োর দ্বারা ভূগর্ভস্থ জলের যে পরিমাণ দৈনন্দিন কাজে ও শিল্পকারখানায় ব্যবহার হত তা দ্রুতহারে হ্রাস পেতে শুরু করে। কুয়ো ও পুকুরের জল দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। অধিকাংশ কুয়ো গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে পরিত্যক্ত হতে শুরু করে।

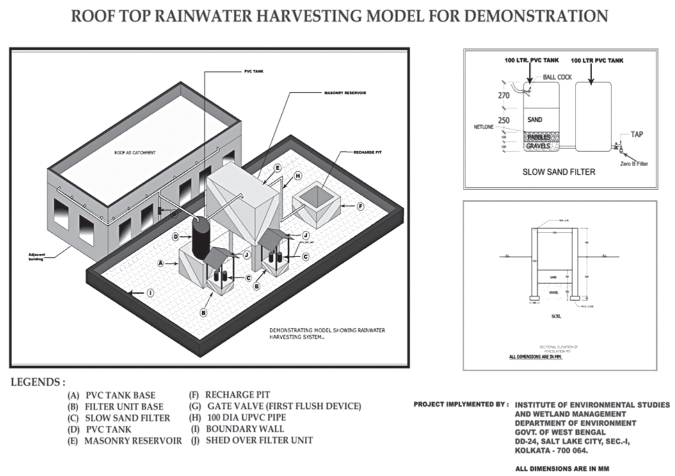


*ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ : একটি মডেল*

### জল সংকট মোকাবিলায় কুয়ো ও পুকুর সংস্কার এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ব্যবহার

ইতিমধ্যেই অধিকাংশ কুয়ো বুজিয়ে ফেলা হয়েছে এবং পুকুর বা

অন্যান্য জলাশয়গুলির অধিকাংশই বাড়িঘর তৈরি বা অন্যান্য উন্নয়নের নামে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে বা প্রাত্যাহিক ব্যবহার ও সংস্কারের অভাবে তার জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের বেঁচে থাকার স্বার্থে এখনও যে সমস্ত কুয়ো ও পুকুর, নদনদী, খালবিল সহ সমস্ত ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ টিকে আছে তাদের সংস্কার ও দূষণ মুক্ত করে ব্যবহারযোগ্য রাখতে হবে। আমাদের দেশে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ ব্যবহারযোগ্য জলের মোট পরিমাণ হচ্ছে ১২৫৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার, সারা বছর বৃষ্টি ও তুষারপাতের জলের পরিমাণ হচ্ছে তার থেকে প্রায় তিনগুণেরও বেশি, প্রায় ৪০০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। জল সংকট থেকে মুক্তির অন্যতম একটি উপায় হিসাবে বৃষ্টি ও তুষারপাতের এই বিশাল পরিমাণ জলকে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং প্রাত্যহিক কাজে, শিল্পকারখানা ও সেচের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সঠিক ব্যবহারের পরিকল্পনা করা উচিৎ।

## বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও ব্যবহার

বসবাসের বাড়ি সহ কলকারখানা, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ যে কোন বাড়ির ছাদ এবং চাষের জমি, রাস্তাঘাট, মাঠঘাট, পার্ক ইত্যাদি জায়গায় যে বৃষ্টির জল পড়ে সেই জলকে যে কোন জলাধারে সংগ্রহ করে প্রত্যক্ষ ব্যবহার বা ঐ জলকে কৃত্রিম উপায়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে পাঠিয়ে জলস্তর বৃদ্ধি করার পদ্ধতিকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (Rainwater Harvesting) বলা হয়।

## কেন বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রয়োজন

- ক্রমঃবর্ধমান জলের চাহিদা মেটানো
- রাস্তাঘাটে জল জমা হ্রাস ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ
- ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি
- ভূগর্ভ জলের দূষণ (আর্সেনিক, ফ্লুরাইড, অতিরিক্ত লবণ ইত্যাদি) হ্রাস ও জলের গুণ বৃদ্ধি।

## সারা বছরের মোট বৃষ্টির পরিমাণের কত শতাংশ বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা যেতে পারে :

| বৃষ্টির জল পড়ার জায়গার ধরন | সারা বছরে মোট বৃষ্টির পরিমাণের কতটা সংগ্রহ করা যেতে পারে। |
|---|---|
| যে কোন বাড়ির ছাদ | ৮০% - ৯০% |
| বাঁধানো রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার ইত্যাদি | ৬০% - ৮০% |
| বাঁধানো নয় এমন রাস্তাঘাট, মাঠঘাট, চাষের জমি, ইত্যাদি | ২০% - ৩০% |

সেচের জন্য প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টির জল ব্যবহার ও প্রাকৃতিক উপায়ে ভূগর্ভস্থ স্তরে জলের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য গ্রামাঞ্চলে চাষের জমি, রাস্তাঘাট, মাঠঘাট ইত্যাদি জায়গা থেকে সংগ্রহ করার প্রযুক্তি :

Gully Plug, Gabion Structure, Contour Bund, Check Dams, Cement Plugs, Nala Bunds, Digging Ponds etc.

*বৃষ্টির জল সংগ্রহের পাত্র*

## ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বসবাসের বাড়ি সহ কলকারখানা, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ যে কোন বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে সেই জলকে যে কোন জলাধারে সংগ্রহ করে প্রত্যক্ষ ব্যবহার বা ঐ জলকে কৃত্রিম উপায়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে পাঠিয়ে জলস্তর বৃদ্ধি করার পদ্ধতিকে ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (Roof Top Rainwater Harvesting) বলা হয়।

**ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহের জন্য প্রাথমিকভাবে কি জানা প্রয়োজন :**

- ২০% - ৩০% ছাদের চরিত্র—টিনের চাল, টালির ছাদ, ঢালাই ছাদ, ইত্যাদি। আলকাতরার চটের ছাদ ও এসবেসটারের ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা উচিত নয়।
- ছাদের ঢাল কোন দিকে।
- নির্ধারিত ছাদ থেকে কত পরিমাণ বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং তার মাটির গঠন।
- ছাদে কোন গাছ আছে কি? অথবা আশাপাশের গাছের পাতা ছাদে পড়ে কি?
- বাড়ির কাঠামোর বাইরে বাড়ির সীমার মধ্যে জলাধার নির্মাণের জন্য কোন যায়গা আছে কি? থাকলে কত পরিমাণ আয়তনের জলাধার নির্মাণ করা যেতে পারে?

১০০ বর্গমিটার আয়তনের ছাদ থেকে সারা বছর কত বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা যেতে পারে :

যদি, ছাদের আয়তন = ১০০ বর্গমিটার

বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ = ১.৫ মিটার (১৫০০ মিলিমিটার) (দক্ষিণবঙ্গের বার্ষিক গড়)

১০০ বর্গমিটার আয়তনের ছাদে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হবে ঃ

১০০ বর্গমিটার × ১.৫ মিটার = ১৫০ ঘনমিটার

১৫০ ঘনমিটার × ১০০০ লিটার = ১৫০০০০ লিটার

(১ ঘনমিটার জলাধারে ১০০০ লিটার জল ধারণ ক্ষমতা থাকে)

১০০ বর্গমিটার আয়তনের ছাদে সারা বছরের মোট ১৫০০০০ লিটার পরিমাণের যে বৃষ্টিপাত হয় তার যদি ৬০ শতাংশ সংগ্রহ করা যায় তাহলে ১০০ বর্গমিটার ছাদ থেকে সারা বছরে ৯০০০০ লিটার বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে একটি মানুষের প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য জলের প্রয়োজন ১৩৫ লিটার :

| উদ্দেশ্য | লিটার |
|---|---|
| পানের জন্য | ৩ |
| রান্নার জন্য | ৪ |
| স্নানের জন্য | ২০ |
| শৌচকর্মের জন্য | ৪০ |
| জামাকাপড় ধোয়ার জন্য | ২৫ |
| বাসনপত্র ধোয়ার | ২০ |
| বাগানের পরিচর্চা | ২৩ |
| মোট | ১৩৫ |

**জলাধার নির্মাণ**

কোন কাজের জন্য অর্থাৎ পানীয় জল/রান্না/বাসনপত্র ধোয়া/ জামাকাপড় ধোয়া/ শৌচাকর্মের জন্য ব্যবহার/বাগানের পরিচর্চা/কোন স্থানে বা স্থান বিশেষত্ব ইত্যাদির এবং কত পরিমাণ বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হবে তার উপরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মানের নকশা নির্ভর করে।

একটি উদাহরণ :

যদি পরিবারের সদস্য সংখ্যা হয় : ৫

১ জনের জন্য প্রতিদিন পানীয় জল (৩ লিটার) ও রান্না (৪ লিটার)-র জন্য প্রয়োজন = ৭ লিটার

৫ জনের একটি পরিবারের প্রতিদিন পানীয় জল ও রান্নার জন্য প্রয়োজন হবে :

৫ জন × ৭ লিটার = ৩৫ লিটার

৫ জনের একটি পরিবারের ৩৬৫ দিনে অর্থাৎ ১ বছরে পানীয় জল ও রান্নার জন্য প্রয়োজন হবেঃ ৫ জন × ৭ লিটার × ৩৬৫ দিন = ১২৭৭৫ লিটার।

অর্থাৎ সারা বছরের রান্না ও পানীয়ের জন্য ৫ জনের পরিবারে যে জলের চাহিদা তা একটি দশ হাজার লিটারের জলাধার স্থাপন করলেই ১৫ বর্গমিটার ছাদের আয়তন থেকেই বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে তা মেটানো যাবে। কিন্তু রান্না ও পানীয়ের জন্য বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে :

- ছাদের যে অংশ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হবে সেই অংশটিতে যাতে অন্য অংশের জল না এসে মেশে তাই একটি ইটের গাঁথনি বা অন্য কিছু দিয়ে সীমানা আলাদা করতে হবে এবং মসৃণ হতে হবে যাতে সহজেই পরিষ্কার করা যায় এবং মেঝেতে কোন রং দেওয়া যাবে না।
- ছাদে কোন পাখির বাসা বা গাছ থাকা চলবে না।
- বৃষ্টির জল নির্গমনের পাইপ (রেইন ওয়াটার পাইপ) ও তার ফার্স্ট ফ্লাশ সিস্টেম রাখতে হবে।
- ছাদে রেইন ওয়াটার পাইপের মুখে জালি লাগাতে হবে যাতে ছাদের থেকে পাতা, কাগজ বা অন্য কোন আবর্জনা যেন পাইপে প্রবেশ না করে।
- সমস্ত ওভার ফ্লো পাইপ ও এয়ার ভেন্টে মশা বা পোকামাকড় রোধী জাল লাগাতে হবে যাতে কোন মশা বা অন্যান্য পোকামাকড় জলাধারে প্রবেশ না করতে পারে।
- এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ছাদ সপ্তাহে ২-৩ দিন পরিষ্কার করতে হবে। পারলে প্রতিদিন পরিষ্কার করা যেতে পারে এবং মাসে একদিন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধোয়াতে হবে ও ঐ ধোয়ার জল যাতে জলাধার বা ট্যাঙ্কে না ঢুকতে পারে ফার্স্ট ফ্ল্যাশ সিস্টেম খুলে রেখে বৃষ্টির জল বাইরে ফেলে দিতে হবে।
- বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরে প্রথম ১০ মিনিটের জল ফার্স্ট ফ্ল্যাশ সিস্টেম খুলে রেখে বাইরে ফেলে দিতে হবে, তারপর ফার্স্ট ফ্ল্যাশ সিস্টেম বন্ধ করে জলাধারে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করতে হবে।
- অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য জলাধারের সাথে একটি স্লো স্যান্ড ফিল্টার লাগানো যেতে পারে এবং ফিল্টার থেকে পরিশোধিত জল নির্গমনের কলের মুখে একটি জিরো-বি ফিল্টার লাগানো যেতে পারে। পরিশোধনের অন্য প্রচলিত পদ্ধতিগুলিকেও অবলম্বন করা যেতে পারে।
- নিম্নে একটি নকশা ও ছবি দেওয়া হল।

রান্না ও পানীয়ের জন্য যে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই সাবধানতা অন্য কারণে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে ব্যবহারের জন্য সেই ধরনের সাবধানতার প্রয়োজন নেই। তবুও প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু সাবধানতা নেওয়া যেতে পারে। বাসনপত্র ও জামাকাপড় ধোয়া, বাড়িঘর বা কোন শিল্পকারখানার বয়লারে যদি বৃষ্টির জল ব্যবহার করা হয় তাতে প্রয়োজন অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়।

**জলাধারের ধরন :** পিভিসি ট্যাঙ্ক, ইটের ট্যাঙ্ক, কংক্রিটের ট্যাঙ্ক, আর সি সি রিং দিয়ে প্রস্তুত ট্যাঙ্ক, ফেরো সিমেন্টের ট্যাঙ্ক, মটকা, বালতি, পুকুর সহ যে কোন জলাধার বা জলাশয়। জলাধার মাটির নীচে বা উপরে স্থাপন করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী এর আয়তন হবে।

**বিঃ দ্রঃ-** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাদের মধ্যেই বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে জমানো হয়, এটা কখনোই করা উচিৎ নয় এতে ছাদের ক্ষতি হয়। প্রত্যেক বাড়িতে বৃষ্টির জল নির্গমনের জন্য রেইন ওয়াটার পাইপ থাকে সেই পাইপ দিয়ে বৃষ্টির জল যখন নীচে নামে সেই পাইপ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে যে কোন ধরণের জলাধারে সংগ্রহ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে সমস্ত বিজ্ঞান মেলাতেই বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মডেল নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রদর্শন করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাদে বৃষ্টির জল জমানোর মডেল দেখা যায়, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের এই ক্ষেত্রে সংশোধন করার জন্য সচেতন করতে হবে।

রা হু ল রা য়

# ভারতবর্ষে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও ব্যবহার— ফিরে দেখা

*মানবজাতির জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান জল। অতীতে বরফগলা জলে পুষ্ট নদীগুলোই ছিল মানুষের ব্যবহার্য জলের প্রধান উৎস। আর নদী থেকে দূরে যে সব মানুষ বাস করত, তারা মাটির নিচের জল বা ভৌমজল ব্যবহার করত। তারা বেঁচে থাকার জন্য বৃষ্টির জল ধরে রাখত। ভারতবর্ষে ভৌমজলের ব্যবহার বহু শতাব্দী ধরেই চলে আসছে। ব্যক্তি মানুষ, চাষি অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ ঘর-গেরস্থালির কাজে এবং চাষের জমিতে জলসেচ করতে খোলা কুয়ো-র (open wells) ভৌমজল ব্যবহার করেছে। কুয়োর জল চাষের জমিতে সেচের জন্য ব্যবহার করা হয় বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই। জলসেচের কাজে বড় পুকুর বা জলাধার (tank) এবং খাল-এর জল কম পাওয়ায় চাষিরা বহুদিন ধরেই এই কুয়োর জল ফসল ক্ষেতে সেচের কাজে দেয়। কিন্তু এখানে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, এরকম জলসেচের পেছনে কোন পরিকল্পনাই নেই। প্রতিটি অঞ্চলেই জলের চাহিদা মেটানো হয়েছে অন্য জায়গার কথা না ভেবে।*

*বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহারের ইতিহাস বস্তুত পৃথিবীতে মানুষের আসার দিন থেকে শুরু হয়েছে। ইতিহাসে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের খোঁজ মেলে। বৃষ্টির জল যেখানে পড়বে, সেখানেই তাকে ধরে রাখাকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বলে। বাড়ির ছাদে বৃষ্টির যে জল পড়ে, এটা তাকেও ধরে রাখাও বলে, আবার ভূপৃষ্ঠে যে বৃষ্টির জল পড়ে, তাকে ধরে রাখাও বলে। এর মোদ্দা কথাটি হল প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটাকে মূল্য দেওয়া। বৃষ্টির জল যেখানে ধরে রাখা হচ্ছে, সেটি যাতে নির্মল, দূষণমুক্ত থাকে, সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ মূলত মানুষ-বৃষ্টি- ভূমির এক চমৎকার ঐকতান।*

## খ্রিস্টপূর্ব সময়ে ভারতবর্ষে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

বহুকাল আগে থেকেই নানান উপায়ে ভারতীয়রা বৃষ্টির জল ধরে রাখত। গুজরাটে কচ্ছ জেলার ভাচাউ তালুকের খাদিরবেট-এ ধোলাভিরা অঞ্চল খুঁড়ে জানা গেছে যে, হরপ্পা সভ্যতার (খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০) যুগেও মানুষ বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি জানত। ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আমলে পাহাড়বাসী সাধুরা বর্তমান মুম্বাই-এর এলিফ্যান্টা গুহার পাথরের দেওয়ালের গায়ে গর্ত করে সারি সারি ছোট চৌবাচ্চা বানিয়েছিল। ওড়িশার রাজা খারবেল (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দ) জৈন সাধুদের থাকার জন্য উদয়গিরির পাহাড় কেটে যে গুহা বানিয়েছিলেন, তার পাথরের দেওয়ালের গায়ে বড় গর্ত করে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। ওড়িশার চন্দ্রগিরি পাহাড়েও এই একই জিনিস দেখা গেছে। এসব গুহার ছাদে বৃষ্টির যে জল পড়ত, তা গুহার ছাদ থেকে পাতলা ধাতুর তৈরি সরু নালি দিয়ে গুহার গর্তে বা চৌবাচ্চায় এসে জমত। এই জলে সাধুদের সারা বছরের জলের চাহিদা মিটত।

*জল সংরক্ষণ : প্রাচীন পদ্ধতি*

## খ্রিস্ট-পরবর্তী সময়ে ভারতে জল সংরক্ষণ

### সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দ

সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দে চোল এবং পাণ্ড্য রাজারা পাহাড়ের পাদদেশে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য বড় জলাধার বানিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে মাদুরাই-এ এক মন্দিরে বেশ কয়েকটি বিশাল বড় জলাধার রয়েছে। এই জলাধারে বৃষ্টির জল ধরা হত। আশেপাশের মানুষ এই জলাধার থেকে তাদের ঘর-গেরস্থালির জলের চাহিদা মেটাত। প্রাচীনকালে তামিলনাড়ু-তে মানুষ নানান কাজের জন্য, যেমন— পানীয়, স্নান, ঘরের কাজ ইত্যাদি, আলাদা করে জল পুকুর বা জলাধারে ধরে রেখে দিত। দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছু মন্দির আছে, যাদের পাথরের দেওয়ালের গায়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কথা খোদিত রয়েছে। এসব শিলালিপি থেকে জলাধারের নানান তথ্য, যেমন— জল ব্যবস্থাপনা এবং জলাধারের সংস্কার সম্পর্কীয় তথ্য পাওয়া যায়। উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে তামিলনাড়ুর রামানাথপুরম জেলায় শতাব্দী-প্রাচীন বেশ কিছু অতি ভাঙাচোরা জলাধারের খোঁজ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজাদের আমলে (১৩৩৬-১৬১৪ খ্রিস্টাব্দ) অনেক জলাধার তৈরি করা হয়েছিল। এই জলাধারে মূলত চাষের কাজে জলসেচ করার জন্য জল ধরে রাখা হত। ব্রিটিশ প্রশাসক স্যার টমাস মুনরো-র (মাদ্রাজ-এর গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮২০ সালের মে মাসে) লেখায় এই জলাধারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের কম বৃষ্টিপাতযুক্ত রাজস্থানে বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহার করার নানান পদ্ধতি দেখা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে মেওয়ার রাজত্বে রাজস্থানের চিতোর-এ আরাবল্লি পাহাড়ের ওপরে গড়ে ওঠে চিতোর দুর্গ। এখানে না আছে কোন নদী, না পাওয়া যায় ভৌমজল। তাহলে জলের চাহিদা মিটত কীভাবে? দুর্গটি বানানোর সময়ে প্রচুর জলাধার তৈরি করা হয়েছিল বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য। তাই হাজার পঞ্চাশেক সেনা কোনওরকম জলকষ্ট ছাড়াই এখানে বছরের পর বছর কাটিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে বর্তমান চিতোর শহরে ভয়ানক জলের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত চিতোর দুর্গে এর বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি।

এখানে একটি কথা বলার, অতীতে ভারতবর্ষে রাজারা কদাচিৎ নিজেরা জলাধার বানিয়ে দিতেন, বা জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। বদলে, আর্থিক সাহায্য করে জনসাধারণকে জল সংক্ষণের নানাপ্রকার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতেন। রাজারা বিভিন্ন নামে আর্থিক সহায়তা করতেন, যেমন— দশবন্ধিনী ইনাম, দশবন্ধ, কাতু কোদাজ ইত্যাদি। বিজয়নগরের রাজারা এই সমস্ত আর্থিক সাহায্য করে মানুষকে

জলাধার তৈরিতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। মধ্যভারতে গোণ্ড রাজারাও এ-ধরনের আর্থিক সহায়তা করে মানুষকে জল সংরক্ষণের জন্য সুচারু পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ও তার ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ দিতেন। জল সংরক্ষণে মানুষকে উৎসাহিত করতে আর্থিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত ও চুক্তির স্বচ্ছতা বজায় রাখতে, রাজারা অনেক সময়েই নানান মন্দিরের পাথরের দেওয়ালে তা খোদাই করে লিখে রাখতেন। এসব লেখা থেকে সাধারণ মানুষ জানতে পারত যে, কোন্ কোন্ অঞ্চল বা গ্রামের জন্য, কে কে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এতে রাজাদের কাছ থেকে জল সংরক্ষণের কাজের জন্য যারা আর্থিক সাহায্য পেত, তা গড়ে তোলার জন্য তাদের ওপর এক সামাজিক চাপ থাকত। সে ব্যর্থ হলে বা না করলে, মানুষ রাজাকে জানাত। ভাবলে বিস্ময় জাগে, বর্তমান সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো অতীতে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে কী সুন্দর চালু ছিল।

**নবম শতাব্দী ও পরবর্তীকালে বৃষ্টিজল সংরক্ষণ**

মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল উত্তরপ্রদেশ এর সাতটি এবং মধ্যপ্রদেশ এর ছয়টি জেলা নিয়ে গঠিত। অঞ্চলটি খরাপ্রবণ। নবম শতাব্দী থেকে এখানে জল সংরক্ষণ করা শুরু হয়েছে। চান্দেলা রাজবংশ বুন্দেলখণ্ডে ৮৩১ থেকে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ অব্দি রাজত্ব করেছে। ইতিহাসের নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রায় প্রতিজন রাজাই জল সংরক্ষণের জন্য নানান মাপের জলাধার বানিয়েছিলেন। চান্দেলা রাজবংশের চতুর্থ রাজা রাহিলা (রাজত্বকাল ৮৮৫-৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) মাহোবা-র কাছে রাহিলাসাগর নামে এক বড় জলাধার গড়িয়েছিলেন। খাজুরাহো শিলালিপি (১০৫৯ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা গেছে, খাজুরাহো গ্রামের চারিপাশে রাজা যশো বর্মণ (রাজত্বকাল ৯২৫-৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) বেশ কিছু বড় পুকুর খুঁড়িয়েছিলেন। বর্ষার জল এখানে ধরে রাখা হত। রাজা কীর্তি বর্মণ (রাজত্বকাল ১০৬০-১১০০ খ্রিস্টাব্দ) মাহোবা ও চান্দেরি-তে কীর্তিসাগর নামে এবং বুধিয়াতাল নামে কালানইয়ারা-তে জলাধার নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাজা মদন বর্মণ (রাজত্বকাল ১১২৮-১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ) অনেকগুলো জলাধার তৈরি করান, যেমন— মদনসাগর নামে টিকমগড় জেলার নারায়ণপুরা-র আঘারা ও জাতারা-তে দুটি বড় জলাশয় এবং ওই একই নামে নিজের রাজবাড়ি থেকে চার কিলোমিটারের মধ্যে আর একটি জলাধার। রাজা মদন বর্মণ-এর প্রধানমন্ত্রী গদাধর দেড্ডু গ্রামের সীমানায় গাঁথুনি দিয়ে একটি বড় জলাধার গড়িয়েছিলেন। রাজা পার্মারদিদেবা (রাজত্বকাল ১১৬৫-১২০২ খ্রিস্টাব্দ) অজয়গড় নামক স্থানে পারমালা জলাধার তৈরি করিয়েছিলেন। রাজা বীর বর্মণ (রাজত্বকাল ১২৪৫-১২৮৫ খ্রিস্টাব্দ) এর পত্নী কল্যাণীদেবী অজয়গড়ে একটি জলাধার তৈরি করান। এখানে তিনি একটি কুয়োও খুঁড়িয়েছিলেন। অজয়গড়ে প্রাপ্ত স্তম্ভ ও দেওয়াল লিপি (epigraph) থেকে জানা যায় যে, কল্যাণীদেবী এখানে যে জলাধারটি তৈরি করিয়েছিলেন, সেটি সমুদ্রের মতো বিশাল বড় ছিল। কলিঞ্জর শিলালিপি জানাচ্ছে যে, রাজা বীর বর্মণও পুকুর কাটিয়েছিলেন এবং জলাধার তৈরি করিয়েছিলেন। রাজা দশরাজ শাণ্ডিল্যতাল নামে এক বড় জলাশয় তৈরি করিয়েছিলেন। চান্দেলা রাজত্বে বুন্দেলখণ্ডের প্রতিটি গ্রামে জলাধার তৈরি করানো হয়েছিল। এখনও এমন অনেক জলাধার রয়েছে, যাদের ইতিহাস জানা যায়নি।

*চৌবাচ্চায় বৃষ্টির জল সংগ্রহ*

চান্দেলা রাজা পার্মারদিদেবা-র মৃত্যুর (১২০২ খ্রিস্টাব্দ) পর বুন্দেলা রাজবংশের রাজত্ব শুরু হয়। বুন্দেলা রাজারাও তাঁদের রাজত্বে অনেকগুলো জলাধার নির্মাণ করিয়েছিলেন। আগের রাজত্বকালের বেশ কিছু জলাধারের সংস্কারও করিয়েছিলেন। রাজা বীরসিংহ দেও-১ সিঁদুরসাগর ও বীরসাগর নামে দুটি জলাধার তৈরি করান। রাজা সুজন সিংহ ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে আদার এর কাছে সুজনসাগর নামে এক জলাধার গড়িয়েছিলেন। বুন্দেলা রাজত্বের পর এই অঞ্চলে ১৭২৯ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহ অব্দি মারাঠা আধিপত্য ছিল। মারাঠি রাজত্বকালে জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজই হয়নি। মারাঠা আধিপত্য অবসানের এটি অন্যতম কারণ।

রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত উদয়পুর। মহারাজা উদয় সিং ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরকে মেওয়ারের রাজধানী করেন। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য শুরু থেকেই উদয়পুরে জলের ঘাটতি ছিল। মেওয়ার-এর অতীত শাসকদের প্রথম কাজটিই ছিল জল সরবরাহের জন্য কৃত্রিম জলাধার বা হ্রদ তৈরি করা। ফলে উদয়পুরে ও তার আশেপাশে তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো হ্রদ বা জলাধার, যেমন— ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ছোট মাদর, বড় মাদর, রংসাগর ও কুমারিয়া কা তালাব; স্বরূপসাগর (১৮৪৪), ফতেসাগর (১৬৭৮, পরে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে এটির সংস্কার করা হয়), গোবর্ধন বিলাস এবং উদয়সাগর। প্রধানত নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এই হ্রদগুলো তৈরি হয়েছিল। এরা একে অন্যের সাথে যুক্ত। কোনও একটি হ্রদের জল উপচে গেলে, তা অন্য হ্রদে গিয়ে পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন কোন জল নষ্ট হয় না, অন্যদিকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে জল শোধিত হয়ে যায়। এই হ্রদগুলোর জলের প্রাথমিক উৎস দুটি নদী— আয়াদ ও সিসামা। শেষে সমস্ত হ্রদের জল গিয়ে মেশে বেদাচ নদীতে। বেদাচ নদী গঙ্গা জলনির্গম প্রণালীর এক অংশ। তাই উদয়পুরের এই হ্রদগুলোর ভারতের জাতীয় নদী-ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

মহারাষ্ট্রের নাগপুর গোণ্ড (আঠারো শতাব্দের সূচনায়), ভোঁসলে (১৭৩৯- ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং ব্রিটিশ রাজত্বে ছিল গাছগাছালিতে ভরা এক সবুজ অঞ্চল। নাগপুরের মধ্য দিয়ে সারা বছর বয়ে যেত নাগ ও পিলি এই দুই নদী। এখানে অনেক জলাভূমিও ছিল। আর ছিল দশটি হ্রদ। নাগ নদীর উৎপত্তি আমবাজারি হ্রদ এবং তেলাংখেড়ি জলাধার থেকে। পিলি নদীর উৎসস্থল গোরেওয়াদা হ্রদ। এই দুই নদীর উৎসস্থলই নাগপুর পৌরসভার অন্তর্গত। ভোঁসলেদের আমলে এখানে পুরানো

মিলিটারি ছাউনি এলাকায় কালো ব্যাসল্ট পাথরের বেশ কয়েকটি ছোট জলাধার তৈরি হয়েছিল। এখানকার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য জলাশয়গুলো হল পান্ধারবড়ি (ভিদে), সোনেগাঁও এবং দহেগাঁও।

ভারতবর্ষের তেলেঙ্গানা রাজ্যে অবস্থিত ওয়ারাঙ্গাল জেলা। অঞ্চলটি মালভূমি অধ্যুষিত। আজ থেকে প্রায় ৯০০ বছর আগে কাকাটিয়া রাজারা ঐতিহাসিক ওয়ারাঙ্গাল নগরের পত্তন করেন। কাকাটিয়া রাজারা প্রথম এই মালভূমি অঞ্চলে চাষের কাজে জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এঁরা অনেক জলাধার, জলাশয় এবং ছোট কুন্তা তৈরি করিয়েছিলেন জল সংরক্ষণের জন্য। এসবের অস্তিত্ব আজও রয়েছে। সমগ্র অঞ্চলে বৃষ্টির জলে পুষ্ট ৩৫০০টি বড় জলাধার এবং ৪২টি মাঝারি আকারের জলাধার আছে। প্রধান দুটি জলাধার হল রামাপ্পা এবং পাখাল লাকনাভরম। কাকাটিয়া রাজারা চেয়েছিলেন প্রতিটি ফোঁটা বৃষ্টির জলকে ধরে রাখতে। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর জলবিভাজিকার উচ্চতম অংশকেই রাজারা বেছে নিয়েছিলেন জল সংরক্ষণের প্রধান অঞ্চল হিসেবে। নদী অববাহিকা জুড়ে আড়াআড়ি ভাবে অনেকগুলো জলাধার তৈরি করিয়েছিলেন। নদীর উচ্চগতির অতিরিক্ত জল এতে ধরে রাখা হত। নদী অববাহিকায় বড় আকারের মাটির বাঁধ দিয়ে জলাধার গড়ে তোলা হয়েছিল। এসব জলাধার থেকে জল নিতে জলদ্বার (sluice gate)-এর ব্যবস্থা ছিল। এ ধরনের জলবাহী পরিকাঠামো ভৌমজলস্তরকেও পুষ্ট করত। কাকাটিয়া রাজারা অনেক মন্দির গড়ে সেখানেও জলাধার তৈরি করান। কোনেরু-তে এরকমই এক মন্দিরের জলাধারের জল আজও মানুষ ব্যবহার করে। মূলত পানীয় এবং চাষের ক্ষেতে জলসেচের কাজে এসব জলাধারের জল ব্যবহৃত হয়। প্রযুক্তির দিক থেকে এই জলাধারগুলো এত উন্নত ছিল যে, এগুলোতে কখনও পলি জমে যাওয়ার (sedimentation) সমস্যা দেখা দেয়নি। এরকমই প্রাচীন দুটি জলাধার, ভদ্রকালী এবং ওয়াড্ডেপাল্লি-র জল, আজও মানুষ ব্যবহার করে। প্রধানত গ্রীষ্মকালের জলকষ্ট মেটাতে এই জলাধার দুটিতে জল ধরে রাখা হয়। এই জলাধার দুটির জলের প্রধান উৎস ধর্মসাগর জলাধার। পুরানো কাকাটিয়া খাল থেকে পাম্প করে ধর্মসাগর জলাধারে জল ভরা হয়।

মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলায় কোহলি জাতের বাস। কোহলিরা বংশ পরম্পরায় নানান মাপের জলাধার বানাতে অত্যন্ত পটু। ভাণ্ডারা-র অন্তর্গত সাকোলি তহশিল-এর বিশাল জলাধারগুলো এদেরই বানানো। মূলত শুখা মরশুমে আখ চাষের ক্ষেতে জলসেচের জন্য এরা বড় জলাধার বানাত। কোথায় এবং কী মাপের জলাধার বানালে আখ চাষে জলের অভাব মিটবে, সে ব্যাপারে এদের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। কোহলিরা প্রায় সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে জলাধার তৈরি করত, যাতে কোন একটি জলাধারের জল উপচে গেলে অন্য জলাধারে জমা হতে পারে। এদের 'ষোলো আনা মালগুজারি' ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই তাদের ন্যায্য প্রয়োজন মতো জল পেত। একই সঙ্গে জলাধারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণও চলত।

ছোটনাগপুর মালভূমির এক বড় অংশ জুড়ে শুখা মরশুমে এবং অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। স্থানীয় ভাবে একে জলাধর বলে। চাষিরা তাদের কৃষি ক্ষেতের এক সামান্য অংশ চাষ না করে বৃষ্টির জল ধরতে রেখে দেয়। যেখানে ভূমির ঢাল দুই শতাংশের কম, সেখানে ১.২ মিটার থেকে ১.৫২ মিটার গভীর এক গর্ত খুঁড়ে জল ধরা হয়। ভূমির ঢাল ২-৮ শতাংশের মধ্যে হলে, ১০ মিটার চওড়া ও ৩০ মিটার গভীর গর্ত খুঁড়ে জল ধরা হয়। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি, চাতরা, গোড্ডা, দুমকা, পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বেশ কিছু অংশে এই জলাধর ব্যবস্থাটি দেখা যায়।

*বৃষ্টির জল সংরক্ষণ : পাত্রে সংরক্ষণ*

ভারতের নানান অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে চাষের ও ঘর-গেরস্থালির কাজে এরকম ভাবে বৃষ্টির জল ধরে রাখার চল রয়েছে বিভিন্ন নামে, যেমন— হিমালয়ের উঁচু অঞ্চলে এটি ঘুল নামে পরিচিত, লাদাখ-এ একে বলে জিংস, গাড়োয়াল-এ এর নাম ঘরত, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু জায়গায় একে বলা হয় আহর, তামিলনাড়ু-তে এরিস এবং রাজস্থানে এর নাম জোহর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজস্থানের মরু অঞ্চলে সেন্ট্রাল অ্যারিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট বৃষ্টির জল ধরে রাখায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রায় চার দশক আগে রাজস্থানের তরুণ ভারত সংঘ এখানকার মাতাশ্যা অঞ্চলে এবং আলওয়ার জেলার গোপালপুরা গ্রামে জোহর-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে গোটা দেশের নজর কাড়ে। বর্তমানে ভারতবর্ষে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে বৃষ্টির জল ধরে রাখার কাজটি শুরু হয়েছে।

**প্রবন্ধ শেষের কথা**

বৃষ্টির জল ধরে ব্যবহার করার বেশ কিছু সুযোগসুবিধাও রয়েছে। প্রথমত, এটি ভৌমজলস্তরের পরিমাণ বাড়ায়। ফলে কুয়ো খুঁড়ে অনেকদিন ধরে জল ব্যবহার করা যায়। আবার যেখানে অতি পরিমাণে ভৌমজল ব্যবহার করার ফলে তা নোনা হয়ে পড়েছে, সেখানে বৃষ্টির জল ধরে ব্যবহার করা শুরু করলে, ভৌমজলে হাত না পড়ায়, পরোক্ষভাবে ক্রমশ ভৌমজলের নোনতা ভাব দূর হয়। যেখানে ভৌমজলে খুব বেশি লোহা-নুন থাকায় তা হলদেটে হয়ে পড়েছে, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ব্যবহার করলে, এই নুন ধুয়ে মাটির আরও নিচের স্তরে চলে যায়। ফলে জল পরিষ্কার হয়ে যায়। এমনকি প্রতিটি বাড়িতে এবং সমষ্টিগত ভাবে অন্য কোন জায়গায় বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারলে, নিচু জলা অঞ্চলে বন্যার সম্ভাবনা অল্প হলেও খানিকটা কমানো যায়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখের যে, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা জল সংরক্ষণের পুরানো ব্যবস্থাগুলো ক্রমশ কেন ভেঙে পড়ল। এর বেশ কিছু কারণ থাকলেও দুটি কারণ বেশ স্পষ্ট। প্রথমত, শতাব্দ-প্রাচীন এই পদ্ধতিগুলোকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সরকারি ঔদাসীন্য ও অনীহা; দ্বিতীয়ত, স্থানীয় মানব গোষ্ঠীরও জল সংরক্ষণের প্রাচীন ব্যবস্থাগুলো নিয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলা। বদলে, যন্ত্রশক্তি-চালিত ব্যবস্থায় ভূগর্ভ থেকে জল টেনে তোলার একমুখী ঝোঁক।

অর্থনীতিবিদরা জলকে সামাজিক মূলধন (Social capital) বলেছেন। এটি এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক সম্পদ। এটি মানব গোষ্ঠীকে একত্রিত করতে পারে। আবার, দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্নও করতে পারে। জল এমন এক সামাজিক পাটাতন, যার ওপর ভিত্তি করে সমাজে পরিবর্তন আসে, মানুষের উন্নতি হয়। এটি অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ পুনর্গঠনেও (regeneration) সাহায্য করে। পুনরুজ্জীবিত বাস্তুতন্ত্র মানেই পুনরুজ্জীবিত অর্থনীতি। দেশের নারীস্বাস্থ্য এবং স্বাক্ষরতা হার জলের ওপর নির্ভরশীল। জল সংরক্ষণ বিষয়ক গোষ্ঠীচেতনা ও কর্মসূচি সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। ভবিষ্যতে এটি জল ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। মানুষকে মনে রাখতে হবে, বর্তমানে তার ব্যবহারের জন্য পৃথিবীর জলভাণ্ডার থেকে যে পরিমাণ মিষ্টি জল সে পাচ্ছে, ২০০০ বছর আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা যখন বর্তমান জনসংখ্যার তিন শতাংশেরও কম ছিল, এই পরিমাণটি প্রায় একই ছিল। মানুষকে তাই জল ব্যবহারের ব্যাপারে অতি সতর্ক হতে হবে।

**তথ্যঋণ**


১. 1. Anil Agarwal, Sunita Narayan and Indira Khurana (Ed.): Making Water Everybody's Business - Practice And Policy Of Water Harvesting; Centre for Science and Environment, New Delhi, 2009.

২. D Ray: Rainwater harvesting project: a selection of socioeconomic case studies; Report of ITDG, Vol 1, London, 1983.

৩. E Pakianathan: A study of division and delivery systems in rainwater catchment cisterns in India, in Proceedings of the 4th International Conference on Rainwater Cistern Systems, The Philippines, August, 1989.

৪. Reassessment Of Water Availability In India Using Space Inputs - Basin Planning And Management Organisation, Central Water Commission, New Delhi - 110066, June 2019.


## কোন্ জলটা খাব? বৃষ্টির জল কেন নয়?

জল নিয়ে এত কথা লিখে যাচ্ছি এমন সময় টিভিতে খবর হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। আগাম জল তুলে রাখতে বলা হচ্ছে। এটা শুনেই খাবার জলের কথা মনে পড়ে গেল। আরে! এ নিয়ে তো এখনো কিছু বলা হয়নি। খাটুয়াবাবু এসে পড়লে তো চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন। বলবেন, এ্যাঁ! আসল ব্যাপারটাই এখনো লেখেননি? যা ভেবেছি তাই। হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, 'জানেন? একটা চ্যানেলে এইমাত্র শুনে এলাম বেশ কয়েকটা এলাকায় নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে, মানুষ চিন্তায় পড়ে গেছে। তো মশাই মাটির নিচের জলেও যখন এত সমস্যা তখন বৃষ্টির জল ধরে খেলেই তো হয়। ও তো আকাশ থেকে আসছে। ওতে খারাপ কিছু তো নেই।'

ভদ্রলোক বেশ কয়েকটা ভাবনা উসকে দিলেন। এটা ঠিক, জলের কথা ভাবলে সাধারণত বৃষ্টির জলের কথাই আমরা প্রথমে ভাবি। প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের জল, নদীর জল, ঝর্ণার জল ইত্যাদি যে জলের কথাই ভাবি না, এরকম ধারণা অনেকের আছে। ধারণাটা কিন্তু ঠিক নয়। বৃষ্টি হওয়ার সময় বাতাসের ধুলোবালি, কলকারখানা ও পরিবেশের নানারকম দূষিত গ্যাস বৃষ্টির জলে মিশে যায় যা শরীরের পক্ষে আদৌ ভাল নয়। আমরা অ্যাসিড বৃষ্টির কথা মাঝে মাঝে শুনে থাকি। কলকারখানা, গাড়ি থেকে সালফার ডাই-অক্সাইডের মতো অ্যাসিড গ্যাস বৃষ্টির জলে মিশে এই কাণ্ড করে। তবে, জলের সংকট কাটাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও তাকে নানা কাজে লাগানো অবশ্যই সম্ভব। সেটা করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবশ্যই আছে।

নদ-নদী, সমুদ্র, ঝর্ণা, হ্রদ প্রভৃতি নিয়ে পৃথিবীর যে জলভাণ্ডার তার শতকরা ৯৭ ভাগই হল সমুদ্রের জল। নানান জায়গার জল নানান পথঘাট পার হয়ে সমুদ্রে এসে মিশছে। সেই সূত্রে নানারকমের লবণ সমুদ্র জলকে নোনতা করে দিচ্ছে। এইসব লবণের মধ্যে আবার আমরা যে লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) খাই তার ভাগই বেশি। রোদে সমুদ্র-জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে গেলেও লবণ কিন্তু সমুদ্রে থেকেই যাচ্ছে। তার উপর ঐ বাষ্প উপরের ঠাণ্ডায় বৃষ্টি হয়ে নামার পর বৃষ্টির জল শিলা, পাথর, মাটি থেকে নানারকমের লবণ বয়ে এনে সমুদ্রে ফেলে। কাজেই সমুদ্রের জলে দিনের পর দিন লবণের মাত্রা বেড়েই চলেছে।

কোন্ জলটা খাই, খাওয়া উচিত সেটা বলতে গিয়েই সমুদ্র জলকে নিয়ে এত কথা বলা হল। সেই সমুদ্রের জল নোনতা। সরাসরি খাওয়া যায় না। আর পৃথিবীপৃষ্ঠের অন্য সব জল—নদীর জল, ঝর্ণার জল, হ্রদের জল প্রভৃতিতেও বহু দূষিত জিনিস মিশে থাকে। তবুও তাদের শোধন করে বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে সাধারণত আমরা যে জলটা খাই সেটা মাটির নিচের জল। সমুদ্র জলের ৯৭ ভাগ বাদ দিলে বাকি ৩ ভাগের একটা সামান্য অংশই হল এই ভূগর্ভের জল। মাটির বিভিন্ন স্তর ভেদ করে যাবার সময় ঐ স্তরগুলি ছাঁকনির কাজ করে। এই জল সাধারণত খুব গভীরের বলে পৃথিবীপৃষ্ঠের নদীনালা, হ্রদের জলে যেভাবে দূষিত জিনিস মিশে থাকতে পারে, রোগজীবাণু থাকতে পারে, ভূ-গর্ভের জলে সে সম্ভাবনা খুব একটা থাকে না। বেশ কিছু লবণ অবশ্য এতে বেশিই থাকে যা শরীরের পক্ষে দরকারও, তাতে জলের একটা স্বাদ আসে—খেলে তৃপ্তি হয়। এ কারণেই এই জলকে কেউ কেউ স্বাদু জল বা মিঠে জল বলে থাকেন। কোথাও কুয়ো বানিয়ে, কোথাও বা নলকূপ বসিয়ে বা পাম্প করে এই জল তুলে আমরা খাই। কখনো-সখনো এই জলেও কোনো কোনা জিনিস (যেমন, আর্সেনিকের কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে) বেশি মাত্রায় থাকলে তা থেকে শরীরের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার ইচ্ছেমত যেখানে খুশি, যেখান থেকে খুশি এই জল আমরা তুলছি। এতে জলের তলও ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। তাতেও নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে।

*—যুগল কান্তি রায়*

অরুণ কুমার পাল

# পৃথিবীর জলসঙ্কট ও প্রতিকারের উপায়

*আমরা জানি পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। শতকরা হিসাবে পৃথিবীর উপরিতলের ৭১ শতাংশ জল আর ২৯ শতাংশ স্থল। পৃথিবীর বৃহৎ অংশ হচ্ছে জল। এই বৃহৎ পরিমাণ জলের মধ্যে মানুষের পানীয় জল কতটা? মানুষ সমুদ্রে গেলে চারিদিকে জল দেখতে পায় কিন্তু পানীয় জলের অভাব। বন্যার সময় চারিদিকে জলমগ্ন কিন্তু পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেয়।*

*স্বচ্ছ জল বা পানীয় জল কতটা সেই আলোচনা করছি। পৃথিবীর জলভাগের ৯৭.০৫% জল নোনাজল হিসাবে রয়েছে। ২.২৫% জল হিমবাহ বা বরফ হিসাবে রয়েছে। বাকি ০.৭০% জল পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভে রয়েছে, যেটি মানুষের পানীয় জল বা স্বচ্ছ জল। সুতরাং স্বচ্ছজলের পরিমাণ পৃথিবীর জলভাণ্ডারের তুলনায় খুবই নগণ্য।*

CGWB (Central Ground Water Board)-এর তথ্য হিসাবে পৃথিবীর ৯৭% জল লবণাক্ত। ৩% জল স্বচ্ছ জল। ৩% স্বচ্ছ জলের মধ্যে ৬৯% জল বরফ হিসাবে আছে। ৩০.১০% জল ভূগর্ভে রয়েছে। বাকি ০.৯% জল ভূপৃষ্ঠে অর্থাৎ নদী বিল বা বিভিন্ন জলাধারে রয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের স্বচ্ছ জলের (Safe Surface Water) পরিমাণ ০.০২৭%। অর্থাৎ ৩৭০৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র বা Eco-System হিসাবে স্থলভাগের জীবজগতের জন্য পানীয় জল কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের স্বচ্ছ জল। সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জন্য পানীয় জল হিসাবে ভূপৃষ্ঠের স্বচ্ছ জলই রেখেছেন, ভূগর্ভের জল জীবজগতের পানীয় হিসাবে সৃষ্টি করেননি। মানবজাতি ভূগর্ভ থেকে জল উত্তোলন করে পানীয় ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে। তাতে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র ব্যহত হচ্ছে। কিভাবে সেই আলোচনা করছি।

১. ভূগর্ভ থেকে জল উত্তোলন করার ফলে ভূগর্ভের জলের তল ক্রমশ কমছে তাতে ভূগর্ভের জলসঙ্কট পরবর্তীকালে হতে পারে।

২. মাটির ভেতর থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ার ফলে মাটির ভার ধারণ ক্ষমতা (Bearing Capacity) কমে আসবে।

৩. ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি জলস্তর থাকলে উদ্ভিদ সেই জল পাবে এবং বেঁচে থাকবে। জলস্তর নীচে নেমে গেলে উদ্ভিদের শিকড় জল পাবে না ফলে গাছগুলো মারা যাবে এবং মরুভূমিতে পরিণত হবে।

৪. ভূগর্ভ থেকে জল উত্তোলন করার ফলে ভূগর্ভের আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ইত্যাদি বিষাক্ত পদার্থ ভূপৃষ্ঠে চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে Arsenic Removal Plant, Floride Removal Plant ইত্যাদি Plant-এর মাধ্যমে পানীয় জল থেকে বিষাক্ত পদার্থ সরানো হচ্ছে। কিন্তু Back Wash করার ফলে সেই বিষাক্ত পদার্থগুলি নিকটবর্তী জলাধার বা জমিতে গিয়ে জমা হচ্ছে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে সেই বিষযুক্ত জল দিয়ে জমিতে চাষ করা হচ্ছে। সেখানে বিষ দূরীকরণের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে না। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে আর্সেনিক যুক্ত জল দিয়ে কোন জমিতে চাষ করলে খাদ্যশস্যে সেই আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। কান্ড বা পাতায় সেই অনুপাতে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে না। Filter বা Plant বসিয়ে পানীয় জল থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করা হচ্ছে। কিন্তু খাদ্যশস্য থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করা হবে কিভাবে? খাদ্যশস্যে বিষ জমা হলে বা জমিতে এই বিষাক্ত পদার্থ ছড়িয়ে গেলে কি পরিণতি হতে পারে সেটা কেউ ভাবছে কি?

৫. লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে ভূপৃষ্ঠের জলের পরিশোধনাগার (Surface Water Treatment Plant) থেকে ভূগর্ভস্থ জলের পরিশোধনাগারে (Ground Water Treatment Plant) শ্যাওলা বা জীবাণু বেশি পরিমাণে জমেছে। অর্থাৎ আপনি দুটি সমান পাত্র নিয়ে একটিতে নদীর জল এবং অন্যটিতে নলকূপের জল রাখুন। এক সপ্তাহ পরে দেখতে পাবেন যে পাত্রে নলকূপের জল রয়েছে সেই পাত্রে বেশি জীবাণু বা শ্যাওলা জমেছে। তার মূল কারণ হল DO (Desolve Oxygen)। ভূগর্ভের জলে DO খুবই কম থাকে। DO মানুষের পাচন পদ্ধতিতে সাহায্য করে। সেইজন্য ভূগর্ভের জলের পরিবর্তে ভূপৃষ্ঠের জল পান করলে মানুষ বেশি সুস্থ থাকবে।

এছাড়া হিসেব করে দেখা গিয়েছে ভূগর্ভের জলে যদি রাসায়নিক বিষক্রিয়া থাকে তবে তার পরিশোধনের খরচ ভূপৃষ্ঠের জলের পরিশোধনের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ Arsenic Removal Plant, Iron Removal Plant, Floride Removal Plant ইত্যাদির তৈরির খরচ সমপরিমাণ জলের Surface Water Treatment Plant-এর তুলনায় বেশি। সকল কথা বিবেচনা করলে জানা যাবে ভূগর্ভের জল জীবজগতের জন্য অনুপযোগী।

তথ্য সংগ্রহ করলে জানা যাবে পৃথিবীর অনেক এলাকা আছে যেখানকার ভূগর্ভের জল উত্তোলনের ফলে জলস্তর প্রতি বৎসর ২ ফুট, ৩ ফুট বা তারও বেশি নামছে। আমার পরিচিত একটি এলাকা হল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা। ১৯৯৭ সালে খরার সময় ঐ এলাকায় ভূগর্ভের জলের তল ছিল ২৫ ফুট থেকে ৩৫ ফুটের মধ্যে। এখন ২০২৪ সালে খরার সময় জলের তল ৬০ ফুট থেকে ৯০ ফুটের মধ্যে আছে। ভাবুনতো প্রতি বৎসর কি হারে জলস্তর নামছে এবং আগামীতে পরিণতি কি হতে পারে? অথচ প্রতি বৎসর সেই এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। প্রচুর নদী সেই এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র মানুষের সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সেই এলাকা বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে এবং মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছে।

এবার আলোচনা করি পৃথিবীর জলসঙ্কটের কারণ নিয়ে। কিভাবে বনভূমি ও জলাভূমি, মরুভূমিতে পরিণত হল। সাড়ে চার হাজার বছর আগে আফ্রিকায় মিশরীয় সভ্যতা ছিল। মিশরের পিরামিড তার নিদর্শন। তখন সেই এলাকায় প্রচুর গাছ ছিল বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। সেই এলাকায় প্রচুর নদী ছিল, যেগুলো এখন শুকিয়ে গিয়েছে। সেই এলাকায় প্রচুর গাছ ছিল এবং নদী ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরীয় সভ্যতায় প্রচুর নদী ও গাছ থাকা সত্ত্বেও সেখানে মরুভূমি হল কিভাবে?

আড়াই হাজার বছর আগে জর্ডন দেশের পেট্রাতে মানুষের বসবাস ছিল। পেট্রাতে নদী ছিল। সেই নদীতে তখনকার মানুষ ব্রিজ তৈরি করেছিল। সেখানে গাছ ছিল। এখন সেটি মরুভূমি এলাকা। সেই গাছ, নদীর জল কোথায় গেল?

ইজরাইল ও জর্ডন দেশের সীমানায় মৃত সাগর (Dead Sea) অবস্থিত। মৃত সাগরের জলের তল সমুদ্রের জলতল থেকে ১২০০ ফুট নীচে অবস্থিত। একসময় মৃত সাগরের জলতল সমুদ্রের জলতলের সমান ছিল। মৃত সাগরের জলতল সমুদ্রের জলতল থেকে ১২০০ ফুট নীচে গেল কীভাবে?

*সাহারা মরুভূমি : শীতকালীন ছবি*

সাহারা মরুভূমি, সৌদি আরব ও তৎসংলগ্ন মরুভূমি এলাকা পরিদর্শন করলে দেখা যাবে সেখানকার পর্বতগুলো থেকে প্রচুর নদীর মতো গিরিখাতগুলো বালির মধ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে। গিরিখাতের নুড়ি পাথরগুলো লক্ষ্য করলে প্রমাণ পাওয়া যাবে সেখান দিয়ে জল বয়ে গিয়েছে। সেই এলাকার নদীতে জল ছিল, গাছ ছিল, জঙ্গল ছিল, প্রচুর জীবজন্তুর বসবাস ছিল। ঐ মরুভূমি এলাকায় মানুষের বসবাস বেশি ছিল।

হিসেবমতো সাহারা ও তৎসংলগ্ন মরুভূমি এলাকায় ভূগর্ভের জলের তল ভূপৃষ্ঠের অল্প নীচে ছিল। কিন্তু এখন সেই জলের তল ৪০০০ ফুট, ৫০০০ ফুট বা তারও বেশি নীচে চলে গিয়েছে। এই পরিবর্তন হল কিভাবে? এই বিষয় নিয়ে পৃথিবীর মানুষের ভাবা দরকার। মানুষ যদি এই বিষয় নিয়ে সচেতন না হয় তবে আগামীদিনে আমাজনের জঙ্গল ও অন্যান্য বনাঞ্চল ও মরুভূমিতে পরিণত হবে এবং পৃথিবী থেকে জীবজগৎ বিলুপ্ত হবে।

জল ও গাছ থেকে জলীয়বাষ্প উৎপন্ন হয়ে মেঘ তৈরি হয়। সেই মেঘ পাহাড়ে ধাক্কা মারার ফলে বৃষ্টিপাতে পরিণত হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে জলধারাগুলো পাহাড়ের মাটি কেটে সমতলে নিয়ে আসে। তাতে পাহাড়ের ক্ষয় হয় এবং গিরিখাতের উৎপন্ন হয়। এছাড়া ভূমিকম্পের মাধ্যমেও পাহাড়ের ক্ষয় হয়। এইভাবে পাহাড়ের ক্ষয় হতে হতে মেঘের স্তরের নীচে নেমে আসে। ফলে বৃষ্টিপাত হয় না। নদীগুলো শুকিয়ে যায়। গাছগুলো জলের অভাবে মারা যায় এবং মরুভূমিতে পরিণত হয়। গাছের অভাবে প্রাণীগুলো মারা যায়। গাছ ও প্রাণী মারা যাওয়ার পর সেগুলো রৌদ্রের তাপে পচে তেল উৎপন্ন হয়।

জল ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয় কিন্তু তেল ২০০° সেলসিয়াস থেকে বেশি তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়। জল অপেক্ষা তেল হালকা। সেই কারণে মরুভূমি এলাকায় অনেক স্থানে মাটির নীচে প্রথমে তেল ও পরে জল পাওয়া যায়। মরুভূমি এলাকার মাটির নীচের তেলের ভান্ডার থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সেই এলাকায় একসময় প্রচুর গাছ ছিল।

এবার তাকলামাকান মরুভূমির কথা বলি। এই মরুভূমিটি চিন দেশে অবস্থিত। এই মরুভূমিটি একসময় হ্রদ বা জলাধার ছিল। এই এলাকাটি রান্নার কড়াই-এর মতো। চারিদিকে উঁচু মাঝখানে নীচু। চারিদিক থেকে নদী এসে মাঝখানের জলাধারে পড়ত। নদীগুলো পর্বত কেটে মাটি এনে ঐ জলাধারে ফেলত। ফলে ঐ জলাধারের গভীরতা কমতে কমতে সম্পূর্ণ বালিতে ভর্তি হয়ে গেল এবং মরুভূমিতে পরিণত হল। সাধারণত কোন নদী, জলাধার বা সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়, কোন মরুভূমিতে বিলীন হয় না। সকল তথ্য সংগ্রহ করলে প্রমাণ পাওয়া যাবে তাকলামাকান মরুভূমি একসময় হ্রদ বা জলাধার ছিল।

চিনের গোবি মরুভূমির ক্ষেত্রেও একইরকম ঘটনা। গোবি মরুভূমিতে মাটির অল্প নীচে জল পাওয়া যায়। এখানে ছোট ছোট অনেক জলাধার রয়েছে যেগুলো লুপ্তপ্রায় হতে চলেছে।

পৃথিবীর সকল মরুভূমি সংক্রান্ত তথ্য যদি সংগ্রহ করা যায় তবে প্রমাণ পাওয়া যাবে পৃথিবীতে একসময় কোন মরুভূমি ছিল না, সমুদ্র ছিল আর স্থলভাগের নদী জলাধার বা বরফ বাদে মাটিতে উদ্ভিদ ছিল।

বর্তমানে পৃথিবীর উপরিতলের ৯.৫% মরুভূমি। পৃথিবীর স্থলভাগের তিন ভাগের এক ভাগ মরুভূমি। মরুভূমি পৃথিবীর স্থলভাগকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করে চলেছে। মানুষ যদি মরুভূমির গ্রাস থেকে প্রতিকারের পদ্ধতি না ভাবে আগামীদিনে পৃথিবীর স্থলভাগকে মরুভূমি গ্রাস করে নেবে এবং পৃথিবী থেকে জীবজগৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যখন পৃথিবীতে কোন মরুভূমি ছিল না তখন বর্তমান মরুভূমি এলাকায় জলের তল ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ছিল। স্বাভাবিকভাবে সেই জল সমুদ্রে মিলিত হয়েছে এবং বৃহৎ অংশের পানীয় জল নোনাজলে পরিণত হয়েছে। তখনকার সমুদ্রতল বর্তমান সমুদ্রতল থেকে কমপক্ষে ২০০ ফুট নীচে ছিল। তখন পৃথিবীর স্থলভাগ ২৯%-এর পরিবর্তে হিসেবমতো ৪০%-এর বেশি ছিল এবং জলভাগ ৭১%-এর পরিবর্তে ৬০%-এর কম ছিল। স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীতে নোনাজলের পরিমাণ ৯৭%-এর পরিবর্তে ৯০%-এর কম ছিল আর পানীয় জলের পরিমাণ অনেকগুণ বেশি ছিল।

পৃথিবীর জীবজগৎ কিভাবে বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে প্রতিটি মানুষের ভাবা দরকার। তারপর আমরা ভূগর্ভ থেকে জল তুলে নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভূগর্ভ থেকে জল তোলার অর্থ পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করা এবং জীবজগৎকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া।

হিসেব করলে জানা যাবে সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ কোটি কিলোলিটার জল মাটির নীচ থেকে তোলা হচ্ছে। পৃথিবীর ভূগর্ভ থেকে প্রতিদিন যে পরিমাণে জল তোলা হচ্ছে এবং ভূগর্ভের জলের তল যে হারে নামছে তাতে আগামী দিনে ভয়াবহ পরিণতি হবে।

পৃথিবীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা প্রতিনিধিরা যারা জল নিয়ে কাজ করছেন তারা জলসঙ্কট নিয়ে সচেতন কি? সচেতন হলে জলের পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হত না।

এই জলসঙ্কট থেকে প্রতিকারের উপায় কি?

১. মানুষকে জল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

২. কোন জনবহুল এলাকার বাৎসরিক জলের পরিমাণ (Yearly Water Demand) নির্ধারিত করতে হবে। তারপর সেই এলাকার

বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ হিসেব করতে হবে। যদি বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ বাৎসরিক জলের চাহিদার তুলনায় বেশি হয়, তবে ঐ এলাকায় বাৎসরিক জলের চাহিদা হিসাবে এক বা একাধিক জলাধার তৈরি করতে হবে এবং ঐ জল পরিশোধিত করে ব্যবহার করতে হবে, তারপর ঐ এলাকার সকল নলকূপ কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।

৩. যে এলাকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জলের চাহিদার তুলনায় কম এবং নিকটবর্তী এলাকায় কোন বড় জলাধার বা নদী নাই সেক্ষেত্রে মানুষের জলের চাহিদা কম করতে হবে। ব্যবহৃত জলকে পুনঃব্যবহারের কথা ভাবতে হবে। এছাড়া ভাবতে হবে নিকটবর্তী নদী বা জলাধার থেকে কিভাবে নালা খনন করে জল আনা যায়।

৪. কোন জনবহুল এলাকায় নদী বয়ে গেলে সেই নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করতে হবে এবং ঐ এলাকার জলের চাহিদা পূরণ করতে হবে।

৫. পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে বাঁধ তৈরি করে বড় বড় জলাধার তৈরি করতে হবে। পর্বতের মধ্যে যত বেশি জলাধার তৈরি করা যাবে মানুষ পানীয় জলের সঞ্চয় তত বেশি করতে পারবে। এছাড়া পর্বতের উপরে জলাধার তৈরি হলে অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণ জল সঞ্চয় করা যাবে। বিভিন্ন এলাকায় চাহিদা অনুপাতে জল সরবরাহ করা যাবে। পরিকল্পনা করে নিকটবর্তী মরুভূমি এলাকাতে নালা কেটে জল সরবরাহ করা যাবে এবং মরুভূমিকে বনাঞ্চল তৈরি করা যাবে। পাহাড়-পর্বতের ক্ষয় রোধ করা যাবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

তিব্বত, লাদাখ, আফগানিস্তান, তাজিকিস্থান, কাজিকিস্থান ইত্যাদি এলাকার বরফগলা জল থেকে প্রচুর নদী উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন দিকে প্লাবিত হচ্ছে। অথচ এই এলাকাগুলো মরুভূমি অঞ্চল। এই এলাকাতে পরিকল্পিত ভাবে বাঁধ তৈরি করে জলাধার বানানো যায় এবং মরুভূমিকে বনাঞ্চলে পরিবর্তন করানো যায়। তাতে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় খুবই কম। এই এলাকার জলকে কাজে লাগিয়ে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ মরুভূমি জলাধার তৈরি করে বৃক্ষরোপণ করা যাবে।

৬. যে নদীগুলো সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে তার প্রতিদিনের জলের পরিমাণ (Daily Discharge) নির্ধারিত করতে হবে। নদীতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ তৈরি করে এই জলের পরিমাণ শূন্যের কাছাকাছি আনতে হবে। নদীর জল সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে মানে স্বচ্ছ জলের পরিমাণ কমছে আর নোনাজলের পরিমাণ বাড়ছে। পৃথিবীতে স্বচ্ছ জলের পরিমাণ যত বাড়বে, জীবজগতের পরিমাণ তত বাড়বে এবং পৃথিবীর জলসঙ্কট চিরকালের জন্য দূর হবে।

৭. জনবহুল এলাকায় নালা বা ড্রেনের পরিমাণ যত বাড়বে জল দূষণের মাত্রা তত বাড়বে। নালার দূষিত জল বৃষ্টির জলকে দূষিত করছে এবং নিকটবর্তী জলাধার বা নদীর জলকে দূষিত করছে। শহরাঞ্চলের জলদূষণ ও জলসঙ্কটের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে নালা বা ড্রেন।

কোন এলাকায় কোন দূষিত জলের নালা বা ড্রেন থাকবে না। দূষিত জল Soak Pit-এর মাধ্যমে মাটিতে পাঠাতে হবে এবং ভূপৃষ্ঠ স্বচ্ছ করতে হবে। তাতে বৃষ্টির জল দূষিত হবে না। নিকটবর্তী জলাধারে জমা হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ভূগর্ভে পাঠানোর জন্য Recharge Pit করতে হবে। Recharge Pit-এর জলধারণ ক্ষমতা এমন করতে হবে যাতে সেই এলাকায় অতিবৃষ্টি হলেও কোথাও জলমগ্ন না হয়।

৮. পৃথিবীর মানুষকে ভাবতে হবে সাহারা মরুভূমি সৌদি আরব ও তৎসংলগ্ন মরুভূমি এলাকায় কিভাবে স্বচ্ছ জল আনা যায় এবং বৃষ্টিপাতের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়। তার জন্য এই এলাকা পরিদর্শন করে Contour Map তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি লক্ষ্য করতে হবে মরুভূমি এলাকায় অনেক স্থান আছে যেখানে শীতকালে বরফ জমে। গরম পড়তেই বরফ জল হয়ে বালিতে মিশে যায়। পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ দিয়ে ঐ বরফগলা জলকে ধরে রাখতে হবে। এই জল যত ধরে রাখা যাবে উদ্ভিদের সংখ্যা তত বাড়বে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে।

Contour Map বায়ুপ্রবাহ ও মেঘের গতিপথ লক্ষ্য করে কোন পাহাড় কতটা উঁচু করে মেঘের ধাক্কার মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটানো যাবে সেই পরিকল্পনা করতে হবে। যে পাহাড়গুলো কম উঁচু করে বৃষ্টিপাত ঘটানো যাবে সেই পাহাড়গুলো আগে তৈরি করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে মরুভূমি এলাকার পাহাড়গুলো এক-দুই হাজার ফুট উঁচু করতে পারলেই সেই এলাকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করা যাবে। বৃষ্টির জলকে বাঁধের মাধ্যমে আটকে জলাধার তৈরি করতে হবে। এইভাবে যত বেশি জলাধার তৈরি করা যাবে তত বেশি উদ্ভিদ জন্মাবে এবং মরুভূমিগুলো সবুজে পরিণত হবে।

অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে মরুভূমিতে উঁচু পাহাড় তৈরি করা সম্ভব কিভাবে? সাড়ে চার হাজার বছর আগে মানুষ ৫০০ ফুটের বেশি উঁচু পিরামিড তৈরি করেছে। তখন মানুষের কাছে বিদ্যুৎ বা যন্ত্রাংশ ছিল না। এখন মানুষ তিন হাজার, চার হাজার ফুট উঁচু বাড়ি তৈরি করেছে। আমেরিকার নেভাডা রাজ্যের ইউরেকায় এক হাজার ফুট গভীর গর্ত খনন করেছে। সুতরাং প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানুষ এত উন্নত হয়ে গিয়েছে, মানুষের কাছে পাহাড় পর্বত তৈরি করাটা অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয়। কেবলমাত্র সদিচ্ছা, অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। মানুষ ইচ্ছে করলে হিমালয় পর্বতকালার মতো পর্বতমালা সাহারা মরুভূমিতে তৈরি করতে পারবে।

মানুষ যদি এইভাবে ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে জল সঞ্চয় করে তবে কোনদিনই মানুষকে জলসঙ্কটে পড়তে হবে না। ভূপৃষ্ঠে স্বচ্ছ জলের পরিমাণ বাড়লে উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়বে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে।

কিন্তু বাস্তবটা বিপরীত। যারা পৃথিবীতে জল নিয়ে কাজ করছেন তারা জল নিয়ে সচেতন নন। তারা যদি জলসঙ্কট নিয়ে ভাবতেন তবে ভূগর্ভের জলতল প্রতি বৎসর নীচে নামত না। প্রতিনিয়ত জলাধারগুলো শুকিয়ে যেত না বা মাটি ফেলে বন্ধ করা হত না। আর এভাবে জলসঙ্কট প্রতিদিন বাড়ত না।

বর্তমানে কাস্পিয়ান সাগর সমুদ্রতল থেকে ৯২ ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। আরল সাগর সমুদ্রতল থেকে ৭২ ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আইরে হ্রদ সমুদ্রতল থেকে ৫০ ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। এইভাবে জলসঙ্কট বাড়তে থাকলে কাস্পিয়ান সাগর, মৃত সাগরে (Dead Sea) পরিণত হবে। আরল সাগর, আফ্রিকার চাঁদ হ্রদ, আইরে হ্রদ ও অনেক বৃহৎ জলাধার পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর বনাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে।

সুতরাং এইভাবে পৃথিবীর জলসঙ্কট বাড়তে থাকলে পরিণতি ভয়াবহ। মানুষকে এখন রাস্তা, ব্রিজ, গৃহ, Shopping Mall ও বিনোদনের জায়গার উন্নয়নের কথা ভুলে গিয়ে জল সঞ্চয়ের কথা ভাবতে হবে। নাহলে আগামীদিনে মানুষের জন্য রাস্তা, ব্রিজ, গৃহ, Shopping Mall ও বিনোদনের জায়গাগুলো থেকে যাবে কিন্তু 'মানুষ' থাকবে না।

অ জ য় ম জু ম দা র

# জলের অভাব মেটাবে, পৃথিবীর গর্ভে সদ্য আবিষ্কৃত জল ভান্ডার.....

পৃথিবীতে পানীয় জল শেষ হয়ে আসছে। জলের হাহাকারের দিন সামনেই। এখন থেকেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞানীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। ঠিক তখনই জুলে ভার্নের লেখা কোন কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মত একটা বিষয় উঠে এলো। কল্প বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের কোন প্রজেক্ট বা প্রকল্পের ব্লু প্রিন্ট হিসেবে যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে আজকের এই আবিষ্কার হবে যুগান্তকারী।

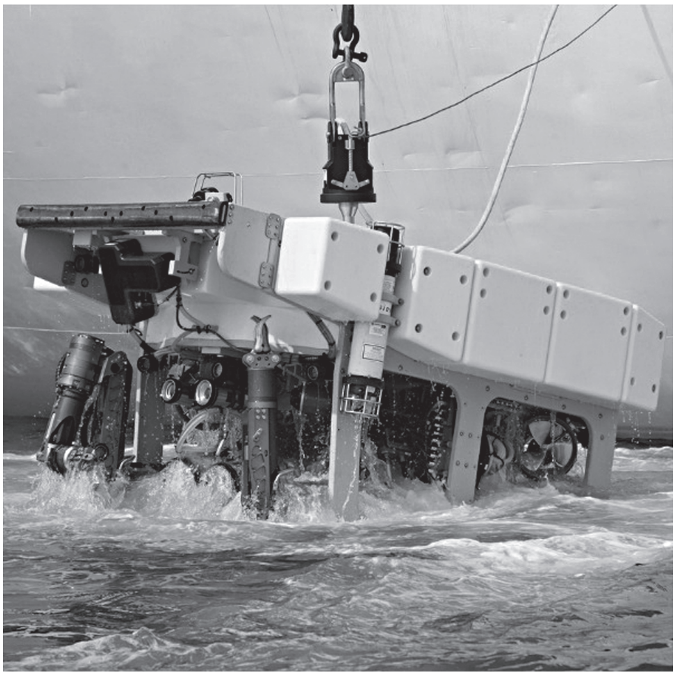

*গভীর সমুদ্রে জলের খোঁজ চলছে*

পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের অন্তত ৭০০ কিলোমিটার নিচে বিপুল জল ভান্ডারের সন্ধান মিলেছে। এই জল ভান্ডার নাকি পৃথিবীর সব সমুদ্র, মহাসমুদ্র, নদী, হ্রদ সহ যত জলাশয় আছে, সব মিলিয়ে যতটা জল রয়েছে, তার থেকে অন্তত তিনগুণ বেশি জল ভান্ডার রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পৃথিবীর প্রায় ৭১% জল মহাসাগরে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট জল হ্রদ হিমবাহ, বরফ, ভূগর্ভস্থ জলের উৎস, এ ছাড়াও মাটি এবং বিভিন্ন ধরনের জীবনের মধ্যে পাওয়া যায়। এরকম একটা যুগন্তকারী বিষয় কাদের গবেষণায় উঠে এলো?

আমেরিকার ইভানস্টানের নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এই সঞ্চিত জল ভান্ডারের সন্ধান পান। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মহাসমুদ্র গুলি সৃষ্টির শিকড় খুঁজতে গবেষণা শুরু করেছিলেন। এই গবেষণা করতে গিয়ে ফলাফল গোটা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছে। একদিকে আতঙ্ক এবং অন্যদিকে নিশ্চিন্তের অবস্থান তৈরি হলো। বিজ্ঞানীদের একাংশের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, তাহলে কি পৃথিবী নিজের গর্ভেই এত জল ধারণ করে রেখেছিল? এই তত্ত্ব কিন্তু নতুন নয়, তবে মেলটেড কমেট থিয়োরির তুলনায় পিছিয়ে ছিল। এর পক্ষে তেমন কোন জোরালো যুক্তি এতদিন বিজ্ঞানীদের দেখানো সম্ভব হয়নি। তাই ইভানস্টনের বিজ্ঞানীদের এক অংশ দাবি করেন এবার মেলটেড কমেট থিয়োরির সেই যুক্তির পালেও জোরালো দমকা হাওয়া লাগল।

গবেষকদের বক্তব্য পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি ৭০০ কিলোমিটার নিচে এই জলভাণ্ডার সঞ্চিত থাকার সম্ভবনা। খুবই আশ্চর্যজনক ভাবেই ভূগর্ভের ওই এলাকায় বা বিজ্ঞানের ভাষায় ট্রানজিশন জোনে রিংউডাইট নামে এক ধরনের নীল রঙের পাথর পাওয়া গেছে। এই জল ধরে রেখেছে এই রিংউডাইট পাথর।

এই রিংউডাইট পাথরগুলি হলো অনেকটা স্পঞ্জের মত। এদের জল ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। কী ভাবে এই পাথর জল ধারণ করে? বিজ্ঞানীদের উত্তর হল রিংউডাইটের যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার (অ্যাটমের এক বিশেষ বিন্যাস) রয়েছে, তা চমক লাগানোর মতো। এই ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারই হাইড্রোজেনকে আকর্ষণ করে এবং জল ধরে রাখে। এই রিজার্ভারে পৃথিবীর সব মহাসাগরের অন্তত তিনগুণ বেশি জল সঞ্চিত রয়েছে। গবেষক দলের প্রধান বিজ্ঞানী হলেন স্টিভেন জ্যাকবসন (Steven Jacobosen) তার অনুমান— এই পুরো জলরাশি যদি উপরে উঠে আসে, তাহলে মাউন্ট এভারেস্ট ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সব পাহাড়ই জলের নিচে ডুবে যাবে। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীটাই জলের তলায় তলিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর জীবকুলও ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণার স্বার্থে গোটা আমেরিকা জুড়ে ২০০০ সিসমোগ্রাফ ব্যবহার করেছিলেন। এই সিসমোগ্রাফে ক্যাপচার করা ৫০০টি ভূমিকম্পের সিসমিক ওয়েভ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করেন। ওরা দেখেন, পৃথিবীর কোর (core) সমেত সবকটি ইনার লেয়ার বা ভিতরে স্তর দিয়ে সিসমিক তরঙ্গগুলি গিয়েছে একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। তাদের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। কেন এমন হচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই এই বিপুল জলরাশির সন্ধান বিজ্ঞানীরা পান। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য জল থাকার কারণেই তরঙ্গগুলির গতি কমে যায়। সম্প্রতিক গবেষণা অবশ্যই পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা হাইড্রোজেন সমুদ্র গঠনে ভূমিকা রেখেছিল। দুটি ধারণা পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া নয়, কারণ এখনো প্রমাণ রয়েছে যে গ্রহাণু বেল্টের বাইরের প্রান্তে গ্রহাণুর অনুরূপ বরফের প্রভাবের দ্বারা পৃথিবীতে জল সরবরাহ করা হয়েছিল।

পৃথিবীর প্লেট টেকটোনিক্সের সাবডাকশন জোনগুলির ভূতাত্ত্বিক সময়ের মধ্যে সমুদ্রের জলকে পৃথিবীর আবরণের মধ্যে চুষে নেয়। ধূমকেতু এবং গ্রহাণু থেকে জল পৃথিবীতে এসেছিল তার প্রমাণ এখন বদলে গেছে। ভূত্বকের নিচে অধিকাংশ জল পাথরে আবদ্ধ। প্লেট টেকটোনিক্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই যে বিপুল জলরাশি সঞ্চিত রয়েছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, সেই জল কি ব্যবহার উপযোগী হবে? মিষ্টি না লোনা? এসবের উত্তর বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো অধরাই। প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি পৃথিবীর অভ্যন্তরেই জীবন লুকিয়ে ছিল? আবার মেলটেড কমেটস থিয়োরির মূল কথা হলো— ভূপৃষ্ঠের আছড়ে পড়া ধূমকেতুর বরফ গলে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ এই তত্ত্বই একটা বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

**পাখিদের খাবার জল চাই। জলচারী পাখিদের জন্য চাই বৃহৎ খোলা জলাশয়। পরিযায়ী পাখিরাও জলনির্ভর। সব মিলিয়ে শুধু পাখি নয়, সকলের জন্য চাই নিশ্চিত জলভাণ্ডার।**

প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

# ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট বা জলের পদচিহ্ন

*জলের পদচিহ্ন হল মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত সব ধরণের জলের মোট পরিমাণকে বোঝায়। একজন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা কোনো ব্যবসা বা একটি দেশ উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবাগুলি উৎপাদন করতে ব্যবহৃত তাজা জলের মোট পরিমাণ সেই ব্যক্তি সম্প্রদায়, দেশ বা ব্যবসায়িক সংস্থার জলের পদচিহ্ন। এই প্রবন্ধে জলের পদচিহ্নের ধারণা ও তার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং জলের পদচিহ্ন জলের ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে।*

এই প্রবন্ধে জল নিয়ে একটা জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এই ভাবনাটা একান্তই এই শতাব্দীর ভাবনা এবং জল ব্যবস্থাপনার পিছনে যে চিরাচরিত ভাবনা ছিল তাকে একটা সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে এই নতুন ভাবনায়।

জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবহার, পুনর্নবীকরণ ইত্যাদি কথাগুলি যেমন খাটে তেমনি জলসম্পদকে উপলব্ধি করা তাকে পরিমাপ করা ও বিচক্ষণতার সাথে তাকে বিভিন্ন ব্যবহারের খাতে বন্টন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত দশকের মাঝামাঝি এই ভাবনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে সলিলবিদ্যা বা হাইড্রোলজির প্রভূত উন্নতি হয়। জলকে উত্তোলন, বন্টন এবং তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর অনেকগুলি প্রযুক্তি তখন আমাদের হাতে এসে যায়।

কিন্তু এই শতকের শুরুতে একটা নতুন ভাবনা এলো যা জলের টেকসই ব্যবহারের এতকালের ধারণাকে বেশ একটু নাড়া দিয়ে গেল। আর এই ভাবনার প্রবক্তা হলেন Arjen Hoekstra। ২০০২ সালে তিনি বললেন, না শুধু আহরণ করা জলের হিসাব দিয়ে সত্যিকারের জলের ব্যবস্থাপনা করা যাবে না। আমাদের একটু উল্টো পথে হাঁটতে হবে। কে কতটা জল তুলছে তা নয়, কে কতটা জল ব্যবহার করছে তাই দিয়ে হিসাব হবে। কিন্তু তা শুধু চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া জলকে হিসেবের মধ্যে আনলে চলবে না, যে জলকে দেখা যায় না অথচ আমরা খরচ করছি, ব্যবহার করছি তাকেও হিসাবের মধ্যে আনতে হবে।

সেটা কীরকম ব্যাপার হল? যাকে দেখা যায় না তাকে কীভাবে হিসেবের মধ্যে আনব? Hoekstra এবং আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী বললেন আমাদের জীবনযাত্রায় জলের উপস্থিতি শুধু পান, স্নান, রান্না, আর ধোয়ার কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা যে খাবার খাচ্ছি, যে পোষাক পরছি, যে শক্তি খরচ করছি বা যে পরিষেবা গ্রহণ করছি তার সবের পিছনেই বিপুল পরমাণ জলের খরচ লুকিয়ে আছে। বিশেষ করে কৃষিতে খাদ্য উৎপাদন তো প্রচন্ডভাবে জলের উপর নির্ভরশীল আর তাতে যে পরিমাণ জল খরচ হয় তার কাছে স্নান, পান ইত্যাদি তো নস্যি। উদাহরণ হিসাবে তাঁরা দেখালেন যে সারা দিনে একজন শহুরে মানুষ খুব বেশি হলে ১৫০ লিটার জল খরচ করে কিন্তু তার প্রতিদিনের খাবার, পোষাক, বিদ্যুৎ ইত্যাদি তৈরি করতে কয়েক হাজার লিটার জল জল লাগে।

এই ভাবে জলকে দুটো ভাগ করা হল এক হল দেখতে পাওয়া জল বা রিয়েল ওয়াটার আর একটা হল না দেখা জল বা ভার্চুয়াল ওয়াটার।

এই ভাবনা থেকে তিনি একজন মানুষের বার্ষিক সব রকমের জল অর্থাৎ দেখতে পাওয়া জল আর না দেখতে পাওয়া জলের মোট খরচের পরিমাণকে তাঁরা বললেন একজন মানুষের জলের পদচিহ্ন বা ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট। আমরা জল ব্যবহারের মাধ্যমে জলসম্পদের একটা অংশকে দূষিত করি, যা আবার প্রকৃতিতে গিয়ে জমা হয়। এই জলকে ধূসর জল বলে। এই জলকে শোধন করে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন তাকেও ওয়াটার ফুটপ্রিন্টের হিসাবের মধ্যে আনা হল।

## নীল জল আর সবুজ জল

একজন শহুরে ব্যক্তি সাধারণত প্রতিদিন প্রায় ১৫০ লিটার জল ব্যবহার করেন। একটি গ্রামীণ পরিবার অনেক কম জল ব্যবহার করে। এই ব্যবহার পানীয়, স্নান, ধোয়া, বাগান ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা কোনও পণ্য উৎপাদন বা ক্ষেতে ফসল উৎপাদনের সময় যে জল খরচ হয় তা বিবেচনা করি না। ডাঙার ফসল সাধারণত নদী, হ্রদ বা ভূগর্ভস্থ জলের মতো জলের দৃশ্যমান উৎস থেকে জল গ্রহণ করে না যদি না ক্ষেত্রগুলিতে সেচ দেওয়া হয়। তারা শুধুমাত্র মৃত্তিকার জলের উপর নির্ভর করে যা প্রাণী বা মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই জলের পদচিহ্নের নতুন ধারণায় উৎসের উপর নির্ভর করে জলকে নীল জল এবং সবুজ জল এই দুভাগে ভাগ করা হল। নদী, হ্রদ, পুকুর এবং ভূগর্ভস্থ জলের মতো জলের দৃশ্যমান সমস্ত উৎসগুলিতে যে জল পাওয়া যায় তা নীল। কিন্তু মাটির রন্ধ্রে যে জল থাকে যা গাছপালা তার শেকড়ের সাহায্যে টেনে নেয় তাকে সবুজ জল বলে। আসলে প্রাকৃতিকভাবেই এই নীল জল আর সবুজ জলের বন্টন হয়। তবে তা দেশ বা স্থানভেদে বিভিন্ন।

পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়লে তা দুটি অংশে বিভক্ত হয়, নীল জল এবং সবুজ জল। নীল বনাম সবুজ জলের বৈশ্বিক অনুপাত ৩৫:৬৫। কিন্তু দেশভেদে তা পরিবর্তিত হয়। ঘানায় নীল বনাম সবুজের অনুপাত ২.৫:৯৭.৫ যেখানে ভারতে গড় অনুপাত ৩৫:৬৫। তবে ভারত বিশাল দেশ। এর বিভিন্ন অংশের জলবায়ু বিভিন্ন। তাই এই অনুপাত স্থানভেদে নানা রকম হতে পারে।

এই ওয়াটার ফুটপ্রিন্টের কনসেপ্ট একটা দেশের নিজস্ব জলসম্পদ, জল সংরক্ষণ, জিডিপি, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট, বিশ্ব বাণিজ্য, ইত্যাদিকে বিচার করার ক্ষেত্রে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলো।

## ভার্চুয়াল জল বা না দেখা জল

গাছপালা যে জল শোষন করে তা সরাসরি পরিমাপযোগ্য নয়। তবে নানা পরীক্ষার সাহায্যে প্রতিটি ধরণের উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা ফসল উৎপাদনের জন্য কী পরিমাণ জল লাগে তা অনুমান করা বা অঙ্ক কষে বের করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভিদের জল ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে সালোকসংশ্লেষের উপর। সালোকসংশ্লেষণের প্রক্রিয়াটির জন্য প্রচুর পরিমাণে জল দরকার। কার্বন গ্রহণ এবং উদ্ভিদের স্টোমাটার মাধ্যমে জলীয় বাষ্পের মুক্তির মধ্যে পরিমিতির সম্পর্ক অত্যন্ত গোলমেলে। একটি উদ্ভিদ একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড মোলকে সংশ্লেষিত করতে কত মোল

জল গ্রহণ করবে তা বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। দেখা গেছে অধিকাংশ কৃষিযোগ্য ফসলের ক্ষেত্রে একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড মোলকে সংশ্লিষ্ট করতে ৯০০ থেকে ১২০০ মোল জল লাগে। কোনো কোনো ফসলের ক্ষেত্রে এটা ৪০০০ মোল পর্যন্ত হতে পারে।

এই হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল এক ইউনিট ফসল উৎপাদন করতে গেলে তার থেকে বহুগুণ জল সালোকসংশ্লেষের মধ্য দিয়ে ব্যয়িত হচ্ছে। ফলে আরেকটি ধারণা তৈরি হল যার নাম দেওয়া হল যা ভার্চুয়াল জল বা না দেখা জল। ভার্চুয়াল জলের ধারণাটি প্রথমদিকে চালু করেছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান স্টাডিজের জন অ্যান্টনি অ্যালান। ভার্চুয়াল জল হল কোনও পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ। পণ্যটি একটি কৃষিজাত বা শিল্পজাত পণ্য হতে পারে। চাল, গম, শাকসব্জির মতো কৃষিপণ্যের জন্মাতে প্রচুর পরিমাণে জল প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, চাল, গম এবং আলুর ভার্চুয়াল জলের পরিমাণ যথাক্রমে ২৮৫০, ১৪০০ এবং ১০০০ লিটার/কেজি।

অ-উদ্ভিজ্জ খাদ্য উপাদানের জন্য আরো উচ্চ পরিমাণে জল প্রয়োজন। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে উত্তর আমেরিকাতে সবচেয়ে দক্ষ ব্রয়লার ফিড সিস্টেম এক ইউনিট ব্রয়লার উৎপাদন করতে ২.২ ইউনিট ফিড গ্রহণ করে। সুতরাং ২.২ কেজি ফিডের দ্বারা ১ কেজি ভোজ্য মাংস উৎপাদন করা যায়। গরুর মাংস এবং শুয়োরের মাংসে এই পরিমাণটি অনেক বেশি। এক কেজি হাড়হীন শুয়োরের মাংসের জন্য ১০ কেজি ফিড প্রয়োজন। ফিডটি সয়াবিন (প্রোটিনের জন্য) এবং কর্ন (কার্বোহাইড্রেটের জন্য) এর সংমিশ্রণ। এক কেজি ভুট্টা এবং সয়াবিন উৎপাদনের জন্য জলের প্রয়োজন যথাক্রমে ৫০০ লিটার এবং ১৯০০ লিটার। সুতরাং এক কেজি হাড়বিহীন শূকরের মাংসে ভার্চুয়াল জল কমপক্ষে ১৫০০০ লিটার।

উপরের হিসাব থেকে আমরা একজন ব্যক্তির জলের পদচিহ্ন বা ওয়াটার ফুটপ্রিন্টের ধারণা তৈরি করতে পারি। ভার্চুয়াল ওয়াটার যেমন একটি পণ্য বা একটি পরিষেবা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণের মাপ তেমনি ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট হল কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা দেশের জল ব্যবহারের খরচ ভিত্তিক অনুমান। একই পণ্যের ভার্চুয়াল ওয়াটার যেমন জলবায়ু এবং প্রযুক্তি উভয়ের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হতে পারে ঠিক তেমনি একটি দেশ বা ব্যক্তির ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট সেই ব্যক্তি বা সেই দেশের মানুষের জলবায়ু, আর্থসামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে।

একটু সহজ করে বলতে গেলে একজন ব্যক্তি সারা দিনে গড়ে যে পরিমাণ নীল জল খরচ করে এবং বিভিন্ন পণ্য (খাদ্যবস্তু এবং ভোগ্য পণ্য) ও পরিষেবা ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ ভার্চুয়াল ওয়াটার ব্যবহার করে তার মোট হল তার একদিনের গড় ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট। এর সাথে যোগ হবে সেই ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্য জল বা গ্রে ওয়াটারের পরিমাণ। তবে গ্রে ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট মাপার হিসেবটা একটু আলাদা। গ্রে ওয়াটার মানে দূষিত জল। সেই দূষিত জলকে আবার তার আগের গুণগত মানে নিয়ে যেতে তার সাথে যতটা বিশুদ্ধ জল মেশাতে হবে তার পরিমাণ হল গ্রে ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট।

তার মানে দাঁড়াল ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট = ব্লু ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট + ভার্চুয়াল ওয়াটার খরচ + গ্রে ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট এই ভাবে একজন ব্যক্তির বার্ষিক ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট হিসেব করা যায় এবং সারা দেশের প্রতিটি মানুষের সমন্বিত ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট হল সেই দেশের বার্ষিক ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট।

যদি আমরা একটি পরিবারের জলের পদচিহ্ন গণনা করার চেষ্টা করি তবে আমাদের প্রতিটি ব্যবহৃত পণ্যের মধ্যে যে ভার্চুয়াল ওয়াটার রয়েছে তাকে গণনার মধ্যে আনতে হবে। আমরা যে কৃষিজ পণ্য ব্যবহার করি তার মধ্যে ভার্চুয়াল ওয়াটার হিসাবে রয়েছে সবুজ জল এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রক্রিয়াকরণ ও বন্টনের জন্য যে পরিমাণ জল লেগেছে তা। এটা সেই খাদ্যবস্তুর ভার্চুয়াল জলের পরিমাণ এবং সেই সাথে যুক্ত হবে শক্তি ও জ্বালানী খরচের মাধ্যমে ভার্চুয়াল ওয়াটার খরচের পরিমাণ, কোনো পরিষেবা গ্রহণ করলে তার ভার্চুয়াল ওয়াটারের পরিমাণ এবং পানীয়, রান্না, ধোয়া, টয়লেটের জন্য ব্যবহৃত দৃশ্যমান জলের পরিমাণ। গৃহস্থালি থেকে উৎপাদিত বর্জ্য জল ধূসর জলের পদচিহ্নের হিসেবে আসবে। এইভাবে সব যোগ করলে একজন ব্যক্তি বা পরিবারের জলের পদচিহ্ন হিসাব করা যাবে। জলের পদচিহ্নের একক হল মাথাপিছু বছরে ঘনমিটার। একটা দেশের জনগণের গড় ব্যক্তিগত জলের পদচিহ্নের সাথে সেই দেশের জনসংখ্যা গুণ করলে একটা দেশের জলের পদচিহ্ন পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু জলের পদচিহ্ন বিভিন্ন। এই পদচিহ্ন সেই দেশের খাদ্যাভ্যাস, ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার মানের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। আমেরিকা, কানাডা, ইতালি ইত্যাদি দেশের উচ্চ পদচিহ্নের কারণ ভোগ্যপণ্যের অমিত ব্যবহার এবং খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ মাংসের উপস্থিতি। থাইল্যান্ডের এই পদচিহ্ন খুব বেশি হওয়ার কারণ সেই দেশের মানুষের খাদ্যে চাল এবং মাংসের প্রাচুর্য। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ এবং চিন এখনো সেভাবে প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করে না এবং খাদ্যে ভার্চুয়াল ওয়াটারের পরিমাণ কম। কিন্তু এই মাপ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই দেশগুলির মধ্যে ভারত ও চিনের জলের পদচিহ্ন দ্রুত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

জলের পদচিহ্ন নিয়ে যে সব ধারণা আজকাল গড়ে উঠেছে তা থেকে বিশ্বজোড়া জলসম্পদের সমস্যা ও তার থেকে উদ্ভুত সংঘাত অনেকটাই কমিয়ে ফেলা সম্ভব। যেমন ধরা যাক একটি দেশ বা দেশের কোনও একটি অঞ্চল যদি জলসম্পদে সমৃদ্ধ হয় সে কৃষি পণ্যের রপ্তানির মাধ্যমে জলক্লিষ্ট এলাকায় না দেখা জল রপ্তানি করতে পারবে। ফলে খাল কেটে এক এলাকার জল অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না। জলক্লিষ্ট এলাকাগুলি কৃষির বিকল্প হিসাবে শিল্প স্থাপণ করে (যেসব শিল্পে খুব কম জল লাগে) তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। মরোক্কো এই ভাবেই না দেখা জল আমদানি করে তাদের দেশের জলের সমস্যা অনেকটাই মিটিয়ে ফেলেছে। জলের পদচিহ্ন কোনও এলাকার ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি হতে পারে। কোনো এলাকা কৃষি থেকে শিল্পাঞ্চলে পরিবর্তিত হবে কিনা তা জলের পদচিহ্ন মেপেই কিছুটা বলে দেওয়া সম্ভব।

নীচের সারণীতে কয়েকটি দেশের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জলের পদচিহ্নের পরিমাণ দেখানো হল :

| দেশ | জাতীয় ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট (২০০৫) Gm$^3$/yr | মাথাপিছু ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট m$^3$/capita/year | জাতীয় ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট (২০২১) Gm$^3$/yr |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | ২৬.৫৬ | ১৩৯৩ | ২৮.৩১ |
| বাংলাদেশ | ১১৬.৪৯ | ৮৯৬ | ১২৮.১৪ |
| ব্রাজিল | ২৩৩.৫৯ | ১৩৮১ | ২৪৯.৯৪ |
| কানাডা | ৬২.৮ | ২০৪৯ | ৬৯.০৮ |
| চিন | ৮৮৩.৩৯ | ৭০২ | ৯১৮.৭ |
| ইজিপ্ট | ৬৯.৫ | ১০৯৭ | ৮৩.৮২ |
| ফ্রান্স | ১১০.১৯ | ১৮৭৫ | ১১৩.২৮ |
| জার্মানি | ১২৬.৯৫ | ১৫৪৫ | ১৩১.১৪ |
| ভারত | ৯৮৭.৩৯ | ৯৮০ | ১০৮৬.১৪ |
| ইন্দোনেশিয়া | ২৬৯.৯৬ | ১৩১৭ | ২৯৯.৬৬ |
| ইটালি | ১৩৪.৫৯ | ২৩৩২ | ১৩১.০০ |
| জাপান | ১৪৬.০৯ | ১১৫৩ | ১৪১.৫০ |
| জর্ডন | ৬.২৭ | ১৩০৩ | তথ্য নেই |
| মেক্সিকো | ১৪০.১৬ | ১৪৪১ | ১৫৫.৫৮ |
| নেদারল্যান্ড | ১৯.৪ | ১২২৩ | ২০.১৮ |
| পাকিস্তান | ১৬৬.২২ | ১২১৮ | ১৯৯.৪৬ |
| রাশিয়া | ২৭০.৯৮ | ১৮৫৮ | ২৭১.৪৪ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৯.৪৯ | ৯৩১ | ৪৪.৬২ |
| থাইল্যান্ড | ১৩৪.৪৬ | ২২২৩ | ১৩৮.৪৯ |
| ইংল্যান্ড | ৭৩.০৭ | ১২৪৫ | ৭৭.১৬ |
| আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র | ৬৯৬.০১ | ২৪৮৩ | ৭৩৫.৮৬ |

আমাদের দেশে জলের পদচিহ্ন নিয়ে গবেষণা অনেক পিছিয়ে আছে। মানুষ এখনো না দেখা জলকে ধারণার মধ্যে নিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু একদিন এই জলের পদচিহ্নের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলসমস্যার অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব হবে।

**তথ্যসূত্র**


1. Wang, D., Hubacek, K., Shan, Y., Gerbens-Leenes, W. & Liu, J. (2021) A review of water stress and water footprint accounting. Water, 13(2): 201
2. Cazcarro, I., Schyns, J.F., Arto, I. & Sanz, M.J. (2022) Nations' water footprints and virtual water trade of wood products. Advances in Water Resources, 164: 104188
3. Ji, X., Xie, D., Zhuo, L., Liu, Y., Feng, B. & Wu, P. (2022) Water Footprints, Intra-National Virtual Water Flows, and Associated Sustainability Related to Pork Production and Consumption: A Case for China. Water Resources Research, 58: e2021WR029809
4. Hoekstra, A.Y. (2007) Human Appropration of natural capital: Comparing ecological footprint and water footprint analysis. Value of Water, 23:
5. Chapagain AK, Hoekstra AY (2006) Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern, DOI 10.1007/s11269-006-9039-x
6. Mekonnen, M.M. & Hoekstra, A.Y. (2010) The green, blue and grey water footprint of farm crops and derived crop products. Value of Water, 47:


## জল কোথায় কী পরিমাণ

আমাদের দেশের জল সম্পদের উৎস তিনটি ভূ-পৃষ্ঠস্থ, ভূ-গর্ভস্থ ও বৃষ্টিপাত। পৃথিবীর মোট জলের পরিমাণ 140 কোটি ঘন কিলোমিটার, যার 97 শতাংশ লবণাক্ত, 2.31 শতাংশ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে বরফ হিসেবে এবং অবশিষ্ট 0.69 শতাংশ জল আমরা ব্যবহার করতে পারি। ভূপৃষ্ঠে জল সম্পদ পাহাড় পর্বতের তুষার ও বৃষ্টিপাত-এর উপর নির্ভর করে। তুষার গলা জল নির্ভর ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাশয় প্রধানতঃ বড় বড় নদীগুলি যার সংখ্যা আমাদের দেশে মোট 56টি। ভূপৃষ্ঠ থেকে 300 মিটার পর্যন্ত যে স্তরটি থাকে তাকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর হিসেবে ধরা হয়। Central Ground Water Board-এর মতে সমগ্র ভারতবর্ষে মোট 3.700 মিলিয়ন হেক্টর মিটার (মি.হে.মি.) জল সঞ্চিত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূ-গর্ভস্থ আহরণযোগ্য জলের পরিমাণ মাত্র 1.64 মি.হে.মি.। যদিও আহরণ করা হয় মাত্র 0.5 মি.হে.মি.। ভারতে বৃষ্টিপাত গড়ে বৎসরে 400 মি.হে.মি.। এর মধ্যে 70 মি.হে. বাষ্পে পরিণত হয়, 115 মি.হে.মি. নদী, নালা, খাল বিল প্রভৃতিতে জমা হয় এবং অবশিষ্ট 215 মি.হে.মি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পশ্চিমবঙ্গে বছরে গড়ে বৃষ্টিপাত 2000 মিলিমিটার। এই বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে পানীয় জলের জন্য ব্যবহার করার কোনো ব্যবস্থাই আমাদের দেশে নেই। Water shed Management-এর আওতায় বিভিন্ন জায়গায় বিল, বিল (মরা নদী)। এদের জলকে ধরে রেখে চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। চিন দেশে বড় বড় বিলের উপরের জলস্তরে মাছ ও হাঁস চাষ করা হয়। নীচের জলকে পরিশ্রুত করে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

কৃষিকাজে জলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় স্থানে শিল্প ও তৃতীয় স্থানে গৃহস্থালী। গৃহস্থালীতে পানীয় জলের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সর্বত্রই পানীয় জলের সংকট ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সমস্যাটি বিভিন্ন কারণে তৈরি হয়েছে। কারণ বর্ষাকালে বন্যা প্রতিরোধ করার মত কোনো পরিকল্পনা নেই অনুরূপভাবে খরার সময় নদী থেকে জল পাওয়া যায় না।

জলাভূমি
প্রকৃতির কিডনি
একে রক্ষা করতে হবে।

বিজ্ঞান দরবার

জলের ওপর দস্যুবৃত্তি

এ.কে.এম. বজলুল হক

# কার জন্য উৎপাদন, কার জন্য এই তীব্র জল সংকট?

*নদীর জল চুরি*

জল নেই, পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য নেই, লাভও নেই। আখেরে লাভ বেশি কর্পোরেটের।

সচেতনভাবে দেখলেই বোঝা যাবে একটা মারাত্মক চক্র কাজ করছে নির্দিষ্ট বিলিওনেয়ার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির জন্যই। সুতরাং অঙ্কটা খুবই সহজ, প্রতি বছর কত লিটার কোক উৎপাদিত হচ্ছে, তার সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ৪৫০ গুণ করলেই সারা বছরের জলের ব্যবহারের হিসেবটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই তীব্র গরমে এক বালতি জলে স্নান করে জল বাঁচানোর করুণ আর্জি দেখে মনে হয়, হায় আমাদের দেশে শিক্ষার বড্ড অভাব। প্রতিবাদের অভাব। যাঁরা ভাবছেন এভাবে জল বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আগামী দিনের নিষ্ঠুর সত্যটাকে একটু হলেও দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে, তাঁদের বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা নেহাতই মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

কোকাকোলার শুরু এই দেশে ১৯৯৩ সালে। প্রতিটি কোক ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টে দৈনিক ৫ লক্ষ লিটার জলের প্রয়োজন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ৫৮টি এরকম প্ল্যান্ট রয়েছে। অর্থাৎ সারা বছরে যে-জল ব্যবহার করা হয়, তা হল প্রায় ১০,৫৮৫ মিলিয়ন লিটার জল। অঙ্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিগত ২০ বছর ধরে এইভাবে চলছে, তাহলে জল খরচের হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে ২১১.৭ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। এবং সেটা অন্ততপক্ষে আগামী এক বছর ধরে সারা ভারতবর্ষের তেষ্টা মেটাতে সক্ষম ছিল।

এখানেই সমস্যা শেষ নয়। অপরিমিতভাবে জল ব্যবহারের পাশাপাশি প্ল্যান্টের এলাকার প্রায় ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে সকল জলের উৎসকে দূষিত করছে। যা একদিকে পানের যোগ্য নয়, অন্যদিকে কৃষিকাজে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। ফলে লেড, ক্যাডমিয়াম-এর মতো কার্সিনোজেনিক ধাতু মানসিক সমস্যা, কিডনি ফেলিওরের মতো বহু অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। সেই ধরনেরই একটা ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। কেরলের পালাক্কাড জেলা, তামিলনাড়ুর থিরুনেভেলি জেলা, উত্তর প্রদেশের মেহাদিগঞ্জ জেলা, মহারাষ্ট্রের থানে চরম সমস্যায় জর্জরিত হলে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে এই অঞ্চল থেকে কোকাকোলাকে তার সমস্ত প্রোডাকশন বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেছে। এভাবেই আন্দোলন করতে হবে জল দস্যুদের বিরুদ্ধে। নিজেদের দোষ দেবেন না। তার চেয়ে বরং প্রশ্ন করুন তাদের, যাদের জন্য এই তীব্র সংকট, যাদের জন্য আগামী দিনে জলের অভাবে মৃত্যু একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। মনে রাখবেন শুধুমাত্র নিজের জন্য বরাদ্দ জলের প্রয়োজন কমিয়ে মূল সমস্যার সমাধান বাস্তবে কোনোদিন সম্ভব নয়।

এক লিটার বোতল ভর্তি জল তৈরি করতে যে-জল তোলা হয়, তার ৬৬ শতাংশ মাত্র ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ বাকি ৩৪ শতাংশ নষ্ট হয়। আজ ভাবুন তো প্রতিটি সরকার যদি বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করত তা হলে কি এইসব ইন্ডাস্ট্রি এত রমরমিয়ে বাড়ত? ভারত জুড়ে জলের সংকট ঘটিয়ে ব্যবসা করছে তিনটি প্রধান ইন্ডাস্ট্রি— ১. বোরওয়েল ইন্ডাস্ট্রি, ২. ওয়াটার ট্যাঙ্কার, আর ৩. ক্যাশ ক্রপ ইন্ডাস্ট্রি। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে গোটা দেশ-বিদেশের রাজনীতি, কর্পোরেট আর মাফিয়া গোষ্ঠী। অথচ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে, 'জলের মতো পয়সা খরচ আর নয়, জলকে পয়সার মতো খরচ করতে হবে'। প্রশ্ন করবেন না— কেন? প্রশ্ন করা বারণ, না কি এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাঁরা দেবেন না। উত্তরটা জলের মতো পরিষ্কার। ভারতবর্ষ প্রতিবছর যে-পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করে, তা আমেরিকা ও চীনের সম্মিলিতভাবে উত্তোলিত জলের থেকেও বেশি। তার পরেও কৃষিতে এত জলের সমস্যা কেন? কৃষকদের শয়ে শয়ে মৃত্যু কেন?

তথ্য বলছে পেপসি, কোকাকোলা জাতীয় পানীয়, স্পঞ্জ আয়রন (যার উৎপাদন এদেশে নাকি নিষিদ্ধ), বিভিন্ন স্টিল কোম্পানিগুলিতে সবচেয়ে বেশি জল ব্যবহার করা হয়। কোকাকোলা কোম্পানির সারা বছরের জল ব্যবহারের হিসেব করলে আপনি স্তম্ভিত হবেন। প্রতি লিটার কোকাকোলা প্রস্তুত করতে প্রায় ৯ লিটার জলের প্রয়োজন (২০০০ সালের তথ্য)। কিন্তু পানীয়টির প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল এনালিসিস করলে অবশ্য আরও ভয়ানক তথ্যটি প্রকাশ পেয়ে যাবে। প্রতি লিটার কোকাকোলায় যে-পরিমাণ চিনি ব্যবহার করা হয়, তা উৎপাদন করার জন্য প্রায় ৪৫০ লিটার জলের প্রয়োজন। আমরা সবাই পাগল, তাই তথ্যটা পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে। আসলে এটাই সত্য। চিনি ক্রয় করার লিস্টে তৃতীয় স্থানে পেপসিকো। তাইতো চাষের ব্যাপারেও কোন চাষ করতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়— সেটাও লক্ষণীয় বিষয়, সেখানেও তাদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তাইতো জোয়ার, বাজরা, গম ছেড়ে সর্বত্র বাদাম এবং বিশেষ করে আখের চাষ করার জন্য বেশি বেশি প্ররোচনা ও লোন দেওয়া হয়। অথচ এক একর আখের চাষের জন্য প্রয়োজন বছরে ১৮০ লক্ষ লিটার জল। খাদ্যশস্য ফলনে সেখানে প্রয়োজন মাত্র ১৮ লক্ষ লিটার জল। তাইতো চাষিদের

মা ন স প্র তি ম দা স

# জল ও মাটির বিপন্নতার ধারাবাহিকতা

*মাটি, জল আর মানুষের দুর্দশার গাথা এক সূত্রে বাঁধা। পরিসংখ্যান দিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করা যায় ঠিকই কিন্তু অনুভবে কোথাও যেন ঘাটতি থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা এই দুর্দশাকে এনে দেয় অনুভবের বৃত্তে। মানুষের গভীরতম সঙ্কট যে নির্দিষ্ট কোনও কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নেই, তা যে চিরকালীন, আমাদের সেটা বোঝাতে চিরসচেষ্ট ছিলেন রবিঠাকুর।*

'একটা সমাজে যখন একজন ব্যক্তি বা কোনও গোষ্ঠীর লোভ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে চলার সুযোগ দেওয়া হয়, আর সেটাকে উৎসাহিত বা এমনকি প্রশংসা করে জনগণ, তখন গণতন্ত্র আর ধরা দেয় না। এমন একটা আবহে সর্বজনীন সংস্থাগুলোর দখল নেওয়ার জন্য একে অন্যের সঙ্গে নিরন্তর সঙ্ঘর্ষে মেতে থাকে মানুষ যতক্ষণ না তাদের উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ হয়।'[১]

কথাগুলো বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এই বক্তৃতার ভাষ্য ছাপা হয়েছিল মডার্ন রিভিউ পত্রিকায়। আজ আমরা যাঁরা পড়ছি কথাগুলো তাঁদের মনে হতে পারে যে বক্তৃতার বিষয় ছিল গণতন্ত্রের বিকাশ বা সমাজের গঠন জাতীয় কিছু একটা। যেহেতু কথাগুলো বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাই মন দিয়ে না পড়লেও একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারছি না সেগুলোকে। এদিকে মনযোগ দিয়ে থাকলে একটা আলতো দুঃখ হয়ত তৈরি হচ্ছে সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে, হয়ত ভাবছি যে যা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তা এখনও কত সত্যি! অস্বীকার করে লাভ নেই যে এইরকমই হয় প্রতিক্রিয়াগুলো। এর সঙ্গে মিশে থাকে সমাজের অবনতির জন্য সব দোষ অন্যের ঘাড়ে দিয়ে দেওয়া, নিজেকে নিষ্কলুষ ভাবা। ভুলের বেড়া ডিঙিয়ে আসল কথাটা জানার চেষ্টা করা যাক।

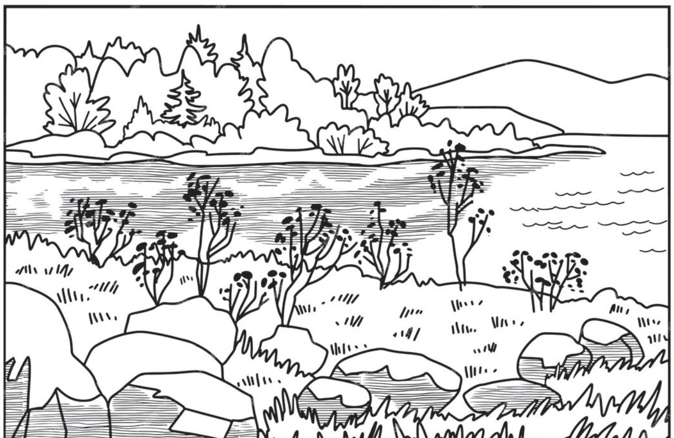

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ছিল ইংরেজিতে, শিরোনাম ছিল 'রবারি অফ দ্য সয়েল'। একালের একজন সুদক্ষ অনুবাদক গোটা ভাষণের বঙ্গানুবাদ করে শিরোনাম দিয়েছেন 'ভূসম্পদের বিত্তহরণ'।[২] আসলে কবি পাঠ করেছিলেন ভূমিকা, মূল বক্তব্য পাঠের কাজ ছিল একজন কৃষিবিদের। তাঁর বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ কাউকে আলাদা করে 'নির্দোষ' বলে চিহ্নিত করেন নি। বরং বলেছেন যে আজ সম্পদ ও বিত্তের আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে বাস করা কিছু মানুষের দখলে আমাদের সভ্যতা। নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন,

'...আবিশ্ব এই লোভ যা আমাদের সবাইকে আক্রান্ত করেছে তা সব ধরণের সঙ্কীর্ণতা, রাজনীতি ও বাণিজ্যে সব ধরণের নির্মমতা এবং মিথ্যাচারের মূলে এবং এটা ভয়াবহ করে তুলেছে গোটা মানবিক পরিবেশকে।...'

তিনি গ্রামের কথা এনেছেন, স্বাভাবিকভাবেই বলেছেন লোভী মানুষের হাতে জমির দখলের কথা। উদ্বিগ্ন কবি আবেদন জানিয়েছেন মাটিকে সজীব রাখার জন্য, মাটি থেকে যা নিচ্ছি তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই দিন 'হতে শতবর্ষ পরে', কোনও বহুতলে বসে কেউ হয়ত পড়বেন রবীন্দ্রনাথের এই লেখা। আহা-আহা করে উঠবেন উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ, অন্য কেউ হয়ত বলবেন এসব ওই ১৯২২ সালের জন্যই ঠিক ছিল। আজকের সময়টা কত আলাদা, জনসংখ্যা কত বিপুল, উন্নয়নের চাহিদা মেটানোর দায় রয়ে গিয়েছে সমাজের!

পরিসংখ্যান দিয়ে, প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে জমির স্বাস্থ্যের অবনমনের কথা বলার কাজ বিজ্ঞানীর, ভূতাত্ত্বিকের, কৃষিবিদের। রবীন্দ্রনাথের নয়। ১৯২২ সালের সেই দিনটিতে এ কাজ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কৃষি ভাবনার রূপকার লেনার্ড এল্মহার্স্ট। কিন্তু শুকনো কথায়, নিখাদ তথ্যে মন ভেজে না। তাই হয়ত তাঁর নিজের মত করে, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল কিছু কথা। যাই হোক, এই সময়েই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক — মুক্তধারা। সে নাটক আসলে ক্ষমতার দম্ভের বিরুদ্ধে, ক্ষমতাশালী মানুষের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত নাগরিকের বিদ্রোহের বয়ান। রাজার আদেশ পেয়ে উত্তরকূটের যন্ত্রবিদ বিভূতি বেঁধে ফেলেছে মুক্তধারার জলপ্রবাহ। উত্তরকূটের সুখ এল শিবতরাইয়ের প্রজাদের অপরিসীম কষ্টের বিনিময়ে। সংলাপে ধরা পড়েছে সেই অনাচারঃ

'দূত। এত কাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝর্নাকে বাধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি। দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত—

বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি। বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন চাষির কোনভুট্টার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন, এখনও কি ভাববার সময় হয় নি?

বিভূতি। না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।'[৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েকটা বছর ইউরোপ বা আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই নাটক রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ ঘুরেছেন পাশ্চাত্যে। সেখানকার বিত্তলোভ ব্যথিত করেছে তাঁকে। অন্ততঃ এণ্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে সেই লোভ আর একইসঙ্গে ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রসঙ্গ এসেছে ঘুরেফিরে। মানুষের উচ্চাকাঙ্খা আর ক্ষমতাধারণে বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরে ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে কবি এণ্ড্রুজকে লিখেছেন,

'The mischief is that ambition does not fully believe in love. It believes in power. It leaves the limpid and singing water of everlasting life for the wine of success.'[৪]

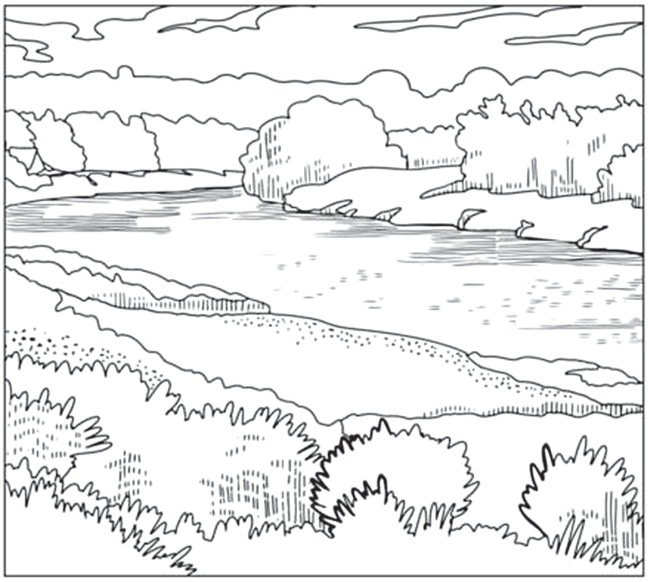

উচ্চাকাঙ্খা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না ভালোবাসায়, তার বিশ্বাস ক্ষমতায়। সাফল্যের মাদকতায় আসক্ত হয়ে সে শাশ্বত জীবনের স্বচ্ছতোয়ার কলধ্বনিকে ফেলে যায় এগিয়ে। সাফল্যকে হাতের মুঠোয় ধরতে ক্ষমতার ব্যবহারের এই আখ্যানই এসেছে মুক্তধারা নাটকের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সব লেখা স্বতন্ত্র, একটার সঙ্গে কোনও যোগ নেই অন্য একটার — এমন ভাবার অর্থ হয় না। বৈচিত্র্যের মধ্যেও চেতনার একটা সুস্পষ্ট ধারা ফুটে ওঠেই, অভিজ্ঞ পাঠকের চোখ এড়ায় না সেটা। কিন্তু এসব স্বীকারের পরেও বলতে হয় যে 'মুক্তধারা' আলাদা। সেখানে যেভাবে এসেছে দৃশ্যপট, যেভাবে এসেছে ক্লাইম্যাক্স তাকে নিছক 'রাবেন্দ্রিক' বলে দেগে দেওয়ার স্পর্ধা নেই সমালোচকের। 'রক্তকরবী' নাটকেও এসেছে দম্ভ আর ক্ষমতার আস্ফালনের এই বয়ান। সেটা মুক্তধারার থেকে অনেক বেশি রূঢ়। রাজা সেখানে নন্দিনীকে বলেন,

'নেপথ্যে

সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই-সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন! একদিন দাহন ক'রে তাকে বের ক'রবো তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর?

নেপথ্যে

আমি হয় পাবো, নয় নষ্ট করবো। যাকে পাইনে তা'কে দয়া কর্তে পারিনে ! তাকে ভেঙে-ফেলাও খুব এক-রকম ক'রে পাওয়া।'[৫]

এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশে কয়েকটা কথা আছে যা মাটি কিংবা জল অথবা মানুষ — সবার দুর্দশার মূল কারণকে সূত্রায়িত করে ঃ

'কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এসম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ ক''রে থাকি। কৃষি-কাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষি-পল্লীকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্ছে। তা ছাড়া, শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বেষ-হিংসা বিলাস বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।'[৬]

তবে মুক্তধারা হোক বা রক্তকরবী, ক্ষমতাবান সেখানে অবশেষে হার স্বীকার করেন। নাটকের সামান্য পরিসরে উদ্বেগ জাগিয়ে সেটার নিরসন করে দেওয়াকেই উচিত কাজ বলে মনে করেন রচনাকার। উদ্বেগটা জীইয়ে রাখার সাহস বড় দুঃসাহস বলে মনে হয় স্রষ্টার। কিন্তু বাস্তবের জগতে তো তা হওয়ার নয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ক্ষমতাবানের হাতে বন্দী হয়ে থাকে মাটি, বন্দী থাকে জল, রুদ্ধ হয় মানুষের স্বাধীনতা। পরিসংখ্যান দিয়ে এই ধারাবাহিকতা বোঝানোর চেষ্টা অকারণ পুনরাবৃত্তি মাত্র। একটা বড় বাঁধ তৈরি হয়ে গেলে আর সেটাকে ত্রুটি বলে মানতে চান না কোনও রাজা, থুড়ি প্রশাসক। প্রচুর জলের যোগান দিতে গিয়ে ভূগর্ভের ভাণ্ডার নিঃশেষ হওয়ার চিহ্ন যখন স্পষ্ট, তখনও থামতে পারে না রাষ্ট্র। নিজের ভূখণ্ডে সরবরাহের জন্য চরম স্বার্থপরের মত মুক্তধারাকে বেঁধে ফেলে দশকের পর দশক ধরে কূটনীতি আর সমরনীতির খেলা চলে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে। বিকল্পের শত পথ খোলা আছে জেনেও এই গা-জোয়ারি থেকে সরতে ভয় পান শাসক। তবে নিজের যাবতীয় কুকর্মের জন্য সমর্থন জোগাড় করতে আক্রমণ চলে নাগরিকের মগজে। সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হয় সমাজের অংশবিশেষকে। তখন হুল্লোড়-সর্বস্ব ক্রিকেটের জন্য জলের বিপুল, অস্বাভাবিক যোগান নিয়ে প্রশ্ন যায় থেমে! এখন কথা হল, এই যে এক-আধটা দৃষ্টান্ত দিয়ে সমস্যাগুলোর আধুনিক রূপকে ফুটিয়ে তুলতে চাইছি তা কি সত্যিই আধুনিক? ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ

'আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।'[৭]

জলের নিঃশেষ হওয়া, জলের ভাণ্ডারকে অফুরান ভেবে লুঠ করা - এ সবই চিরন্তন। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-পর্বের পর সে কথাই বলেছিলেন এল্মহার্স্ট। বলেছিলেন বীরভূমের জল আর মাটির সুস্থতা নষ্ট করে কৃষির ফসল নিয়ে বেহিসেবী বাণিজ্য করার কথা। ইংরেজিতে হলেও তার সামান্য একটু উদ্ধৃত করতে বোধহয় বাধা নেই। কৃষিবিদ বলছেন,

'In the olden days enough pulse and sugarcane were grown in Birbhum to satisfy the needs of the community. No food was exported. Now rice is– with a few exceptions– the only crop. The growing of a rabi crop demands

community effort in irrigation– except where one man is rich enough to do things for himself. Of this rice little or nothing finds its way back to the fields. Ease of communication enables the middleman to purchase the bulk of it and to ship it off to Calcutta– or to the coal fields– and the waste products which the soil needs pass in the form of dung and urine down the sewer into the river.'[৮]

বাংলাতেও লেখা যাক কথাগুলো—পুরনো দিনে জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটানোর মত যথেষ্ট দানাশস্য ও আখ উৎপন্ন হত বীরভূমে। কোনও খাবার রপ্তানি হত না। কয়েকটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে এখন ধানই একমাত্র শস্য। রবিশস্য উৎপাদন করতে হলে গোষ্ঠীর সবাই মিলে সেচের কাজে লাগতে হয় যদি না কোনও একজন সবটাই নিজে করে নেওয়ার মত ধনী হয়। এই ধানের মধ্যে গ্রাম পায় যৎসামান্য বা হয়ত কিছুই নয়। যোগাযোগ সহজ হয়ে যাওয়ায় ফড়েরা এর বেশিরভাগটা কিনে নিয়ে কলকাতা বা কয়লাখনি এলাকায় চালান করে দেয়। বর্জ্য যে জিনিসগুলো ক্ষেতের জন্য দরকার তা মলমূত্র হিসাবে নর্দমায় মেশে এবং সেখান থেকে চলে যায় নদীতে।

কৃষির বৈচিত্র্য ঘুচে গিয়ে ধানই তখন হয়ে গেল বীরভূমের একমাত্র ফসল। তার অনেকটাই রপ্তানি হয় কলকাতা বা কয়লাখনিতে। বড় কথা যেটা তা হল ধানচাষের জন্য জলের বিপুল প্রয়োজনীয়তা রিক্ত করতে শুরু করল মাটিকে। কে না জানেন, এক কিলোগ্রাম ধান চাষ করতে প্রয়োজন হয় তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার লিটার জলের।[৯] বিংশ শতকের শুরুর দিকে বর্ণনা করা সেই দুরবস্থার কিছুমাত্র কি পরিবর্তন হয়েছে আজ? সমালোচক বড়জোর বলতে পারেন—নিশ্চয়ই হয়েছে, বেড়েছে প্রকৃতির ভাণ্ডার রিক্ত করার বেগ।

তবু রবিঠাকুরের কথা মেনে বলতেই হয়—সমস্যাটা তো সেই চিরকালীন! সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

**তথ্যসূত্র**


১। Leonard K Elmhirst, Poet and Plowman, Visva Bharati, Calcutta, 1975, September, p. 32-41

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পত্তি আর সম্পদ ভূসম্পদের বিত্তহরণ, সন্দীপ বন্দোপাধ্যায় (অনুবাদ), তবুও প্রয়াস, ২০০৬

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুক্তধারা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৭ জুন, পৃ. ১২

৪। Rabindranath Tagore– LETTERS TO A FRIEND– Edited with Two Introductory Essays by C. F. ANDREWS– GEORGE ALLEN & UNWIN LTD, London, 1926, p. 106

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৩, পৃ. ৫১

৬। ঐ, প্রস্তাবনা

৭। ঐ

৮। পূর্বে উল্লিখিত, দ্রষ্টব্য ১, পৃ. ৪৬

৯। Living Waters, Conserving the source of life, WWF Publication,https, assets.wwf.org.uk downloads thirstycrops. pdf


'এই যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে।

আমরা যেন ভালোবাসিয়া ইহার মৃত্তিকাকে উর্বর করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফুল পুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করি।'

*—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

## জল যখন সকলকে টেক্কা দেয়

স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ—এসব ব্যাপারে জলের সেরকম কিছু নতুনত্ব না থাকলেও তার এমন একটা ব্যাপার আছে যা আমরা রোজ দেখছি কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি যে, তার মধ্যে অভিনবত্ব কোথায়? জলে চিনি গুলে ফেলা বা নুন গুলে ফেলা—এতো আমাদের প্রত্যেকের প্রতিদিনকার দেখা ঘটনা। এ ব্যাপারে যে জলের একটা অভিনবত্ব আছে তা কি কোনোদিন আমাদের মাথায় এসেছে? শুধু নুন চিনি কেন, আরো নানারকমের লবণ, অ্যালকোহল, অ্যাসিড ও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস জলে গুলে যায়। বলতে গেলে কেউ বাদ যায় না। এ ব্যাপারে জল সকলকে টেক্কা দেয়। বিজ্ঞানীরা তো বলেন এখনো পর্যন্ত যত জিনিস তাঁদের জানা আছে তার প্রায় অর্ধেকই জলে গুলে যায় যা আর কোনো জিনিসে হয় না। এজন্য জলের নামে তাঁরা একটা তক্‌মাও এঁটে দিয়েছেন—বলেছেন, জল হল একটা 'সর্বজনীন দ্রাবক'। এ স্বীকৃতি আর কারো জোটেনি।

এক গ্লাস জলে যখন চিনি বা নুন দেওয়া হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই আর নুন-চিনির দেখা পাওয়া যায় না। তারা কোথায় গেল? এ কি ম্যাজিক নাকি? আমরা বলি নুন-চিনি জলে গুলে গেল। এখানে নুন বা চিনিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হচ্ছে দ্রাব্য, জলকে বলা হচ্ছে দ্রাবক, আর নুন-জল বা চিনি-জলের মিশ্রণকে বলা হচ্ছে দ্রবণ।

এখন নুন-চিনি তো জলে গুলে গেল। আসলে ব্যাপারটা কী হল? চিনি-জলের দ্রবণ, যাকে আমরা সরবত বলি, তার কথাটাই আগে বলি। চিনি যখন জলে দেওয়া হল তখন তার মধ্যে বেশ কয়েক রকমের টানাটানি, মানে আকর্ষণ বল কাজ করে। একটা হল চিনির অণুদের মধ্যে, দ্বিতীয়টা হল জলের অণুদের মধ্যে, আর তৃতীয়টা হল চিনির অণু ও জলের অণুদের মধ্যে। জলের অণুগুলি চিনির অণুগুলিকে যে বলে কাছে টানে সেভাবে চিনি বা জল কেউই তাদের নিজেদের অণুকে কাছে টেনে রাখতে পারে না। সেজন্য চিনির দানা থেকে চিনির অণুগুলি জলের অণুর আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলের অণুগুলির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ে। জল তো তরল, তার অণুগুলোর মধ্যে ফাঁক এমনিতেই বেশি। তাই জলের অণুর ভিড়ে জায়গা করে নিতে পারে না।

*—যুগল কান্তি রায়*

অ নু প ম পা ল

# জলের অপচয়

*নেসলে কোম্পানীর এক কর্তা বলেছিলেন মানুষের বিনা পয়সায় জল পাওয়া উচিত নয়! বিশ্ব বানিজ্য চুক্তির জমানায় তাহলে হয়ত কেউ বলবেন বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অক্সিজেনও বিনা পয়সায় পাওয়া উচিত নয়। বিশ্ব বানিজ্য চুক্তির পর কিছু বহুজাতিক কোম্পানীর বিকৃত মনের মানুষের শয়তানি নজরে এসেছে। তবে জলের অপচয় রোধের জন্য মিটার বসানো হচ্ছে। গ্রামের নল বাহিত জলের মুখ খোলা থাকায় প্রচুর জল অপচয় হয় গ্রীষ্মকালে। এমনকি ঝাড়গ্রামের মত জায়গায়। চারিদিকে প্লাস্টিকের বোতলে জল বিক্রি হচ্ছে। ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় বিশুদ্ধ ঝরনার জল ছেড়ে বোতলের জল পান করছেন। 'বিশুদ্ধ' জল খাওয়ার জন্য পরিবেশ দূষণ ভয়ানক বেড়েছে। তথাকথিত উন্নয়নের জন্য মাটির তলার জল বিক্রি করা হচ্ছে। জলে পেস্টিসাইড, ভারী ধাতু, আর্সেনিক, ফ্লোরাইড পাওয়া যাচ্ছে। লিকেজের কারণে নল বাহিত জলে জীবাণুর সংক্রমণ দেখা যায়। নানা ধরনের জলবাহিত রোগ, পেটের রোগের প্রকোপ গ্রীষ্মকালে বাড়ে। আগে পানীয় জল হিসাবে নদীর জল ও পুকুরের জল ব্যবহার করা হত। সুন্দরবনে ও বাঁকুড়ায় এখনও কিছু পানীয় জলের পুকুর আছে। সেখানে পরিচ্ছনতা আজও বজায় রাখা হয়। বাসন মাজা, স্নান করা নৈন নৈব চ। সেই জল খেয়ে কত জনের পেট খারাপ হয়েছে বলে নজির নেই। আবার লাদাখে আধুনিকতার নিরিখে গ্রামেও তথাকথিত স্যানিটিরী পায়খানা তৈরি করা হয়েছে যেখানে অনেক বেশী জল ব্যবহার করতে হয়। নল বাহিত জলের ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু ওই পাহাড়ি অঞ্চলে বর্ষার সময় স্যানিটারী পায়খানার লিকেজের জল অন্য জলের সাথে মিশে মানুষের রোগ বাড়ছে। বোরো ধান নিয়ে বলা হয় কৃষকরা মাটির তলার জল তুলে চাষ করার জন্য জল তল নেমে যাচ্ছে। অবশ্যই। কিন্তু জল জমিতেই থাকে সেখান থেকে চুঁইয়ে মাটির তলায় যায়। অন্যদিকে বহুতল বাড়িতে সারা বছর লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল তোলা হচ্ছে, ব্যবহারের পর সবটাই কনক্রিটের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রিচার্জ হচ্ছে খুব সামান্য। বহুতলে জলের ব্যবহার বোরো চাষের থেকে অনেক গুণ বেশি। বহুতলে বৃষ্টির জল ধরার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ ১৮৬৮ সালে জিব্রালটারে বাধ্যতামূলক বৃষ্টির জল ধরার আইন করা হয়। আমাদের দেশে ত্রিপুরার ভ্যাগামান গ্রামের সব বাড়িতেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা হয়।*

*ত্রিপুরার ভ্যাগামান গ্রামের বাড়িতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ*

**প্রকৃতি বান্ধব কৃষির ধ্বংস**

বিধ্বংসী রাসায়নিক কৃষি চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় ১০০০০ বছর মানুষ কৃষি কাজের জন্য প্রকৃতিকে নিয়ে চলতেন। সেচ করা হত নদী, খাল, বিল, পুকুর থেকে। অরঘট্টে (পারসিয়ান হুইল) বলদ বা উট দিয়ে ধীরে ধীরে বড় ইঁদারা থেকে জল তুলে সেচ করা হত শীতকালে বা শীতের শেষে। কিছুটা বিশ্রাম দিয়ে জল তোলা হত ততক্ষণে জল ইঁদরাতে জমার সুযোগ পায় এবং পশুরও বিশ্রাম হত। খাল থেকে দ্রোন দিয়ে সেচ করা হত। বর্ষাকালে কুয়োর জল দিয়ে বা গভীর নলকূপের জল দিয়ে উঁচু জমিতে ধান চাষ হত না। তখন বর্ষার বৃষ্টিও ঠিক সময়ে হত। ফসলেই সঞ্চিত হয় মাটির বিভিন্ন মৌল ও জল। কিন্তু ফসলের মাধ্যমে মাটির খাদ্যপ্রাণ-নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, সালফার, অনুখাদ্য ও জল চালান হয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে, গ্রাম থেকে অনেক দূরে। শহর থেকে জল ও খনিজ আর ফেরত আসে না। কার্ল মার্ক্সের এই ধারণাকে বলা হচ্ছে মেটাবলিক রিফ্‌ট। নগরায়নে মানুষ এখন শহরমুখি, শহর আর গ্রামের মধ্যে অনেক পার্থক্য বাড়ছে। খাদ্য সংকট নিরসনের জন্য মার্কিন কৃষি দপ্তরের ইকোনমিক রিসার্চ সার্ভিস ১৯৬১ সাল থেকে চাল ও গমকে বেছে নেয়। কিন্তু ভারতে মিলেটের চল ছিল এবং বহু মানুষই মিলেট খেয়ে থাকেন। আসলে মিলেট শুকনো জায়গায় হয়। বিষ, সার ও সেচ কোনটাই লাগে না। বীজও কিনতে হয় না। ভারতের মোট খাদ্যের প্রায় ৫০% আসে প্রাপ্ত সুখা জায়গার থেকে। সেখানে সেচের অভাবে ফসল মার খাওয়ার সম্ভবনা নেই। সুতরাং মিলেটকে ধরলে কৃষি উপকরণের ব্যবসা হবে না। মার্কিন কৃষিতে মিলেটের উল্লেখ নেই। সুতরাং ভারতের কৃষিকে উন্নত না করে ওদের মুনাফা হবে এমন ফসলের প্রচলন হল সবুজ বিপ্লবের নামে।

প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে কোন সমাজ ব্যবস্থা বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারে না। কৃষিও এর ব্যতিক্রম নয়। বহু ক্ষেত্রেই মানুষের অপরিকল্পিত কার্যপদ্ধতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তীব্রতা, পরিবেশ দূষণ ও রোগ ভোগ। যেমন অপরিকল্পিত ভাবে নদী বাঁধ নির্মাণ, নদী সংযোগ, বৃহৎ সেচ প্রকল্প, অরণ্য ও জলাভূমি ধ্বংস করে উন্নয়ন ইত্যাদি। বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, খরা, ঝড়, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, কূলের ভাঙন কোনটাই মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পৃথিবী ক্রমশ গরম হচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, ফসল উৎপাদন কমছে, অল্পবৃষ্টি বাড়ছে।

শুধু জলের হিসাব ধরলে দেখা যায় ১ কেজি ধান/মাংস উৎপাদন করতে (মেয়াদ অনুযায়ী) ৩০০০-৪০০০ লিটার জল লাগে। যেখানে ডালশস্য ও গমে ধানের ৫ ভাগের ১ ভাগ জল লাগে। সুতরাং এক বিঘা বোরো ধানের জমিতে মাটির তলার জল লাগবে ১২ কোটি লিটার। রাসায়নিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রকৃতির সুরক্ষার কথা ভাবা হয়না। কৃষক ধানের দাম পায় না তবুও নেশার মত বোরো মরশুমে সুযোগ পেলেই ধান চাষ করবে। আবার গভীর নলকূপ এলাকায় কৃষক বিচ্ছিন্ন ভাবে বা কম জলে হবে এমন ফসল যেমন ডাল শস্য ও সরিষা চাষ করতে পারবে না। কিছু কৃষকের ইচ্ছা থাকলেও করতে পারবেন না।

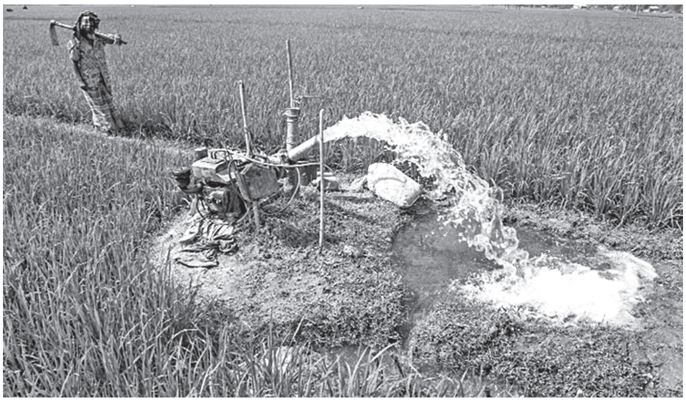

*বোরোধানে মাটির তলার জলের ব্যবহার*

## রাসায়নিক কৃষি ও জলের চাহিদা

রাসায়নিক কৃষির সাথে কৃষিতে জলেরও চাহিদা বাড়ল। কারণ গাছের খাবার রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার পর জলসেচ না দিলে সার লবন দ্রবীভূত হবে না এবং ফসল গ্রহণ করতে পারবে না। অন্যদিকে মাটির খাবার জৈব সার প্রয়োগ করলে জমিতে আলাদা করে সেচের প্রয়োজন হয় না যদি না মাটি রস পর্যাপ্ত থাকে। এক ফসলী থেকে তিন ফসলী করাবার জন্য সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোন কোন কৃষি বাস্তুতন্ত্রে এক ফসলী স্বাভাবিক। উঁচু টাঁড় জমিতে জোর করে মাটির তলার জল তুলে ধান চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর জন্য বিভিন্ন পাম্প সেট কেনার জন্য ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। সরকারি খরচে গভীর নলকূপ, নদী সেচ প্রকল্প ও নদী বাঁধ প্রকল্প চালু হয়েছে। মাটির তলায় লম্বা আকৃতির সাবমারসিবল পাম্প চালান করে দেওয়া হচ্ছে। জল 'পালাতে' পারবে না। এক সাথে দুটো সাবমারসিবল পাম্প দেওয়া হচ্ছে আরো বেশি ও দ্রুত জল পাওয়ার জন্য। মাটির তলার জল সবথেকে দামি জল, খাওয়ার জল। সমুদ্রের লবনাক্ত জল খাওয়ার উপযোগী নয়। সঞ্চিত থাকে এবং উপরের বৃষ্টির জলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে চুঁইয়ে নীচে সঞ্চিত হতে থাকে। কিন্তু ১০ লক্ষ গ্যালন জল যদি  সঞ্চিত থাকে সেখান থেকে দ্রুত যদি ৭ লক্ষ গ্যালন তুলে নেওয়া হলে পুনরায় জল সঞ্চিত হতে সময় লাগবে। কিন্তু তার আগেই অনিয়ন্ত্রিত ভাবে জল তুলে নেওয়ার ফলে আকুইফার (ভুগর্ভস্থ জলের লেয়ার) শুকিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে ৫০ টির ব্লকে জলতল বিপদজনক জায়গায় পৌঁছেছে। গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স এসেসমেন্ট (জি ডব্লিউ আর এ) এর সমীক্ষা দেখা যাচ্ছে জল তোলার পরিমাণ ৫০ এর নীচে (৪৪-৪৭%)। কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় মাটির তলা থেকে আর জল উঠছে না।

স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডাইরেক্টরেট গভীর নলকূপ খননের অনুমতি প্রদান করে। ২০১০-১২ সালেও ছিল। ইদানিং যে যার মত অগভীর ও গভীর নলকূপ বসিয়ে নিচ্ছেন। সরকারি ভর্তুকিও মিলছে। বৃহৎ সেচ প্রকল্প ও সেচ খালের জন্য একাদশ পকপ্রণালী প্রকল্পে বরাদ্দকৃত ৫০ বিলিয়ন ডলার অর্থের সদ্ব্যবহার নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ভাকরার সেচ সেবিত এলাকার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ কৃষক সেচ খালের জল গ্রহণ করতে পারে না। কারণ চাহিদার তুলনায় জলের জোগান কম তাই প্রয়োজন মেটাতে পারে না। ভুগর্ভস্থ জলের স্তর উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। এর জন্য ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে যে সেচ খাল জরুরি এবং এর দ্বারা ভুগর্ভস্থ জল স্তরও উন্নীত হয়। সেচ বিশেষজ্ঞ তুষার শাহের মতে সেচের জন্য বৃহৎ প্রকল্পগুলি সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী ১৯৯০–৯১-এ ১৭ মি:হে: সেচ সেবিত জমি ২০০২-০৩ এ ১৪.৩মি: হে:-এ নেমে এসেছে। NSSO এর ২০০৩-এ ৫৯তম সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৬৯% খরিফ এলাকা এবং ৭৬% রবি এলাকায় কুয়ো ও পাম্প দ্বারা সেচ করা হয়। ভারতে ২৫০ কিউবিক কিমি প্রতি বছর ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহৃত হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ কিউবিক কিমি, চিনে আরও কম। ভারতের মোট ২০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ কুয়োর জলে হয়। প্রতি বছর ভারতে ৮০০,০০০ টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে।

## পশ্চিমবঙ্গে মাটির তলার জল উত্তোলনের হিসাব

| ক্রমিক সংখ্যা | জলের হিসাব | জি ডব্লিউ আর এ ২০১৭ | জি ডব্লিউ আর এ ২০২০ | জি ডব্লিউ আর এ ২০২২ | জি ডব্লিউ আর এ ২০২৩ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোট ভুগর্ভস্থ জল সঞ্চয় (বিলিয়ান কিউবিক মিটার বা বি কি মি) | ২৯.৩৩ | ২৯.৩৩ | ২৩.৬১ | ২৬.২৯ |
| ২ | বাৎসরিক উত্তোলন যোগ্য মাটির তলার জল (বি কি মি) | ২৬.৫৬ | ২৬.৫৬ | ২১.৪২ | ২৩.৯ |
| ৩ | বাৎসরিক উত্তোলিত জলের পরিমাণ (বি কি মি) | ১১.৮৪ | ১১.৮৪ | ১০.০৭ | ১০.৭১ |
| ৪ | ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত জলের পরিমাণ (%) | ৪৪.৫৯ | ৪৪.৫৯ | ৪৭.০১ | ৪৪.৮১ |

সূত্র : গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স এসেসমেন্ট (জি ডব্লিউ আর এ)-এর সমীক্ষা, ২০২৪

খাদ্য রাজনীতি : খেসারী চাষ তুলে দেওয়া ও মাটির তলার জলে বোরো ধান :

সবুজ বিপ্লবের সাথে খাদ্য রাজনীতি? ধর্মীয় অন্ধতার মত বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ আনুগত্য জন্মেছে। দুর্ভিক্ষের ভয় দেখানোর গল্প দিয়ে সবুজ বিপ্লব শুরু হয়েছিল। ভয় দেখিয়ে অপরীক্ষিত ক্যানডিডেট কোভিড টীকা দেওয়ার মত। ওই বিপ্লব না হলে মানুষ অভুক্ত থেকে যাবে। তাই দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও তথাকথিত উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করে। ধান কাটার কয়েক দিন আগে ডাল শস্য খেসারীর বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হত। কোন চাষ, সেচ, সার বিষ, নিড়ানী কিছুই লাগত না। শাক খাওয়া হয়। কৃষকের বাড়িতে সারা বছরের ডালের সংস্থান হত। অন্য ডালের মত অর্বুদ জাতীয় ফসল হওয়ার জন্য জমিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ হত পরবর্তী ফসলে কাজে লাগত, অর্থাৎ জমির উর্বরতা বজায় থাকত। এই পরিবেশ বান্ধব চাষ

ব্যবস্থা রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপারীদের ভালো লাগল না। ১০০ বছর আগের বিহারের একটি সূত্র উদ্ধৃত করে বলা হল ওই ডাল খেলে পঙ্গু হয়। কিন্তু অর্ধসত্য তথ্য পরিবেশন করা হল। মানুষ ভয় পেয়ে গেল। চাষ উঠে গিয়ে সেখানে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, পাম্প সেট ও বীজের ভালো ব্যবসা হবে এমন চাষ— বোরো ধান চালু হল। সেচের জন্য মাটির তলার জল অনিয়ন্ত্রিত ভাবে তোলা শুরু হল। যদি অপুষ্টিতে ভোগা মানুষ টানা দু মাস শুধু ওই ডাল ও ভাত খেয়ে যায় তাহলে পঙ্গু হতে পারে। কিন্ত আমরা একই ডাল রোজ খাই না। ডাল সিদ্ধ করে জল ফেলে দিয়ে খাওয়া হয়। ডাল-ভাতের সাথে অন্য শাক সবজি বা অন্য আমিষ খাবারও খাওয়া হয়। বিগত ১০০ বছরে ক'জন চিকিৎসক ওই পঙ্গু রোগী দেখেছেন বা চিকিৎসা করেছেন সেই তথ্য পরিসংখ্যান নেই। ব্যক্তিগত ভাবে চেনা কয়েকজন বয়স্ক চিকিৎসক বললেন তাঁরাও বইয়ে পড়েছেন, কোন রোগী চোখে পড়েনি। সুতরাং ভয় দেখিয়ে ব্যবসা হল। প্রোটিনের একটা সহজ লভ্য উৎসকে নষ্ট করা হল। এত বছর পরে ভয় কাটিয়ে ইদানীং আবার খেসারীর ডালের প্রচলন বাড়ছে।

*খেসারির ডাল*

**শহরে জলের অপচয়**

বলা হয় কৃষকরা জলের অপচয় করেন। বোরো চাষ করেন। বর্ষায় বৃষ্টি না হলে মাটির তলার জল দিয়ে ধান চাষ করে। শহরেও প্রচুর জলের অপচয় হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার সাউথ সিটি মলের কাছের আবাসন প্রকল্পে ১৬০০ ফ্লাট আছে। ধরা যাক এই রকম একটি বৃহৎ অট্টালিকার আবাসন প্রকল্পে ১০০০ মানুষ বসবাস করলে দৈনিক ভুগর্ভস্থ জল ব্যবহার হবে প্রায় ১ লক্ষ লিটার (মাথা পিছু ১০০ লিটার ধরে)। হোটেল ও কিছু আবাসানের স্নানাগারে বাথটাবে জল খরচের হিসাব ধরলে আরো অনেক জল ব্যবহৃত হয়। তাহলে প্রতি মাসে ভুগর্ভের জল শূন্য হয়ে যাচ্ছে ৩০ লক্ষ লিটার। এই রকম অনেক আবাসন আছে প্রত্যেক শহরে। চারিদিকে কংক্রিটে মোড়া থাকায় ব্যবহৃত জল পাকা ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যায়, মাটির নিচে প্রবেশ করার সুযোগ থাকে না। খুব কম ক্ষেত্রেই বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। ২০১৯ সালে মারাত্মক জল সঙ্কটের পর নীতি নির্ধারকদের টনক নড়েছে। চেন্নাই শহরে প্রতি মাসে (এপ্রিল-জুলাই) জল কেনার খরচ পড়েছিল গড়ে ৭-৯ হাজার টাকা। অন্য দিকে সেচের জন্য ব্যবহৃত মাটির তলার জল জমিতেই পড়ে এবং ধীরে ধীরে শোষিত হয়ে মাটির নিচের জলে মিশে যায় অনেকটাই। শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অনেক জায়গায় লন তৈরি করা হয়েছে, অনেক বাড়িতে লন আছে। লনে প্রচুর জল লাগে। আবার গাড়ি ধোয়ার জন্য পানীয় জল নষ্টকরা হয়। যথেষ্ট উদ্বেগ ও আশঙ্কার বর্তমান রাসায়নিক নির্ভর কৃষি। বিপুল পরিমাণ মাটির তলার জল ব্যবহার করে বাইরের কেনা রাসায়নিক উপকরণভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা কিভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে সক্ষম হবে?

*বহুতল বাড়িতে জলের অপচয়*

ছত্রিশগড়ের (তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ) শেওনাথ নদীর ২৩ কিমি অংশ প্রায় ১৯৯৮ থেকে ২ দশক ধরে একটি কোম্পানির কাছে বাঁধা আছে। দুর্গের কারখানায় জল সরবরাহ করবে।

দ্রুত সবুজায়নের জন্যে সামাজিক বনসৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমির বৃক্ষ ইউক্যালিপটাস লাগানো হয়েছে। ক্ষতিকর ইউক্যালিপটাস গাছ বৃক্ষের পাতা গবাদি পশু খায় না; গাছে পাখি বাসা বাঁধে না; জল শোষণ ক্ষমতা অনেক বেশি; তবে ইদানিং এই বৃক্ষের অসুবিধেগুলো উপলব্ধি করা হচ্ছে। এক জায়গায় একই ধরনের গাছ লাগিয়েও জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলা করা যাবে না। যে হারে জঙ্গল ধ্বংস করা হচ্ছে তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার। শহরে গাছের খুব দরকার। সেই জায়গাও কমে আসছে।

**জলের চতুর্থ দশা**

আমরা জলের তিন রকম অবস্থার কথা জানি— তরল, কঠিন এবং বায়বীয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে স্যার উইলিয়াম বেট হার্ডি বলেছিলেন জলের আরও একটি অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে তরল স্ফটিকাকার। তখন তাঁকে কেউ পাত্তা দেননি। পরবর্তীকালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেরাল্ড পোলাক গবেষণা করে দেখালেন যে জলের সত্যিই চতুর্থ অবস্থা আছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম The Fourth Phase of Water- Beyond Solid, Liquid, and Vapour (2014)। মোটামুটি

বছর কুড়ি হল এই নিয়ে চর্চা হচ্ছে। তিনি বললেন জলের এই নতুন অবস্থার গঠনটা স্ফটিকার ষড়ভুজের আকারের মত কঠিন এবং তরলের মধ্যবর্তী একটা অবস্থা। তিনি একে ই. জেড (EZ) জল বা এক্সক্লুশন জোন বলেছেন। প্রোটিন, কোষ প্রাচীর এবং চিনি জাতীয় জলাকর্ষি জৈব পদার্থের কাছাকাছি এই জল তৈরি হয় এবং এর মধ্যে কোনরকম দ্রবণীয় জিনিস থাকে না। এটা মৌমাছির চাকের আকারের। এটা স্ফটিকার বলেই প্রায় কয়েক লক্ষ স্তরে থাকতে পারে এবং এর ফর্মুলা হল $H_3O_2$। এই স্তর গুলির নেগেটিভ চার্জ থাকে এবং পরস্পরকে বিকর্ষিত করে যার ফলে কখনোই এটা কঠিন অবস্থাতে বা সাধারণ জল অবস্থায় আসতে পারে না। বলা যেতে পারে একটা সান্দ্র বা থকথকে (জেলি সদৃশ) জিনিস বা স্ট্রাকচারড জল। যেহেতু এর মধ্যে সমস্ত রকম দ্রবণীয় পদার্থবিহীন হওয়ার জন্য এটা অনেক ঘন এবং অনেক বেশি বিশুদ্ধ। সাধারণ জলের চার্জ হল পজেটিভ। একটি কোষে সাধারণ জল এবং ই. জেড জল থাকতে পারে মানে একটি পজিটিভ চার্জ একটি নেগেটিভ চার্জযুক্ত অনেকটা ব্যাটারির মতো। অধ্যাপক পোলাক দেখিয়েছেন যে সূর্যের আলোর যে তড়িৎচুম্বকীয় শক্তির সাহায্যে মানে তাপ এবং আলো এই ই. জেড জলকে রিচার্জ করে এবং এটার জন্য সাধারণ জলের থেকে পৃথকীকরণ করে দেয়, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় বিভব পার্থক্য তৈরী হয়। এই কারণেই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালু হয় এবং জীব কোষে শক্তি তৈরি হয়। এই কারণের জন্যই আমাদের শরীরে লোহিত কণিকা রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করে ও আরো অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়া চালু আছে। উদ্ভিদে মাটির তলার জল এবং খনিজ শোষণ হয়। শিকড়ের অগ্রভাগ দিয়ে বিশেষ জীবাণুকে শিকড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়ে নেয় এবং মিথোজীবি প্রক্রিয়ায় খাদ্য আদান প্রদান করে। একে বলে রাইজোফ্যাগী। প্রাণীর শরীরে মুখ দিয়ে খাবারটাই একমাত্র খাবার নয়। সূর্যালোক কিন্তু এক ধরনের খাবার। ডাবের জল, ফলের রস, তরমুজের রস, দুধ ইত্যাদি। শরীরে এম এম আর ইত্যাদি রোগ নির্ণয়কারী পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন চুম্বকীয় প্রভাবে শরীরের নির্দিষ্ট জায়গার স্ট্রাকচার্ড জল ভেঙে যায় সাময়িক ভাবে। সেই অবস্থার শরীরের সেই জায়গার 'ছবি' তোলা হয়। ধাক্কা খাওয়ার ফলে ঝরণার জল এবং বহমান নদীর জল সূর্যের আলোতে অনেকটাই স্ট্রাকচারড জলে পরিণত হয়। বাঁধ দেওয়া নদী হলে জলের প্রবাহ অবরুদ্ধ হবে। বড় পুকুর ও হ্রদের জল হাওয়ায় আন্দোলিত হয়, বিভিন্ন মাছ ও জলজ প্রাণী ও চলাচলেও জল আন্দোলিত হয়। প্রাকৃতিক ভাবে সব ধরনের জলই স্ট্রাকচারড জলের অন্তর্গত। বহু মানুষই ঝরণার জল, নদীর জল ও নির্দিষ্ট পুকুরের জল খেয়ে থাকেন। সেই পুকুরের জল পানীয় জলেরই পুকুর। পবিত্র পুকুর অন্য কোন ভাবে কলুষিত করা হয় না। এই রাজ্যে এখনো এই ধরনের কয়েকটি পুকুর অবশিষ্ট আছে। বাঁকুড়া ও দঃ ২৪ পরগণায় সুন্দরবন অঞ্চলে। সেই জল খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়েছেন এই পরিসংখ্যান নেই। ঝরণার জল অসুস্থ মানুষকে পান করানোর বিধান আছে। ঝরণার জলে স্টাকচার্ড জল ছাড়াও প্রচুর খনিজ থাকে। আধিবাসীরা পাইপ বাহিত হয়ে আসা ট্যাঙ্কের জল পান করেন না, বলেন 'মরা হুয়া পানী'। বেড়াল বাসি জল খায় না। মানুষ ছাড়া সব প্রাণীই প্রাকৃতিক জল পান করে।

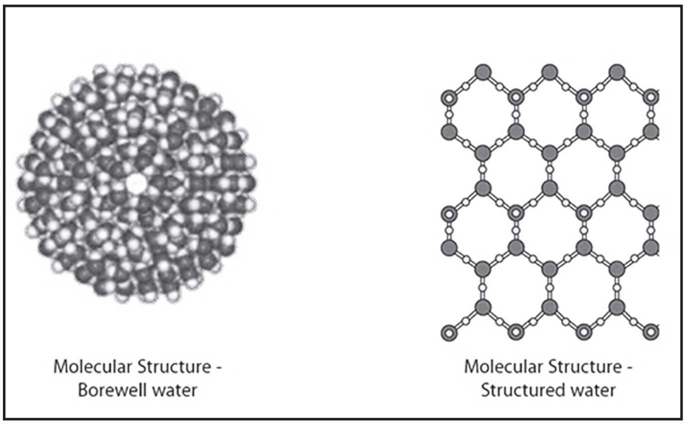


*স্ট্রাকচারড ওয়াটার*

পরাগ রেণু কিভাবে জলের ফোটার ভিতর বিশেষ ভাবে নাড়াচাড়া করে, মেঘ কি করে পুঞ্জীভূত হয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, নড়াচড়া করলেও আমাদের শরীরের সন্ধিগুলো থেকে কোন আওয়াজ বের হয় না, আঘাত লাগা স্থানে কি করে তাড়াতাড়ি ফুলে ওঠে এই বিষয় নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয় ওই জল দিয়েই। স্বাভাবিক ভাবে বিজ্ঞানের অন্য গবেষণার মত এটাকে বির্তকিত, আজগুবি ইত্যাদি বলে নস্যাৎ করার প্রক্রিয়া জারি আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ওই জলের জন্যই প্রত্যেক মানুষের শরীরের ছন্দের (বায়োলজিক্যাল ক্লক, শারীরিক রেসোন্যান্স) আলাদা আলাদা। বায়োডাইনামিক কৃষি ও হোমিওপ্যাথি-এর দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চলছে। বায়োডাইনামিক কৃষিতে অমাবস্যা পূর্ণিমার সময় ধরে বীজ লাগানো এবং সেচের নালা এমন ভাবে তৈরি করা যাতে জল ধাক্কা খেতে গড়িয়ে যায় ফলে বেশি অক্সিজেন যুক্ত হয় এবং ধাক্কা খাওয়ার সাথে স্টাকচার্ড জল তৈরি হয় এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

**আমাদের করণীয় :** জল সম্পদ ও জল অপচয় রোধ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। বহুতল বাড়িতে জলে অপচয় রোধ করা, জলের পুনরাবর্তন ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উদ্যোগ। পুকুর সংস্কার করার জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং পুকুর বুজিয়ে বাড়ি নির্মাণ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বোরো চাষ কমিয়ে ডাল শস্য চাষের উদ্যোগ। বর্ষায় বৃষ্টি কম হলে ধান ছাড়া অন্য ফসল, জলদি শীতকালীন সবজি, মিলেট ও সরগুজা-তৈল বীজ চাষের ব্যবস্থা করা। আলু ও সবজিতে ফোয়ারা ও বিন্দু সেচের প্রয়োগ করতে হবে।

অর্কজিৎ সেন

# মানবদেহ, স্বাস্থ্য ও জল

*জার্মান ভাষার 'WASSER' শব্দটি থেকে বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় 'WATER' শব্দটি এসেছে। প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটির বানান ছিল 'WAETER'। বাংলায় যাকে আমরা বলি 'জল'। উর্দু এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই জলের প্রতিশব্দ হল 'পানি'। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি জলের অপর নাম জীবন। এই একটিমাত্র বাক্য দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি আমাদের জীবনে জলের অপরিসীম গুরুত্ব। সর্বপ্রথম প্রাণের বিকাশ হয়েছিল জলেই।*

**মানবদেহে জলের কয়েকটি গুরুত্ব ঃ**

- শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে জল অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।
- প্রতিটি অস্থিসন্ধি জলের কারণে সচল থাকে।
- অক্সিজেন এবং অন্যান্য উপাদান শরীরের প্রতিটি স্থানে সরবরাহ হয় জলের মাধ্যমে।
- মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজ জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
- জল বর্জ্য দ্রব্য বহন করে এবং নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- জল আমাদের গ্রহণ করা খাদ্যের পচনে এবং পরিপাকতন্ত্রে উৎসেচকের কাজে সাহায্য করে।
- কিডনির কার্যপ্রণালী যথাযথ রাখে জল।
- শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ তথা টক্সিন বের করে দেয় জল।
- জল কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করতেও কার্যকরী।

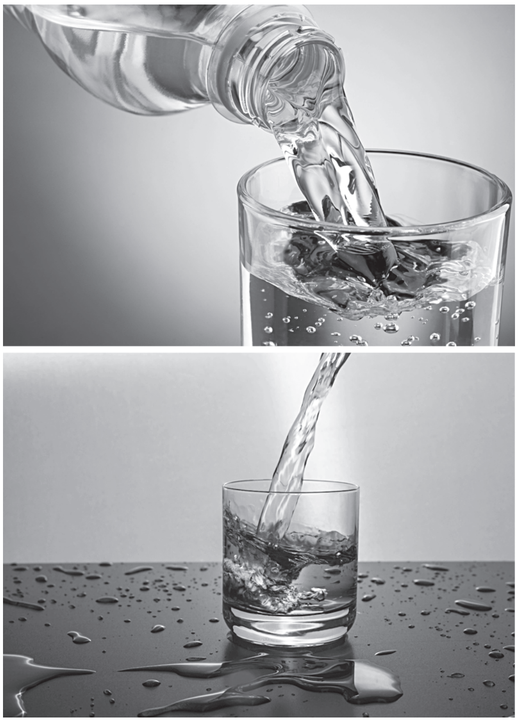

বিশুদ্ধ পানীয় জল

মানবদেহের (চর্বি ছাড়া) ওজনের প্রায় ৭২ শতাংশই হল জল। এক একজনের দেহে এই পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহের প্রায় ৬০% হল জল। নারীর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশের কাছাকাছি। শরীরের সমস্ত অঙ্গে জলের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। যেমন, মস্তিষ্কে জলের পরিমাণ প্রায় ৭০ শতাংশ এবং মাংসপেশীতে এই পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ, আমাদের অস্থিতে মাত্র ৩০% রয়েছে জল। বয়সের কোঠা ষাট অতিক্রম করলেই উভয় লিঙ্গেরই শরীরের জলের ভাগ চার থেকে পাঁচ শতাংশ মতন কমে যায়। আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা কাউন্সিল এর মতে, সুস্থ মহিলাদের জন্য গড় হিসেবে দৈনিক আড়াই লিটার এবং একজন সুস্থ পুরুষের জন্য গড় হিসেবে দৈনিক ৩.৭ লিটার জল পানীয় হিসেবে প্রয়োজনীয়। ICMR ও NIA এর ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একজন সুস্থ মানুষের ও একজন কায়িক পরিশ্রমী মানুষের প্রতিদিন গড়ে তিন থেকে চার লিটার জল পান করা উচিত। এই পরিমাণ জল কিন্তু চা, কফি, ফলের রস প্রভৃতির জলজ খাদ্য ব্যাতিরেকে পানীয় জল গ্রহণের জন্য বলা। অঞ্চল ভেদে, মানুষের পেশা ভেদে পানীয় জলের এই প্রয়োজনের তারতম্য ঘটতে পারে। যেমন একজন কৃষিজীবী বা শ্রমিক পেশা গ্রহণকারী মানুষের যতটা পরিমাণ পানীয় জলের প্রয়োজন একজন আইটি সেক্টার, একজন শিক্ষক কিংবা একজন সরকারি কর্মচারীর সেই একই পরিমাণ পানীয় জলের প্রয়োজন হবে এমন কোন কথা নেই। অনেকেই বলেন বেশি বেশি জল খাওয়া ভালো। কোন কিছুই বেশি ভালো নয়। অতিরিক্ত জল পান অনেক সময় নানান শারীরিক অসুবিধে তথা রোগের কারণ হতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণে জল পান করলে অনেক সময় WATER INTOXICATION হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার কম জল খেলেও বিপদ। দুর্বল অনুভব করা ওজন হ্রাস পাওয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা মানব শরীরে দেখা দিতে পারে। তাই জল খেতে হবে নিজের শারীরিক সক্ষমতা, নিজের পেশা এবং নিজের কাজকর্ম, নিজের বাসস্থান তথা কর্মক্ষেত্র বুঝে। একটি উদাহরণ দিলে আশা করি বিষয়টা পরিষ্কার হবে। কেনিয়ার ম্যারাথন দৌড়বিদ এলিয়ুদ কিপচোগী নিজের প্রত্যেকটি দৌড়ের সময় কোন স্থানে ঠিক কতটা পরিমাণে জল পানীয় হিসেবে গ্রহণ করবেন তার একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে নেন এবং তার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে ঠিক সেই সময় মতন পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

মানুষ প্রায় তিন দিন পানীয় জল ছাড়া বাঁচতে পারে, এমন বলা হয়। একজন ১৮ বছর বয়সী অস্ট্রিয়ান ইট বিক্রেতা আন্দ্রেয়াস মিহাভেজকে ১৯৭৯ সালে পুলিশ বেসমেন্টের জেলে বন্ধ করে রেখে চলে যায়। ১৮ দিন তিনি ওইভাবেই বন্দি অবস্থায় ছিলেন। বিস্ময়করভাবে ১৮ দিন পরও তিনি জীবিত ছিলেন। তবে ওনার ২৪ কেজি ওজন কমে যায়। এই বিষয়টি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কেউ জল ছাড়া বেঁচে ছিলেন এই কারণে।

হার্ট ফেলিওর, স্ট্রোক, প্যারালাইসিস এই জাতীয় রোগে জল খাওয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। আক্রান্ত রোগী যদি একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে তাহলে দেখা যায় যে তার পায়ের দিকে অর্থাৎ গোড়ালিতে জল জমা শুরু হয় এবং তা ফুলে যায়। পায়ে জল জমাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় পেডাল ইডিমা। অনেক সময় দেখা গিয়েছে রোগী দীর্ঘক্ষণ শুয়ে আছে ফলে পা ফোলা অনেক কমে গিয়েছে। শুয়ে থাকার কারণে পা এবং সমস্ত শরীর একই সরলরেখায় ছিল। তাই জল নিম্নগামী হওয়ার সুযোগ না পেয়ে পায়ে জমতে পারেনি। রোগীর শরীরে যদি এইরকম ফোলা ভাব থাকে তাহলে রোগীকে ১-১.৫ লিটারের পানীয় জল দেওয়া হয়। রোগী যদি দীর্ঘকালীনভাবে হার্ট অথবা কিডনির অসুখে ভোগে তাহলেও রোগীর পানীয় জলের মাত্রা অন্যান্য সাধারণ মানুষের পানীয় জলের মাত্রা থেকে অনেক কম থাকে। রোগীর শরীরে এই ফোলা ভাব কমাতে ফ্রুসেমাইড কিংবা টোরসেমাইড প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগ করতে

দেখা যায়। তবে দেখা যায় এই সমস্ত ওষুধ প্রয়োগের ফলে শরীরে থাকা সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি খনিজের মাত্রার তারতম্য ঘটে। সেই কারণে রোগীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রাখতে হয় এবং ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। এই অবস্থায় ডাক্তারেরা যে কম জল খাবার পরামর্শ দেন তার কারণ মূলত দুটো ঃ

১. শরীরে অতিরিক্ত জল যাতে জমতে না পারে।

২. জল কম খেলে হার্ট এবং কিডনির উপর কম চাপ পড়বে।

হার্টের রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ডাইইউরেটিক খাইয়ে বলপূর্বক দেহ থেকে জল বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই কাজ কিডনির ক্ষেত্রে অপকারী। তাই জলের মাত্রা নির্ণয় করা অতি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে মূত্রের রঙ যদি হালকা হলুদ বর্ণের হয় তাহলে বুঝতে হবে জল স্বাভাবিক মাত্রায় পান করা হচ্ছে আর যদি মূত্রের রং ঘন রঙের হয় তাহলে শরীরে জলের মাত্রা অনেক কম। ডিহাইড্রেশন হতে পারে। রাতে যদি বারবার প্রস্রাব ত্যাগের হেতু বাথরুমে যেতে হয় যা আগে হত না, তাহলে বুঝতে হবে জল বেশি পরিমাণে খাওয়া হচ্ছে। সোডিয়ামের স্বাভাবিক মাত্রা হল ১৩০-১৪৫ মিলিইকুইভালেন্ট প্রতি লিটারে। তবে যদি শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা ১৩০ মিলি ইকুইভ্যালেন্ট এর নিচে চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে হাইপোন্যাট্রিমিও (ন্যাট্রিয়াম কথাটির অর্থ হল সোডিয়াম) হয়েছে। শরীরে বিভিন্ন কারণবশত সোডিয়ামের মাত্রা কমে যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত জলের কারণে যদি সোডিয়ামের মাত্রা কমে যায় তাহলে রক্ত থেকে অল্প পরিমাণ জল শরীরের কোশের মধ্যে ঢুকে যায় এবং শরীরের কোষগুলো তখন ফুলে যায়। সেই সঙ্গে শরীরে নানান ধরনের অসুবিধে শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে মস্তিষ্কের কোশে জল জমে গিয়ে কোশগুলো ফুলে যায় এর ফলে মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, মানুষ অর্থাৎ রোগী নিজের অতি আপনজনকেও অনেক সময় সহজে চিনতে পারে না। মাত্রাতিরিক্ত জল পান করার সঙ্গে সোডিয়াম এর সম্পর্ক থাকলেও পটাশিয়াম-এর সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। পটাশিয়াম এর গন্ডগোল হওয়ার সাধারণ কারণ হল বিভিন্ন ওষুধ সেবন অথবা কিডনির কোনো অসুখ। যারা কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে কম জল খাওয়ার কারণে ক্রনিক কিডনি ডিজিস বা আননোন অরিজিন বা CKDU দেখা দেয়। যারা দৌড়বীর অর্থাৎ অ্যাথলিট অনেক সময় দেখা গিয়েছে তাঁরা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি জল, ফলের রস অথবা ORS খেয়ে ফেলেছেন। যার ফলে তাঁরা ওভার হাইড্রেটেট হয়ে যান। এর ফলে ওনাদের শরীরে সোডিয়াম-এর পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। কখনো কখনো তারা অজ্ঞান হয়ে যান। এমনকি ম্যারাথন দৌড়ের পরে কয়েকজন অ্যাথলিটকে মারাও যেতে দেখা গিয়েছে। মাঠে-ঘাটে যারা শারীরিক পরিশ্রম করে কাজকর্ম করেন কিংবা ধর্মীয় কারণে নির্জলা উপবাসকারীদের মধ্যে দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীর ডিহাইড্রেট থাকে।

জল খাবার কিছু সাধারণ নিয়ম কানুন মেনে চললে উপকার হবে। সেগুলি হল ঃ

- যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কিছু পরিমাণ (এক গ্লাস অর্থাৎ ২৫০ মিলি) জল পান করা।
- শরীরচর্চা করার আগে এবং পরে অথবা খেলতে নামার আগে এবং পরে কিংবা কোন ভারী কাজ করার শুরুতে এবং শেষে কিছু পরিমাণ জল পান করে নেওয়া।
- শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করানোর আগে এবং পরে জল পান করা।
- খাদ্যগ্রহণ করতে করতে জল খাওয়ার অভ্যাস একেবারে পরিহার করা উচিত। কারণ খাবার খেতে খেতে জল পান করলে আমাদের মুখ থেকে নিঃসৃত স্যালাইভা আর পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিক জুস ও বিভিন্ন প্রকার এনজাইম এর ঘনত্ব কমিয়ে দেয়। যার ফলে অম্বল অথবা বদহজমের সমস্যা দেখা দেয়।
- শরীরের যদি সঠিক তাপমাত্রা বজায় থাকে তাহলে আমাদের ঘুম খুব ভালোভাবে হয় এবং এই কারণেই ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস জল পান করা যেতেই পারে।

শরীরে যদি জলের ঘাটতি হয় তাহলে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ঃ

- প্রস্রাব হলুদ হয়ে যাওয়া।
- মুখে দুর্গন্ধ।
- কিডনি সংক্রান্ত সমস্যা।
- স্থূলতা।
- লো ব্লাডপ্রেসারের সমস্যা।
- অস্থিসন্ধিতে বেদনা।
- পেশিতে ব্যথা।
- ক্লান্তি বোধ।
- দৈহিক শক্তির অভাব।
- কোষ্ঠকাঠিন্য।
- হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া।

জল প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়ার ফলে বিভিন্ন রকম চর্মরোগ হতে পারে। যেমন— ছুলি ও দাদ। এই দুটিই ছত্রাক ঘটিত ত্বকের অসুখ। ছুলির ছত্রাকটির বিজ্ঞানসম্মত নাম মালাসেজিয়া ফারফার। ট্রাইকোফাইটন ও মাইক্রোস্কোরাম-এর বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাকের ফলে দাদ রোগটি আমাদের ত্বকে হতে দেখা যায়। এছাড়াও রয়েছে সাধারণ একটি রোগ চুলকানি। ত্বকের অসুখ ঠেকাতে তাই প্রয়োজন মতো জল খাওয়া অতি আবশ্যক। অনেকেই মনে করে চামড়ার কোষ ভালো থাকে জল বেশি করে খেলে। এর এই কথাটির কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। শরীরে জলের অভাব হলে অবশ্যই ত্বকে তার প্রভাব পড়ে। সেই কারণেই আগেকার দিনে কলেরা হলে চিকিৎসকেরা রোগীর চামড়া ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। কারণ ত্বকে ভাঁজ পড়েছে কিনা। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগসজ্জা সম্বন্ধীয় বিষয়টি ভালোভাবে ফুটে ওঠে।

ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে কুয়ো অথবা জলের উৎসের মধ্যে নেমে জল সংগ্রহ করতে হয়। গিনি ওয়ার্মের প্রাদুর্ভাব এই সমস্ত অঞ্চলে লক্ষণীয়। এই গিনি ওয়ার্মের চিকিৎসা রয়েছে। তবে জল সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থা থাকলে এই ওয়ার্মের দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে কম। এই গিনি ওয়ার্মকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়ে আমেরিকার US Centres for Disease Control and Preservation একটি পরিকল্পনা করে ১৯৮০ সালে। এছাড়াও ১৯৯১ সাল থেকে গিনি ওয়ার্মকে সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে নির্মূল করার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, Bill and Melinda Gates Foundation, UNICEF বহু সদর্থক ভূমিকা পালন করে আসছে।

আসলে জলবাহিত রোগগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করলে জল বাহিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে কমে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং দিল্লির Pollution Service International (PSI) যৌথভাবে দিল্লির পশ্চিম প্রান্তের বস্তি অঞ্চলে ডায়রিয়া দমনের জন্য বিশেষ প্রকারের একটি পরিকল্পনার রূপায়ণ করেছিল। সেই অঞ্চলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ মতন তৈরি করা হয় Safe Water System সংক্ষেপে যা SWS। এটা হল বোতলবন্দী জলে ০.৫ থেকে ১% Sodium Hypochlorite। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর দেখা গেছে উক্ত অঞ্চলের ডায়রিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব পঞ্চাশ শতাংশ মত কমানো সম্ভব হয়েছে।

অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায় সঠিক পরিকল্পনার দ্বারা চিহ্নিত রোগের দমন সম্ভব। শর্ত হল সেই পরিকল্পনাকে অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক ভুল তথ্য আমাদের মধ্যে পারিবারিকভাবে চলে আসছে। এই যেমন অনেকেই মনে করে ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি পেটের রোগের ফলে হওয়া বমি-মল প্রভৃতি যত পরিমাণে নিষ্কাশিত হবে ততই পেটের জন্য ভালো। পেট জীবাণুমুক্ত হবে। এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কারণ বারবার বমি-মল ত্যাগ হলে রোগীর শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে। সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি খনিজ লবণের ঘাটতি দেখা যায় রোগীর শরীরে। আগে বলা হত, এক লিটার জলে চা চামচের এক চামচ অর্থাৎ মোটামুটি পাঁচ গ্রাম লবণ এবং আট চামচ মোটামুটি ৪০ গ্রাম চিনি মিশিয়ে শরবত করে রোগীকে বারবার খাওয়ানো ভালো অথবা আড়াই কাপ জলে তিন চামচ চিনি ও সিকি চামচ লবণ গুলে যদি বাড়িতে কমলালেবু অথবা পাতিলেবু অথবা মুসাম্বিলেবু থাকে তার রস সিকি চামচ সেই শরবতে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ানো যেতে পারে। এতে রোগীর তেমন শারীরিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না বেশিরভাগ সময়। সেই কারণে এখন ডাক্তারবাবুরা ORS ব্যবহার করার সুপারিশ করেন। ORS মূলত দুই প্রকারের। যথা—

- বাই কার্বনেট ORS
- সাইট্রেট ORS

দেখা গেছে, বাইকার্বনেট যুক্ত ORS এর তুলনায় সাইট্রেটযুক্ত ORS এর স্থায়িত্ব রোগীর শরীরে অনেক বেশি এবং এই প্রকার ORS শরীর থেকে নিষ্কাশিত মলের পরিমাণ কমাতে সাহায্যকারী। সেই কারণে যে সমস্ত রোগীদের খুবই অত্যাধিক পরিমাণে মলত্যাগ হয় তাদের ক্ষেত্রে সাইট্রেটযুক্ত ORS ব্যবহার করলে ভালো ফল মেলে।

নিচে তিনটি সারণির মাধ্যমে ORS এর পরিমাণ এবং কখন কতটা পরিমাণে খাওয়াতে হবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

### সারণি এক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন করা ORS এর উপাদান ঃ

- সোডিয়াম ক্লোরাইড = ৩.৫ গ্রাম
- সোডিয়াম বাইকার্বনেট = ২.৫ গ্রাম
- ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট (শুকনো) = ২.৯ গ্রাম
- পটাশিয়াম ক্লোরাইড = ১.৫ গ্রাম
- গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ = ২০ গ্রাম
- পানীয় জল = ১ লিটার

ডায়রিয়া অথবা কলেরার ক্ষেত্রে ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ রোগীরা শুধুমাত্র এই দ্রবন পান করেই সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারেন।

### সারণি দুই

বাড়িতেও ORS বানানো যেতে পারে। উপাদানগুলি হল ঃ

- খাবার লবণ = এক চামচ (৫ গ্রাম)
- চিনি = চার চামচ (২০ গ্রাম)
- খাবার সোডা আধ-চামচ = ২.৫ গ্রাম
- পানীয় জল = ১ লিটার

বাড়িতে যদি খাবার সোডা না থাকে তাহলে শুধুমাত্র লবণ চিনি মেশানো জল রোগীকে খাওয়ানো যেতে পারে।

### সারণি তিন

কত পরিমাণ ORS খাওয়ানো যেতে পারে। প্রথম চার ঘন্টায় ঃ

- ৪ মাসের নিচে (৫ কিলোগ্রামের কম ওজন বিশিষ্ট) = ২০০-৪০০ মিলিলিটার
- ৪ থেকে ১১ মাস (পাঁচ থেকে আট কিলোগ্রামের মধ্যে) = ৪০০-৬০০ মিলিলিটার
- ১২ থেকে ২৩ মাস (৮ থেকে ১১ কিলোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট) = ৬০০-৮০০ মিলিলিটার
- ২ থেকে ৪ বছর (১১ থেকে ১৬ কিলোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট) = ৮০০-১২০০ মিলিলিটার
- ৫ থেকে ১৪ বছর (১৬ থেকে ৩০ কিলো গ্রাম ওজন বিশিষ্ট) = ১২০০-২২০০ মিলিলিটার
- ১৫ বছর বা তার বেশি (৩০ কিলোগ্রাম অথবা তার বেশি ওজন বিশিষ্ট) = ২২০০-৪০০০ মিলিলিটার

ওজন যদি জানা না থাকে তাহলে বয়সের হিসেবে ORS খাওয়ানো যেতে পারে। যদি ওজন জানা থাকে তাহলে ওজন (কি.গ্রা.) কে ৭৫ দিয়ে গুণ করে দ্রবণের হিসাব বের করে নিতে হবে।

চার ঘন্টার পর থেকে অল্প ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবে প্রতি কেজি ওজনে ১০০ মিলিলিটার ২৪ ঘন্টায় ORS খাওয়াতে হবে।

তীব্র ডায়রিয়ায় প্রতি কেজি ওজনে প্রতি ঘন্টায় ১০ থেকে ১৫ মিলিলিটার হিসাবে ORS খাওয়াতে হবে।

অপরিচ্ছন্ন জলে অনেক সময় চোখের সংক্রমণও দেখা যায়। যেমন—ট্রকোমা। অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন এবং অপরিচ্ছন্ন থাকলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই রোগের রোগ জীবাণু হল ক্ল্যামাইডিয়া ট্রাকোয়াটিস ব্যাকটেরিয়া। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চোখের জল, পিচুটি হাতে লেগে অথবা ব্যবহৃত তোয়ালে, গামছা প্রকৃতিতে লেগে এই রোগ ছড়ায়। দেখা গেছে, চোখে কাজল, সুরমা ইত্যাদি ব্যবহার করার ফলেও এই রোগ হতে পারে। চোখের আরো একটি সমস্যা হল 'জয় বাংলা'। এমন অবস্থায় প্রাথমিকভাবে এক গ্লাস ফোটানো জলে এক চিমটে লবণ দিয়ে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ওই জলে ডুবিয়ে চোখ পরিষ্কার করা উচিত। অন্যান্য সময় বারংবার স্যালাইন জলের ঝাপটা চোখে দিলে উপশম মিলবে। সঙ্গে তো ডাক্তারি পরামর্শ নিতেই হবে।

অপরিশ্রুত জল ব্যবহারের আরো একটি অসুবিধে হল খুস্কি। এই খুস্কির কারণ হল ক্যানুমেলা ওরিওলিস ছত্রাক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা

গিয়েছে, স্নানের জল অপরিষ্কার থাকলে আমরা যখন স্নান করি তখন সেই জল থেকে আমাদের মাথায় এই ছত্রাক স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে। এরপর এই ছত্রাক বাতাসে ভেসে থাকা ধূলিকণা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং আমাদের মাথাতেই বংশ বিস্তার করতে থাকে বিশেষ করে মাথার তৈলাক্ত ত্বকে এই ছত্রাক বাস করে। এই ছত্রাক একটি পুরুষ এবং অপরটি হল স্ত্রী। যৌন জননের দ্বারা এরা নিজেদের বংশবিস্তার করে। এই ছত্রাক মাথায় থাকলে চুলকানি থেকে শুরু করে খুস্কি এবং মাথার তালুতে একপ্রকার ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে যা থেকে রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার থেকে বাঁচার জন্য মাথার চুল সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে এবং পরিশ্রুত জলে স্নান করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে মাথার চুল যেন ভিজে না থাকে।

জল কখনো কখনো আতঙ্কের কারণ হয়েও দাঁড়ায় অনেকের কাছে। বোঝাই যাচ্ছে রেবিস-এর কথা বলা হচ্ছে। রেবিস সংক্রমণ ঘটে এই রোগে আক্রান্ত কুকুর অথবা বিড়াল কিংবা অন্য কোন জন্তু কামড়ালে। জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষের কামড়ের আঘাতে তীব্রভাবে ব্যথা হতে থাকে, ঢোক গিলতেও রোগীর কষ্ট হয় এবং জল খেতে গেলে গলায় প্রচন্ড বেদনা অনুভূত হয়। এইরকম একটি মারাত্মক রোগ নিয়ে অযথা আতঙ্ক না ছড়িয়ে প্রত্যেককে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ মতো আক্রান্ত রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো এবং মানসিকভাবে বল যোগানোর সাহায্য করা প্রয়োজন।

গ্রীষ্মকালে জলের একটি টোটকা ব্যবহার করা যেতেই পারে। যারা গরমে খুব কষ্ট পান, গরমে যাদের খুব অসুবিধা হয় তাদের জন্য এটা বেশ কার্যকরী। তবে আপামর জনসাধারণ গরমে জল দিয়ে এই কাজটি করে আরাম পেতে পারেন। রাতে ঘুমানোর আগে, ১৫ থেকে ২০ মিনিট অর্ধেক বালতি ঠান্ডা জলে পূর্ণ করে বালতির ভেতরে পা ডুবিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকা যেতেই পারে। একে হাইড্রোথেরাপি বলে। তবে দেখতে হবে জলটি যেন বেশি ঠান্ডা না হয়। জলের উষ্ণতা বেশি হলে সেই জলে বরফ ফেলে জলটির উষ্ণতা কমানো যেতেই পারে। এই ব্যবস্থাটি অত্যন্ত ভালো। এর ফলে আমাদের শরীর ঠান্ডা হয়। রাতে গরমে অনেকেরই ঘুম সহজে আসে না। এই উপায়টি করলে ঘুমের ব্যাঘাতটিও দূর হবে।

কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের শরীরে গরম দুধ বা ভাতের ফ্যান পড়ে যায়। আনন্দের মৌসুমেও বাজি-পটকা ফাটাতে গিয়ে বাজি-পটকা বিস্ফোরণেও আমাদের অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। এরকম হলেই প্রথমত মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এবং সেই বিশেষ জায়গাটিকে মিনিট দশেক মত ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। অনেক সময় পোড়ার মাত্রা বেশি থাকে। (বিশেষ করে কারোর সঙ্গে যদি আগুনে পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে তাহলে পোড়া স্থানটিতে অন্ততপক্ষে ১০ মিনিট ধরে ঠান্ডা জল ঢালতে হবে)। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেই ঠান্ডা জলের উষ্ণতা যেন ১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড-এর আশেপাশেই থাকে। এমন উষ্ণতার জলই পোড়া রোগীর ক্ষেত্রে কার্যকরী (পোড়া রোগীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে এখানে কেবল জলের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল)।

এখন সর্দি-কাশি আমাদের বারো মাস হয়। কাশি কিন্তু কোনো রোগ নয়। বুকের বা গলার কোনো রোগ অথবা কোনো সমস্যার উপসর্গ হল কাশি। তবে মনে রাখতে হবে কাশি মানেই বুক অথবা গলার কোন রোগ হবে সব সময় এমন হয় না। মূলত কাশি দুই ধরনের হয়। শুকনো কাশি বা যাকে ইংরেজিতে বলে Dry Cough আরেকটি হল কফ বার করা কাশি অথবা Productive Cough এ্যালার্জি, ধূমপান বা শ্বাসতন্ত্রের ওপর দিকে কোনো কোনো জীবাণু সংক্রমণের ফলে শুকনো কাশি হতে পারে। শ্বাসতন্ত্রের নিচের দিকে ব্রঙ্কাস, ট্রাকিয়া ও ফুসফুসের জীবাণু সংক্রমণ ঘটলে প্রদাহজনিত কফ বার হতে পারে যাকে আমরা বলি কফ বার করা কাশি। কাশির মূল কারণ না খুঁজেই স্বঘোষিত ডাক্তার অথবা ওষুধের দোকানের কর্মচারীর পরামর্শ মতন কাশির জন্য কফ সিরাপ খাওয়া একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে আমাদের। না বুঝে, না জেনে-শুনে বিভিন্ন ধরনের কফ সিরাপ খেলে কিন্তু বিভিন্ন রকমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। একটি খুব পরিচিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হল এই সমস্ত কাফ সিরাপ খেলে প্রবল ঝিমুনি অথবা খুব ঘুম পায়। কাশি কমানোর ওষুধ রয়েছে যা মূলত দুই ধরনের। যথা—

- কাশি কমাবার ওষুধ বা কাশি প্রশমক অথবা অ্যান্টিটাসিভ
- কফ বার করার ওষুধ এক্সপেক্টোর‌্যান্ট

কোনো রকম ওষুধ না খেয়ে শ্বাসতন্ত্রের ভেতরে জমে থাকা শক্ত কফকে তরল করে বার করে দিতে খুব ভালো ওষুধ হল জল। প্রচুর পরিমাণে অল্প অল্প করে জল খেলে জমে থাকা কফ আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে। এর সঙ্গে যদি ফুটন্ত জলের বাষ্প বারবার নাক মুখ দিয়ে গ্রহণ করা যায় তাহলে শ্বাসতন্ত্র শুকনো অবস্থায় থাকবে না বরঞ্চ জলীয় বাষ্পে ভিজে থাকবে এর ফলে কফও দ্রুত তরল হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। বাজার চলতি বেশ কিছু এক্সপেক্টোর‌্যান্টে মেশানো থাকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং এর সঙ্গে অতি অবশ্যই খেতে হয় প্রচুর পরিমাণে জল সুতরাং কফ বেরিয়ে আসে ওই জল খাওয়ার কারণেই। কফ বাইরে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে এক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড-এর বিশেষ কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। সাইনোসাইটিস এর তীব্র মাথা যন্ত্রণায় যদি কেউ কষ্ট পান তাহলে তিনিও আরাম পেতে পারেন ফুটন্ত জলের ভাপ টেনে। শুধু কাশিতে নয়। অম্বলের উপশমেও জল কার্যকরী। অম্বলের কবলে পড়ে অধিকাংশ মানুষই ডাক্তারি পরামর্শ ব্যতীত অতিরিক্ত পরিমাণে ওষুধ খান। বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টাসিড নিয়মিতভাবে মুড়ি-মুড়কির মতন খান। এটি কিন্তু একেবারেই ভুল। চূড়ান্ত স্বাস্থ্যহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই সমস্ত অ্যান্টাসিডের কারণে। যাদের রক্তচাপ বেশি অথবা হৃদরোগ কিংবা কিডনির অসুখ রয়েছে তাদের অম্বল হলেই অতি অবশ্যই ডাক্তারি পরামর্শ সবার আগে নেওয়া উচিত। অল্প ক্ষরণ বাড়লে বেশ খানিকটা পরিমাণে জল খেয়ে নিলে ভালো কাজ হয়।

ওই যে কথায় বলে না— 'WATER IS THE BEST MEDICINE'।

**তথ্যসূত্র**

১. মিষ্টি জলের সংকট ও প্রতিকার, দীপককুমার দাঁ, গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ, গোবরডাঙ্গা, ১৪.০৫.২০২৩
২. জীবনের জন্য জল, সুনীতিকুমার মন্ডল, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪
৩. কোন অসুখে কী খাবেন, ডা. শ্যামল চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০
৪. ডাক্তার ডাকার আগে, ডা. শ্যামল চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই ২০১২
৫. কিছু রোগ কিছু কথা, অনির্বাণ জানা, মুদ্রা প্রকাশনা, কৃষ্ণনগর, বড়দিন ২০১৯
৬. সাপ্তাহিক বর্তমান, ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
৭. 'ওষুধ যখন রোগ বাড়ায়', ডা. শ্যামল চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬

অসীম বসাক

# স্মার্ট ওয়াটার

*স্মার্ট ওয়াটার*

**জল**

সহজ সরল সাদামাঠা, সাধারণভাবে তরল ও স্বচ্ছ চেহারার এক বস্তু। কিন্তু জল পাওয়া অত সহজ আর সরল নয়। পৃথিবীর তিন অংশই জল পৃথিবীর চারপাশে আর পেটে রয়েছে।

শুধু জল আর জল। কিন্তু কোথায় পাই একটু পানীয় জল। যদিও বেশিরভাগ (৯৭% নোনা জল) জলই সহজে পানযোগ্য নয়, বাস্তবে পৃথিবীর একশো ভাগ জলই পানযোগ্য হতে পারে। কারণ ঐ জল সমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত হয় ও তাজা জল হিসাবে পর্বতে জমিতে জলাশয়ে আর সাগরে পতিত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ পানযোগ্য জল পেতে অনেক কসরত ও অসাধ্য সাধন করতে হয়। পৃথিবীর চারভাগে তিনভাগই জল, তবু কত হাহাকার! মেলে কই সকলের পানীয় জল!

যদি পৃথিবীর সব জলকে একবালতি (প্রায় ৯ লিটার) জল মনে করি তাহলে এর মধ্যে মাত্র ০.২২৫ লিটার জল (প্রায় ৪৫ চা চামচ) হচ্ছে ভূতল জল। এই জলের পুরোটা পানযোগ্য নয়। যদি পৃথিবীর সব মানুষ সমান অধিকারে পানীয় জল পেত তাহলে আমরা প্রত্যেকে হয়তো একফোঁটা করে পানীয় জল পেতাম। অনেক মানুষই জল পায় না, কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ জল এখন ব্যবসায়ীর দখলে। তাই বলি—

পৃথিবীর চারভাগে তিনভাগই জল, তবু কত হাহাকার! মেলে কই সকলের পানীয় জল।

**ডব্লিউ ফর ওয়াটার এখন বোতল বন্দী, জল ব্যবসায় কত নব নব ফন্দী!**

বাজারে যে যে রকম জল পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে : কল বা ট্যাপের জল, কুয়োর জল, পাতিত জল, আয়নমুক্ত জল, খনিজ বা মিনারেল জল, স্প্রিং বা ঝর্নার জল, ক্ষারীয় বা অ্যালকাইন জল, অ্যাকটিভ কপার জল, আর.ও বা রিভার্স অসমোসিস জল, ঝকঝকে বা স্পার্কেল জল, খর বা হার্ড জল ও ভারী বা হেভি জল। তবে ভারী বা হেভি জল খোলা বাজারে যেমন খুশি তেমনভাবে লভ্য নয়। এই জল পানযোগ্য নয়। ভারী জলের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার পরমাণু চুল্লিতে হয়।

এর মধ্যে সাধারণ জল, মিনারেল জল, স্প্রিং জল, অ্যালকাইন জল আর স্পার্কেল জল পানীয় জল হিসাবে বিভিন্ন নামে বা ব্র্যান্ডে বিক্রি হয়। এর পাশাপাশি ভালো ব্যবসা করছে স্মার্টওয়াটার। বাংলাতে স্মার্ট মানে বুদ্ধিমান বা উজ্জ্বল বা করিতকর্মা বা ফিটফাট। কেন নাম স্মার্ট?

একে 'স্মার্ট' বলার কারণ হল গতানুগতিক বোতলজাত জলের তুলনায় এটি একটি স্মার্ট পছন্দ। আসলে এটা বিজ্ঞাপনী চমক। **(ডব্লিউ ফর ওয়াটার এখন বোতল বন্দী, জল ব্যবসায় কত নব নব ফন্দী!)**

**কোথা থেকে আসে স্মার্ট জল?**

ব্রিটিশ পৌরসভা থেকে সরবরাহ করা ট্যাপ জল ব্যবহার ক'রে স্মার্টওয়াটার উৎপাদন করা হয়। পৌরসভা ঐ জল উত্তর কানেকটিকাট রাজ্যের আর্টিসিয়ান ঝর্ণা থেকে সংগ্রহ করে। আসলে স্মার্টওয়াটার হচ্ছে পরিস্রুত কল-জল।

ঐ জলকে প্রথমে বদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করা হয়। তারপর ঐ বাষ্পকে আলাদা পাত্রে শীতল করলে বিশুদ্ধ তরল জল পাওয়া যায়। প্রস্তুতকারী সংস্থার দাবি অনুযায়ী এই পাতন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির জল চক্রকে প্রতিলিপি করে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটার মতো সতেজ ও বিশুদ্ধজল তৈরি করা হয়।

এই জলে কোনও দ্রবীভূত লবন থাকে না। তবে কিছু জৈব বস্তু থাকতে পারে। তাদের দাবি অনুযায়ী ঐ পাতিত জল পুনরায় পরিশোধন করা হয়। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম বাইকার্বোনেট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সোডিয়াম সেলেনেট মেশানো হয়।

বিসফেনল-এ মুক্ত ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের (PET1 বা পলিথিন টেরিথ্যালেট) সুদৃশ্য তথা আকর্ষণীয় বোতলে ঐ জল ভরে বিক্রি করা হয়। এককথায় স্মার্টওয়াটার হচ্ছে সুদৃশ্য ছিমছাম পলিবোতলে বন্দী পুনঃখনিজযুক্ত (remineralized) পাতিত জল।

তবে স্মার্টওয়াটারও দূষণমুক্ত নয়, কারণ এতেও বামন প্লাস্টিক কণা বা ন্যানো প্লাস্টিক থাকে। কলম্বিয়া এবং রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে অন্যান্য জলের মতো স্মার্টওয়াটারেও ন্যানো প্লাস্টিক থাকে।

বিশুদ্ধ জল প্রশম, অর্থাৎ না ক্ষারীয় না আম্লিক। এর পিএইচ (pH) হচ্ছে ৭.০। পিএইচ ৭.০ এর নিচের জল আম্লিক আর ৭.০ এর উপরে জল ক্ষারধর্মী। স্মার্ট জল মূলত দুধরণের : সাধারণ স্মার্টওয়াটার। এর পিএইচ প্রায় ৬.৩-৭.৩ আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত স্মার্টওয়াটার হছে ক্ষারধর্মী বা অ্যালকালাইন যার পিএইচ ৯.৫ বা তার বেশি। ঐ পরিস্রুত জল স্মার্ট ওয়াটার স্পারক্লিং ও স্মার্ট ওয়াটার ক্ষারীয় বা স্মার্ট ওয়াটার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট নামে বিক্রি করা হয়।

গ্লাসউ স্মার্টওয়াটার এখন বিভিন্ন স্বাদে যেমন শসা, লাইম, গ্রিন আপেল, লেবু, জাম, কিউই, স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরি, আনারস কিউই এবং তরমুজ মিন্ট পাওয়া যায়। পলিমার বোতল ছাড়াও ধাতব পাত্র বা ক্যানেও এই জল বিক্রি হয়।

**স্মার্টওয়াটার নতুন নয়।**

১৯৯৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইস মাউন্টেন স্প্রিং ওয়াটার এবং গ্লাসউ মিনারেল ওয়াটার বাজারে আসে। ১৯৯৮ সালে ঐ জলের নাম দেওয়া হলো স্মার্টওয়াটার। কোকা-কোলা স্মার্টওয়াটারের একটি সহযোগী সংস্থা। এখন গ্লাসউ স্মার্টওয়াটারের বিশ্বব্যাপী ব্যবসা। ভারতবর্ষে ২০১৭ সাল থেকে স্মার্টওয়াটারের ব্যবসা শুরু হয়েছে।

**স্মার্টওয়াটার হতে সাবধান!**

পাতন প্রক্রিয়ায় জলের দূষিত পদার্থগুলির সাথে শরীরের জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত লবণও অপসারিত হয়। ঐ জল পান করলে জলের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শরীরের নিজস্ব খনিজ উপাদান বেরিয়ে

যায়। তাই স্মার্টওয়াটারের মতো আরও অনেক পরিস্রুত জল যেমন আর.ও জল দীর্ঘদিন ধরে পান করলে শরীরে মারাত্মক খনিজ ঘাটতি হবে এবং ঐ জল অস্টিওপোরোসিস, ডায়াবেটিস, দাঁতের ক্ষয় এবং হৃদরোগের মতো রোগের কারণ হতে পারে। **(স্মার্টওয়াটার স্মার্ট নয়)**

**স্মার্টওয়াটার ফর আনস্মার্ট ভবিষ্যৎ**

এভাবে প্রাকৃতিক জলকে ব্যবহার ক'রে জলের ব্যবসা দিন দিন প্রাকৃতিক জল ভাণ্ডারকে নিঃশেষ করছে। যার পরিণতি তীব্র জলসংকট ও খরা। এর পাশাপাশি পরিশ্রুতিকরণের সময়ে জলের অপচয়! কোকা-কোলার জনৈক প্রতিনিধি স্বীকার করেছেন যে স্মার্টওয়াটারের ক্যালিফোর্নিয়া-ভিত্তিক বোতলজাত প্ল্যান্টগুলি প্রতি লিটার স্মার্টওয়াটার বা পানীয় উৎপাদন করতে ১.৬৩ লিটার জল লাগে মানে ১.০ লিটার পানীয় পেতে ০.৬৩ লিটার জল নষ্ট করা হয়।

*স্মার্ট ওয়াটার*

**কি ভয়ংকর সত্য! এককথায় স্মার্টওয়াটারের ব্যবসায় আনস্মার্ট ভবিষ্যৎ।**

**গোয়েন্দা স্মার্টওয়াটার**

এ এক অন্য স্মার্টওয়াটার। পুরোপুরি জল নয়। তবুও এর নাম স্মার্টওয়াটার। পানীয় নয়, একটি অদৃশ্য তরল যা কোনও বস্তুর গায়ে লাগলে দেখা যায় না। কিন্তু অতিবেগুনী আলো ফেললে ঐ তরল উজ্জ্বল হলদে-সবুজ বর্ণে জ্বল জ্বল করে অর্থাৎ দৃশ্যমান হয়। তাই ঐ স্মার্টতরল প্রলেপিত বস্তুতে হাত দিলে সেই ছাপ অতিবেগুনী আলোতে প্রতীয়মান হয়। তাই চোর সনাক্ত করতে এবং চুরি রোধ করতে মূল্যবান বস্তুগুলোতে ঐ তরল মাখানো হয় অর্থাৎ সর্বজনীন এলাকায় সম্ভাব্য চোরদের প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এককথায় ঐ স্মার্টতরল হচ্ছে একটি অদৃশ্য সন্ধানযোগ্য বা দেগে দেওয়া ডিজিট্যাল তরল। এটি একটি ফরেনসিক উপাদান যা চিহ্নিতকরণ সিস্টেম বা ট্যাগ্যান্ট হিসাবে কাজ করে। স্মার্টওয়াটার ফরেনসিক কোডিং তরল। স্মার্টতরলকে ধুয়ে ফেলা যায় না, বেশ কয়েক মাসের জন্য অবিকৃত থাকে। ঐ তরল বস্তুর গায়ে কোনও দাগ ফেলে না মানে বস্তুর সাথে কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না।

স্মার্টওয়াটার বা তরল তৈরি করতে একটি নির্দিষ্ট ডিএনএ টাইপ কোড বা সংকেতলিপি বিশিষ্ট রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এই অনন্য কোড প্রতি ব্যক্তির বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট। তাই ঐ বস্তু চুরি হবার পরে উদ্ধার হলে প্রকৃত মালিককে সনাক্ত বা চিহ্নিত করা যায়, পাশাপাশি দোষীকেও চেনা তথা গ্রেফতার করা যায়। ফলে উদ্ধার হওয়া বস্তুটিকে প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া যায়। **(অতিবেগুনী প্রতিভাত ঝকঝকে তরল হচ্ছে গোয়েন্দা স্মার্টওয়াটার)**

স্মার্টওয়াটার তিনরকমের : 'ইনডেক্স সলিউশন', 'ইন্ডসোল ট্রেসার' ও 'স্মার্টওয়াটার ইনস্ট্যান্ট'। 'ইনডেক্স সলিউশন' হচ্ছে একটি জল ভিত্তিক রাসায়নিক দ্রবণ। 'ইন্ডসোল ট্রেসার একটি পলিমার ইমালসন আর 'স্মার্টওয়াটার ইনস্ট্যান্ট' মূলত আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলে ভিনাইল অ্যাসিটেটের একটি কপোলিমার দিয়ে তৈরি একটি তরল। ঐ পলিমারের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র অংশের প্রতিটিতে 'SIN' নামে একটি অনন্য গুপ্তনম্বর এনকোড করা হয়। ঐ SIN বা স্মার্ট ওয়াটার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর মালিকের বিবরণ সহ জাতীয় পুলিশ ডাটাবেসে নিবন্ধিত থাকে। এর ফলে উদ্ধার হওয়া বস্তুর প্রকৃত দাবীদারকে চেনা যায়।

**স্মার্টওয়াটারের উদ্ভাবক কে?**

ইংল্যান্ডে চুরি ও চোরদের রুখতে পুলিসের খুব সমস্যা হচ্ছিল। চুরি যাওয়া দ্রব্যটি যদিওবা উদ্ধার হলো সেটিকে প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া সে আরেক সমস্যা। এই সমস্যা নিরসন করবার জন্য অবসর প্রাপ্ত ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার ফিল ক্লিয়ারি এবং তার ভাই মাইক ক্লিয়ারি উনিশশো নব্বই সালে এক আশ্চর্য তরল উদ্ভাবন করেন। তারা এর নাম দেন স্মার্টওয়াটার। মাইক ক্লিয়ারি একজন চার্টার্ড কেমিস্ট তথা রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রির ফেলো।

এই উদ্ভাবনের জন্য ক্লিয়ারি ভ্রাতৃদ্বয় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস পুরস্কারে ভূষিত হন। তাদের স্মার্টওয়াটার জাতীয় খেতাব লাভ করে। ২০০৯ সালে ফিল ক্লিয়ারি রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসের ফেলোশিপ পান।

ফিল ক্লিয়ারির (Phil Cleary) মতে, স্মার্টতরলের উপাদানগুলি লক্ষ লক্ষ 'রাসায়নিক স্বাক্ষরের' (chemical signatures) সুবিধা দেয়। সম্পদ সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে এই শনাক্তকরণ ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিংয়ের প্রযুক্তির থেকে অনেকটা আলাদা ধরনের ও উচ্চতর পদ্ধতি।

সাউথ ইয়র্কশায়ার পুলিশ স্টাফোর্ডশায়ারে গাড়ি চোরদের ধরতে স্মার্টওয়াটার ব্যবহার করছেন। মূল্যবান ধাতু যেমন সীসার ছাদ ও রেনপাইপ এবং তামার পাইপে স্মার্টওয়াটার প্রয়োগ করে এগুলিকে চুরির প্রবণতা থেকে বাঁচানো হচ্ছে।

ফরেনসিক তরল হিসাবে যথেষ্ট কার্যকরী স্মার্টওয়াটার স্মার্টস্প্রে হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইংল্যান্ডে পুলিশ মহিলাদের সুরক্ষিত রাখতে এবং গার্হস্থ্য হিংসা কমাতে স্মার্টওয়াটার ব্যবহার করছেন।

**তথ্যসূত্র**


১. "Glaceau smartwater". The Coca-Cola Company.
২. Rachel Bridge (October 11, 2009). "How I made it: Phil Cleary, Founder of SmartWater". The Times.
৩. "Digital Water Marks Thieves". Archived from the original on 2010-08-05. Retrieved 2008-10-03. Wired News, 15 February 2005
৪. Evans, Jon (14 November 2012). "Chemistry goes into the field to battle metal theft". Chemistry World.
৫. Water used to out-smart thieves BBC News, 2 July 2005.

প্র দী প কু মা র সে ন গু প্ত

# জলবিভাজিকা প্রকল্প কী ও কেন?

*এই প্রবন্ধে জলবিভাজিকা কী এবং কীভাবে তাকে চিহ্নিত করে উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয় তাই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের জেলাগুলিতে এই জলবিভাজিকার সীমা খুব স্পষ্ট থাকায় সেই সব অঞ্চলে জলবিভাজিকাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। এর ফলে বৃষ্টির জলের প্রাকৃতিক বন্টনের হিসাব করে জলের বিভিন্ন আধার, যেমন নদী, জলাশয় বা ভূগর্ভ থেকে কতটা জল উত্তোলন করা উচিত তার একটা আভাস দেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে। এছাড়া জলবিভাজিকাভিত্তিক জলসম্পদ উন্নয়ণের অভিমুখ কী হওয়া উচিত তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।*

**মূল প্রবন্ধ**

আমাদের রাজ্যের পশ্চিম দিকের জেলাগুলোর কিছু বিশেষত্ব আছে। বাংলা গাঙ্গেয় উপত্যকার মত এখানে ভূমি সমতল নয়। গভীর মৃত্তিকার স্তরের মধ্যে বা আরও গভীরের ভূগর্ভে বিপুল জলভাণ্ডার এই সব জায়গায় অনুপস্থিত। বর্ষা মোটামুটি স্বাভাবিক হলেও ভূমির অসমতলতা ও অতিরিক্ত ঢাল সমস্ত জলকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিম্নঅববাহিকার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে বর্ষার কয়েক মাস বাদ দিলে এইসব অঞ্চল প্রবল জলকষ্টে ধুঁকতে থাকে। প্রধানত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কথাই আলোচনা করা হচ্ছে।

এই সব অঞ্চল মূলত কৃষিপ্রধান, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটায় জলের চাহিদাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আমরা যদি উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করি ও তার রূপায়ণ ঘটানো যায় তাহলে দীর্ঘ সময় ধরে চাহিদা মত জলের যোগান দেওয়া সম্ভব।

এই তিন জেলার পার্বত্য ও ল্যাটেরাইট এলাকা মোটামুটিভাবে ১৫০০০ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১১০০ মিলিমিটারের কাছাকাছি। কাজেই বর্ষার সময় যে পরিমাণ জল এই এলাকায় ঝরে পড়ে তার পরিমাণ ১৫০০ কোটি ঘনমিটার। এটাই প্রকৃতপক্ষে এখানকার প্রকৃত জলসম্পদ, আমাদের যা কিছু পরিকল্পনা, এর ওপর ভিত্তি করেই করা দরকার।

বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পূর্ব অংশের ভূতত্ত্ব অনেকটা গাঙ্গেয় সমতল ভূমিরই অনুরূপ। পুরুলিয়ার সমগ্র, বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশ ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার বেশ কিছু অংশে রয়েছে কঠিন শিলাস্তর যা ভূতাত্ত্বিক প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের কেলাসিত শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। বাঁকুড়ার উত্তর পশ্চিমাংশে আবার রয়েছে গণ্ডোয়ানা যুগের শিলাস্তর। কেলাসিত শিলাস্তরের মধ্যে গ্রানাইট, গ্রানাইট নিস, মাইকা শিস্ট, কোয়ার্টজাইট, অ্যামফিবোলাইট ইত্যাদি। এইসব শিলাস্তরের সান্দ্রতা খুবই কম। কাজেই এর মধ্যে সলিলের সঞ্চয়ও কম। এছাড়া এই তিন জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকা ও প্রস্তর স্তরের ওপর রয়েছে ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাথরের আস্তরণ।

এইরকম ভূতাত্ত্বিক গঠন থাকার জন্য এখানে রয়েছে ঢেউ খেলানো ভূমি। কোথাও বা ছোট বড় পাহাড়। আর এইসব অঞ্চল থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা, ছোট নদী, বড় নদী। এইসব নালা ও নদী দিয়ে বর্ষার সময় প্রবল বেগে জলধারা দূরের সমতল ভূমির দিকে নেমে চলে যায়। এইসব নদী নালা অসংখ্য ছোট বড় অববাহিকার সৃষ্টি করেছে। খুব ছোট নালার যেমন নিজস্ব একটা অববাহিকা আছে তেমন বড় নদীগুলোরও একটা করে নিজস্ব অববাহিকা আছে।

জলসম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য জলসম্পদ সঞ্চয়, উন্নয়ন ও বিতরণের যে কোনও পরিকল্পনাই হওয়া দরকার এইসব অববাহিকাকে ভিত্তি করে। অববাহিকাকে আজকাল ওয়াটারশেড বা জলবিভাজিকা নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

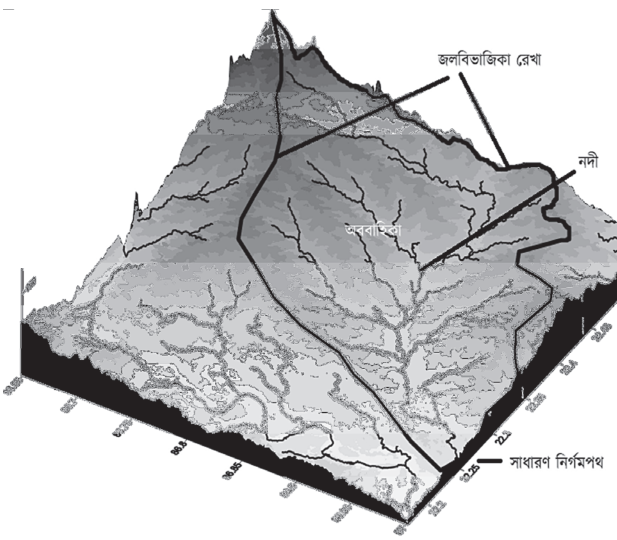


*একটি জল বিভাজিকা প্রকল্প*

**জলবিভাজিকা**

জলবিভাজিকা হল এমন একটি রেখা যা দিয়ে একটি অববাহিকার সীমারেখাকে চিহ্নিত করা হয়। এই জলবিভাজিকা দিয়ে সীমিত বা চিহ্নিত ক্ষেত্রটিতে যে বৃষ্টিপাত হয় তা একটিমাত্র নির্গমপথ দিয়ে ঐ অববাহিকা থেকে বেরিয়ে যায়। প্রতিটি অববাহিকারই নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্র আছে। ক্ষুদ্র অববাহিকার অধিক্ষেত্র তার থেকে বড় আর একটি অববাহিকার অধিক্ষেত্রের অধীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাঁকুড়া জেলার ছাগলকুটা নালার ক্ষুদ্র অববাহিকা তার চেয়ে বড় অর্কোসা নদীর অববাহিকার অধীন। আবার অর্কোসার অববাহিকা দ্বারকেশ্বর অববাহিকার অধীন। অর্থাৎ ছাগলকুটার সব জল গিয়ে পড়বে অর্কোসাতে এবং অর্কোসার সব জল গিয়ে পড়বে দ্বারকেশ্বরে। কিন্তু অর্কোসার অধীন আর একটি নালা কানসাচারা কিন্তু অর্কোসাতেই তার জল ঢেলে দেবে। ছাগলকুটাতে দেবে না। এই হিসাবে প্রতিটি ক্ষুদ্র অববাহিকাই জলসম্পদের ক্ষেত্রে এক একটি ভৌগোলিক একক ক্ষেত্র। কারণ কয়েকটি ক্ষুদ্র জল বিভাজিকা নিয়ে গঠিত হয় একটি মাঝারি জলবিভাজিকা, আবার কয়েকটি মাঝারি জলবিভাজিকা নিয়ে তৈরি হয় তার চেয়ে বড় আর একটি জলবিভাজিকা, এবং তার সমষ্টি দিয়ে আরও বড়। জলসম্পদের স্থানীয় ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্টের জন্য এই ক্ষুদ্র জল বিভাজিকাগুলি থেকেই কাজ শুরু করা দরকার।

## জলসম্পদের প্রাকৃতিক বন্টন

জল ভূমিতে পড়ার পর কীভাবে ও কী পরিমাণে কোথায় চলে যায় তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং করছেন। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় জল মাটিতে পড়ার আগে তা গাছের পাতায়, কাণ্ডে ও ঘাসের বুকে এসে পড়ে। কোথাও কোথাও ন্যাড়া জমি থাকলে সরাসরি মাটিতে এসে পড়ে। এরপরে তার এক অংশ মৃত্তিকার মধ্যে আশ্রয় লাভ করে ও মৃত্তিকাকে জলে সমৃদ্ধ করে যতক্ষণ না তা একবারে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

মৃত্তিকা সম্পৃক্ত হলে পরে শুরু হয় জলপ্রবাহ। অবশ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হলে মৃত্তিকাতে সঞ্চয় ও প্রবাহ একই সাথে চলতে থাকে। এই প্রবাহের এক অংশ ভূমিগর্ভে প্রবেশ করে গ্রাউণ্ডওয়াটার বা ভূসলিল রূপে এবং তা ভূগর্ভের সলিল ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে। ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জল জমির ঢাল, নালা ইত্যাদি গতিপথকে অনুসরণ করে চলে। পথের মধ্যে পুকুর, নালা বাঁধ ইত্যাদি থাকলে সেখানে সঞ্চিত হতে থাকে। বাকি জল প্রবাহিত হয়ে ক্রমে জলবিভাজিকা থেকে বেরিয়ে যায়। এবার এই সঞ্চিত জলভাণ্ডারের মধ্যেও একটা বন্টনের ও প্রবাহের কাজ চলে। ভূগর্ভের জলভাণ্ডারেও জলের একটা প্রবাহ থাকে এবং তা থাকে ওপর থেকে নিচের দিকে। ক্রমে এই জল অববাহিকার নিচের দিকে ঝর্ণার আকারে ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে ও ভূপৃষ্ঠের জলপ্রবাহের সাথে যোগ দেয়। এই কারণেই বর্ষার বহু পরেও কিছু কিছু নদী বা নালায় অনেকদিন ধরে জলস্রোত বজায় থাকে। এইভাবে ভূগর্ভের জলভাণ্ডারও প্রকৃতির খেলায় নিঃস্ব হতে থাকে। মৃত্তিকায় সঞ্চিত জল অতি মূল্যবান। কারণ তা হল আমাদের গাছপালা ও শস্যের মূল জলের উৎস। গাছপালা এই জল শোষণ করে বাতাসে ছেড়ে দেয়। একে বলে স্বেদন বা বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া। নদী, নালা ও পুকুর থেকে সূর্যের তাপে সরাসরি বাষ্পীভবন ঘটে থাকে। এইভাবেও জলের একটা অংশ অববাহিকা থেকে বেরিয়ে চলে যায়। তাই হিসাব করলে দেখা যায় যে পরিমাণ বৃষ্টির জল অববাহিকাতে এসে ঢুকেছিল তা বর্ষার আগে আবার অববাহিকা থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা তাই জলের হিসাব নিয়ে একটা সমীকরণ রচনা করেছেন যার সহজ চেহারা হল :

বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য জল = প্রাথমিক সঞ্চয় + মৃত্তিকাতে সঞ্চয় + ভূগর্ভে সঞ্চয় + পুকুরে সঞ্চয় + বাষ্পীভবন ও স্বেদন + প্রবাহ।

এই যে জলের সমীকরণ, এর প্রতিটি অংশকেই আলাদা আলাদা ভাবে মাপা যায় বা পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। আর মাপা যায় বলে এবং প্রতিটি সঞ্চয় ও প্রবাহের পরিমাণের পেছনে ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও সলিলতাত্ত্বিক কারণগুলো জানা আছে বলে এদের পরিমাণের ওপর মানুষের প্রভাব খাটানো যায়। অর্থাৎ পরিমাণগুলো বাড়ানো বা কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বৃষ্টিপাতের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। খুব সহজে তাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। কিন্তু সঞ্চয়ের বা প্রবাহের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো যায়। তবে একটা বাড়ালে অন্যটি কমবে।

কিভাবে কোথায় জলসম্পদের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো হবে তা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করার নামই হল জলবিভাজিকায় জলসম্পদের পরিকল্পনা।

## জলসম্পদের পরিকল্পনা

জলসম্পদের পরিকল্পনার কয়েকটি ধাপ আছে। তা হল : (১) জলবিভাজিকার সীমানা নির্ধারণ করা। (২) কয়েকটি মানচিত্র রচনা করা দরকার যার মধ্যে ভূমির বন্টন ব্যবস্থা, প্রবাহের পথগুলো, ভূমির ব্যবহার, মৃত্তিকার গভীরতা, ভূমির ঢাল, মানবসম্পদের পরিমাণ, কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ ইত্যাদি বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট করা আছে।

জলবিভাজিকার ভূতাত্ত্বিক ও সলিলতাত্ত্বিক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা ও তার মানচিত্র রচনা করা দরকার। যার মধ্যে ভূ সলিলাধারের গভীরতা, তার সান্দ্রতা, জলধারণ ক্ষমতা, পুকুর ও অন্যান্য জলাধারের তথ্য রাখা আছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানাও খুব দরকার।

এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই জলবিভাজিকার জলসম্পদের পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। এই তিন জেলায় এই পরিকল্পনার নীতি হওয়া উচিত, গড়িয়ে যাওয়া জলপ্রবাহকে কম বা দীর্ঘায়িত করে যত বেশি দিন সম্ভব জলকে জলবিভাজিকার মধ্যেই আটকে রাখা। মাটির আর্দ্রতা সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানোও পরিকল্পনার আর একটি জরুরী অঙ্গ।

## পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক

জলবিভাজিকার জলসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক হল—

ক) **ভূপৃষ্ঠে জলপ্রবাহ কমানো :** এ জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা হল জলের ধারা যে পথ দিয়ে নামা শুরু করে অর্থাৎ ছোট ছোট নালার মধ্যে জল সংরক্ষণের কাজ শুরু করা। এক্ষেত্রে নালার মধ্যে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে প্রবাহকে রোধ করা যেতে পারে। ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমগ্র নালা জুড়ে এই রকম অনেকগুলি নালাবাঁধ বা চেকড্যাম তৈরি করলে জলের ধারা বারবার বাধা পেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে ওপর থেকে নিচে নেমে আসবে।

*চেক ড্যাম*

খ) **ভূগর্ভের জলের সঞ্চয় বৃদ্ধি করা ও প্রবাহ কমানো :** এটা অবশ্য প্রথমেই করা যায় না। এর জন্য ভূগর্ভের ভূতত্ত্ব ও সলিলবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আলোচ্য জেলাগুলিতে কঠিন শিলাময় অঞ্চলে ভূ-সলিল সঞ্চিত থাকে ওইসব শিলাস্তরে আবহবিকারগ্রস্ত এলাকায় এবং প্রস্তরের মধ্যে নানা ধরণের ফাটলে। কিন্তু এর মধ্যে জল সঞ্চয়ের পরিমাণ খুব সামান্য। এই পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দরকার নানা ধরনের কাজ। প্রত্যক্ষভাবে এটা করতে গেলে এর একটি পদ্ধতি হল ভূগর্ভে কৃত্রিম বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফাটলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। আর অন্যটি হল একটি কূপ খনন করে কূপটির ভেতরে আনুভূমিক শাখা কূপ নির্মাণ করা।

পরোক্ষভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায় ভূগর্ভে প্রবাহের পথে বাধার সৃষ্টি করে। এর জন্য একটি পদ্ধতি হল ভূগর্ভে প্রোথিত বাঁধ নির্মাণ করা যাতে ভূগর্ভের জলের প্রবাহ নিচের দিতে যেতে না পারে। একে সাবসারফেস ডাইক বলা হয়।

জলের কৃত্রিম অনুপ্রবেশ ঘটিয়েও ভূগর্ভে জলের সঞ্চয় বাড়ানো যায়। এ পদ্ধতি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির ছাদের ওপর সঞ্চিত বৃষ্টির জল নলের সাহায্যে কোনও কূপ বা নলকূপের মধ্যে ঢেলে দিয়ে ভূগর্ভের জলের সঞ্চয় বাড়ানোর কাজ করা হচ্ছে। একইভাবে কোনও জলাশয় থেকে জল এনে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়েও এই কাজ করা যেতে পারে।

গ) **ভূপৃষ্ঠের জলের সঞ্চয় বাড়ানো :** ভূপৃষ্ঠে জল সঞ্চিত থাকে পুকুর বা বাঁধে। এইসব বাঁধ বা পুকুরে বৃষ্টির জল যেমন জমা থাকে ঠিক তেমনই পৃষ্ঠপ্রবাহের একটা বড় অংশ এসে এখানে জমা হয়। এখানে সঞ্চয় বাড়ানোর প্রথম ধাপ হল এগুলোকে সংস্কার করে তার গভীরতা ও বিস্তার বাড়ানো। এছাড়া নতুন জলাশয় বা পুকুর খনন করে এই সঞ্চয় আরো বাড়ানো যায়।

জলবিভাজিকা নির্মাণ নিচের জমিতে জল সঞ্চয় অনেকখানি সুনিশ্চিত করেছে। এগুলোকে সংস্কার করে তার গভীরতা ও বিস্তার বাড়ানো। এছাড়া নতুন পুকুর খনন করে এই সঞ্চয় আরও বাড়ানো যায়। ভূপৃষ্ঠের এই সঞ্চিত জলের একটা ভাগ খুব ধীরে ধীরে ভূগর্ভে যেতে থাকে। কাজেই যত জলাশয় বাড়ানো হবে ভূগর্ভের জলের পরিমাণও তার ফলে বেড়ে যাবে।

ঘ) **মাটির আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ানো :** মৃত্তিকাতে জল সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মাটির সান্দ্রতা, বুনট বা টেক্সচার ও মাটির স্তরের গভীরতার ওপর। মাটিতে জল ধরে রাখার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। বর্ষার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব এলাকার মাটি সেই মাত্রায় মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

মাটির আর্দ্রতা বাড়ানো ও সেই সাথে জলের প্রবাহ কমানো ও একই সাথে জল ধরে রাখার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হল উঁচু এলাকায় বনসৃজন করা। বনভূমি যেমন একদিকে পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে, অন্যদিকে অববাহিকার ভেতরেই জলকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা অপরিসীম। এর কোনও বিকল্প নেই।

### পরিকল্পনায় মানচিত্রের ব্যবহার

জলবিভাজিকার জলসম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সবচেয়ে জরুরী হল জলসম্পদের মানচিত্র গঠন। এই মানচিত্রে বিভিন্ন ঋতুতে জলের প্রবাহের ধারা, ভূ-সলিলের অবস্থা, এলাকায় পুকুর ও বাঁধের অবস্থান ইত্যাদি তথ্য থাকা দরকার। এই ধরনের সব মানচিত্র একত্র করলে জানা যাবে কোনখানে কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তার ফল দীর্ঘস্থায়ী হবে ও তার উপকারিতা সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত জলবিভাজিকার ভূতত্ত্ব, ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও ভূমির ব্যবহারের ওপর। এর জন্য জলবিভাজিকাকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। উঁচু এলাকা যাকে প্রধানত টাড় বা ডাঙ্গা জমি বলা হয়। সেখানে জল ব্যবহারের থেকেও জল সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া দরকার। এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বনসৃজন। এরপরেই রয়েছে বাইদ ও কানালি জমি, এসব এলাকায় জমির ঢাল টাঁড়ের চেয়ে কম। এখানে মৃত্তিকার পরিমাণও বেশি। এখানে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন দুটোই চলতে পারে। তবে তার আগে এখানকার জলসম্পদের পরিস্থিতি ভালো করে সমীক্ষা করে দেখা দরকার। এই সমীক্ষা থেকে গড়ে ওঠা মানচিত্র বিভিন্ন ধরনের কূপ খননের ও পুকুর খননের স্থান নির্বাচনে সাহায্য করবে।

বহাল জমি স্বভাবতই ভালো জমি। মাটির গঠন ও তার মান ভাল। কাছাকাছি জলের প্রবাহও থাকতে পারে। জমিতে আর্দ্রতার পরিমাণও অধিকাংশ সময়ে বেশি থাকে। কাজেই এখানে সংরক্ষণের থেকেও উন্নয়ন ও বছরে যাতে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায় তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

জলবিভাজিকা সম্পর্কে মানুষের ধারণা আজকাল অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। সরকারের অনেক পরিকল্পনাই এখন জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন। এক্ষেত্রে কাজের ঠিকমত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে ও জলসম্পদ অনুসারে ফসল নির্বাচন করলে এই এলাকাগুলো আর পিছিয়ে থাকবে না। বরং এই উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কিছু বিকল্প কর্মসংস্থানও হতে পারে। এই স্বল্প পরিসরে সেই সবেরই কিছু আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

### তথ্যসূত্র


1. Reddy, V. R. (2019, January 1). Watershed management in Afghanistan: Lessons from South Asia. Current Directions in Water Scarcity Research. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-814851-8.00003-3.
2. Sengupta, P. K. (2017, November 13). Industrial Water Resource Management. John Wiley & Sons. http://books.google.iebooks?id=0EkzDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=978-1-119-272502&hl=&cd=3&source=gbs_api.
3. Tideman, E. M., & Basham, A. L. (1996, January 1). Watershed Management. http://books.google.ie/books?id=KrwoAAAACAAJ&dq=Watershed+Management+Guidelines+for+Indian+Conditions&hl=&cd=1&source=gbs_api.
4. Watershed management and development. (n.d.). TERI. https://www.teriin.org/index.php/blog/watershed-management-and-development.
5. Watershed management. (2024, February 8). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Watershed_management.

সৌমেন বিশ্বাস

# জল ও নগরায়ণ

*জল ছাড়া মানুষ তথা জীব জগতের পার্শ্বপ্রতিক্রীয়াহীন জীবন যাপন অলীক কল্পনা মাত্র। শহর বা নগরে জলের ভূমিকা আরো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জল ও নগরের সম্পর্ক আজকের নয়। প্রাচীন কাল থেকেই। স্বল্প পরিসরে নগরে জলের প্রাচীন ইতিহাস অতি সংক্ষেপ উল্লেখ করেছি মাত্র। গ্রাম ছাড়া নগর হয় না। ফলে নগরের কথা বলতে গিয়ে গ্রামের কথা বারবার এসেছে। জল সংকটের প্রাক্কালে শহর ও নগরের যাবতীয় সমস্যা উপেক্ষা করে এখনো সুন্দর করে গড়া যায়। প্রয়োজন শুধু আপনার সহযোগিতা।*

*পাইপলাইনের সাহায্যে জল সরবরাহ*

যাযাবর জীবন ছেড়ে দলবদ্ধ বা সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন শুরু করলে প্রকৃতিগত ভাবে গড়ে উঠেছিল গ্রাম। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে যখন আগুন আবিষ্কার হয়নি অর্থাৎ আগুনের ব্যবহার শুরু হয়নি বা মানুষ জানত না আগুনের ব্যবহার, সেই সময়ে কোনো না কোনো নদী, হ্রদ, জলাশয় বা জলাধারের কাছে গ্রামগুলি গড়ে উঠেছিল। যাযাবর আদিম মানুষেরাও উপলব্ধি করেছিল শুধু পশুশিকার করে বা গাছের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না। চিরস্থায়ী জীবন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজন জল। পানীয় জল। স্বভাবত তাঁদের আনাগোনা, গতিবিধি, যাযাবর জীবন যাপন ছিল নদী, জলাশয়ের কাছাকাছি। আদিম মানুষ যখন পশুপালনে সক্ষম হল এবং উদ্ভিদবিদ্যা তথা কৃষিকাজ আয়ত্ব করল তখন তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। জীবিকার তাগিদে যাযাবর অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হয়। উদ্ভব হল স্থায়ী বসতি বা বসবাস। পৃথিবীর প্রচীনতম গ্রাম ক্যাটালহয়ুক (Catalhoyuk)-এ ৭৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বসতি শুরু হয়। গ্রামটি বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত। ভারতবর্ষের প্রথম গ্রাম মানা (Mana), উত্তরাখন্ড রাজ্যের চামোলি জেলায় ভারত-চিন সীমান্তে ভারতের শেষ গ্রাম। প্রকৃতির কোলে প্রকৃতি ঘেরা প্রকৃতির সৃষ্টি হল গ্রাম।

**নগরায়ন**

প্রকৃতি গড়েছে গ্রাম আর মানুষ গড়েছে শহর, নগর। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটল। সমাজে শ্রমবিভাগের ফলে সমাজের অধিকতর সুবিধাভোগী উচ্চশ্রেণীভুক্ত কৃষিজীবীর উদ্ভব হয় এবং শহর গড়ে উঠে। বিশ্বের প্রথম শহর সিরিয়ার দামাস্কাস ১১০০০ বছরের পুরানো। ভারতের ধোলাভিরা, চানহুদারো, মহেঞ্জোদাড়ো, সোতকাকোহ, সুরকোটাদা, কালিবঙ্গন, লোথাল এবং হরপ্পা। এগুলো ৪৭০০ বছরের পুরানো। গ্রাম বা গ্রাম থেকে দূরে বা কাছে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে যেখানে সহজ সরল স্বচ্ছন্দ আয়াসসাধ্য হওয়ার জন্য জীপন যাপনের উপাদানগুলি সহজ লভ্য সেখানে পশুপালন এবং কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল গ্রামের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অতিরিক্ত মানুষজন স্থানান্তরিত হয় শহর তথা নগরে।

প্রকৃত অর্থে নগরায়ণ হল অতিরিক্ত জনসংখ্যার স্থানান্তর। গ্রাম থেকে শহরে। অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছল জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে। বিকল্প জীবিকা এবং উন্নত পরিকাঠামো ও জীবন সহায়ক সুযোগ সুবিধার জন্য। নগরে মানুষের জন্য উন্নত পরিষেবা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ক্রমবর্ধমান শহর বা নগরে পরিবহণ ব্যবস্থার বিকাশ, নানা প্রকার সরকারি অফিস গড়ে ওঠায় উপযুক্ত পরিকাঠামো সহজলভ্য হওয়ায় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। নগরায়নের জন্য উন্নত নগর পরিকল্পনা, সমাজবিজ্ঞান, স্থাপত্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, পরিসংখ্যান এবং জনস্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন শাখার সাথে নগরবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক। বিশ্বায়ন, আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, বাজারীকরণ, প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যদিও আর্থসামাজিক উন্নয়নে নগরায়নের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তবুও অতিরিক্ত বাড়তি পাওনা ভোগ-বিলাসতা, সুখসম্ভোগ উপেক্ষা করা যাবে না।

**নদী কেন্দ্রিকতা**

নগরায়নের ইতিহাস সাক্ষী দেয়, পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকেই নগরায়ন হল নদী নির্ভর। ভারতেও তার অন্যথা হয়নি। নদীকেন্দ্রিক নগর ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। প্রাচীন কালের প্রায় পাঁচ হাজার বছরে পুরানো সিন্ধু সভ্যতার আমলেই নগরায়নের বিকাশ ঘটে সিন্ধু নদের উপকূলে। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের মধ্যে বিশ্বে হ্রদ এবং নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে অনেক নগর গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে উন্নতি ও উৎকর্ষতার নিরিখে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মেসোপটেমিয়ার অর্থ দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস বা দজলা এবং ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯-এর মধ্যে অতি উন্নত এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমান ইরাক, সিরিয়ার উত্তরাংশ, তুরস্কের উত্তরাংশ এবং ইরানের খুয়েস্তান প্রদেশের অঞ্চলগুলোই প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত ছিল বলে অনুমান। সভ্যতার আতুরঘর হিসাবে পরিচিত মেসোপটেমিয়া সভ্যতা থেকে ব্রোঞ্চ যুগে আক্কাদীয়, ব্যবিলনীয়, আসিরীয় সভ্যতা এবং লৌহ যুগে নব্য ব্যবিলনীয়, নব্য আসিরীয় সভ্যতা গড়ে উঠে।

মিশরীয় সভ্যতা প্রাচীনকাল থেকেই নীলনদের উপর নির্ভরশীল।

মিশরের জনসংখ্যার বেশিরভাগ মানুষ ও শহর নীলনদের তীরে অবস্থিত। প্রাচীন মিশরের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল নীলনদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জল হাওয়ায় প্রভাবিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ইমারত নীলনদের তীরে অবস্থিত। জীবন ধারণ, যাপন সমস্ত কিছু নীলনদ নির্ভর। এমনকি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলও প্রভাবিত নীলনদের জলবায়ুতে।

ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে সিন্ধুনদের উপকূল বরাবর খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ সময়কালে সিন্ধু সভ্যতা ছিল। এই সভ্যতা পাঞ্জাব প্রদেশের সিন্ধুনদের তীরে বিকাশ লাভ করেছিল। পরে সম্প্রসারিত হয় ঘগ্গর-হকরা নদী উপত্যকা ও গঙ্গা-যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলের মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত। ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত ছিল। হরপ্পা ছিল সিন্ধু সভ্যতার প্রথম আবিষ্কৃত নগরগুলোর অন্যতম। মহেঞ্জোদড়ো সিন্ধু সভ্যতার বৃহত্তম নগর বসতিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সাল থেকে ২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মেক্সিকোর দক্ষিণে ও উত্তর আমেরিকায় মায়া ভাষাভাষীর মানুষ বাস করত। প্রাচীনকালে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ সাল থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মায়া নগরগুলো উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়। এই সভ্যতা ছিল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঘন জনবসতিপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিক ভাবে প্রগতিশীল সমাজ। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, বেলিয়া এবং হন্ডুরাস, এল সালভাদরের পশ্চিম অংশ নিয়ে মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমান হন্ডুরাস রাষ্ট্রের মায়া নগরের পূর্ব দিক বরাবর কোপায়েন নদী বয়ে গিয়েছে। একই ভাবে পীত নদীর তীরে চীন সভ্যতা, রোমান সভ্যতা টাইবার নদীর ধারে গড়ে ওঠে।

**নগরাঞ্চলে জলের উৎস**

ভূপৃষ্ঠতলের জল তথা নদী, হ্রদ, দীঘি, জলাশয়ের জল, কুয়োর জল প্রকৃতি প্রদত্ত জল। সুলভ ও সহজলভ্য। কুয়োর জল সহজলভ্য হলেও সুলভ নয়। আর ভূগর্ভস্থ জল প্রকৃতি প্রদত্ত হলেও সুলভ বা সহজলভ্য কোনোটাই নয়। জলের তৃতীয় উৎস বৃষ্টির জল, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ সহজেই করা যায়।

শহরাঞ্চলে জলের ব্যবহার কালের নিরিখে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক ১৯৩০ সাল পূর্ববর্তী কাল, দুই ১৯৩০ সাল এবং পরবর্তী কাল। ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশে প্রথম নলকূপ বসে। ১৯৩০ সাল নগরায়নের মাইলফলক বলা যেতে পারে। লক্ষণীয়, ১৯৩১ সাল থেকেই ব্রিটিশীয় ভারতবর্ষে প্রকৃত আধুনিক নগরায়ন হয় এবং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

১৯৩০ সাল ও পূর্ববর্তী সময়ে, এমনকি বর্তমান সময়েও ভূপৃষ্ঠতলের জল এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহ, পরিশোধন, সুষ্ঠ বন্টন ব্যবস্থাপনায় পানীয় এবং অপেয় জল সরবরাহ করা হয়, শহর ও নগরগুলোতে। পাতকুয়ো খনন করে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার করা হত প্রাচীনকাল থেকেই। পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন কুয়োর সন্ধান পাওয়া যায় জর্ডন এবং ইসরাইলের সীমান্তবর্তী জেজরিল উপত্যকায় (শেয়ার বিজ নিউজ, ১৯ আগস্ট, ২০১৮, বাংলাদেশ)। বিংশ শতাব্দীর শেষেও পাতকুয়োর ব্যবহার ছিল। এখনো মফঃস্বল শহর ও গ্রামে এর অব্যবহৃত কুয়োর নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ে নলকূপের ব্যবহার শুরু হলে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার প্রাধান্য পেল। ভূগর্ভস্থ বিশুদ্ধ জল সরাসরি পানযোগ্য হল। কৃষিক্ষেত্রে (গ্রামে) সেচের কাজ, শহরে বিনোদন উদ্যান, সন্তরণ-কুন্ড, রাস্তা ধোয়ার কাজ, যানবাহন ধোয়া, গৃহস্থালির কাজ ইত্যাদি নানাবিধ কাজে নলকূপের জল ব্যবহার হতে লাগল। হস্তচালিত নলকূপ, তার সাথে যুক্ত হল যন্ত্রচালিত জল উত্তোলক নলকূপ, বাড়িতে বাড়িতে।

**নগরাঞ্চলে জলের ব্যবহার**

নদী মানেই তো জল, আর জল মানেই প্রাণ। যেখানে জলের উৎস সেখানে জীবন ধারণ সহজসাধ্য। চাষবাস, পশু পালন সবেতেই চায় জল। জল ছাড়া জীবন অচল। জল জনজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। জল জীবনের পরিপূরক। শহরাঞ্চলে জলের চাহিদা অত্যধিক। শহরাঞ্চলে ঘনবসতি, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, প্রশাসনিক ভবন, চিকিৎসাকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র, বিনোদন উদ্যান, সন্তরণ কুন্ড ইত্যাদি কারণে অধিক জলের প্রয়োজন হয়। পায়খানায় জল প্রক্ষেপণ ও শৌচাগার পরিষ্কার, নন্দনিক প্রাকৃতিক ভূমিদৃশ্য (Beautiful Landscaping)। ভারতীয় মান (Indian Standard) অনুযায়ী নাগরিক জীবনে প্রতিদিন প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক মানুষের ২০০ লিটার জল দরকার। আর্থিকভাবে দুর্বল বা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য ১৫০ লিটার জল প্রতিদিন প্রয়োজন, শহরে। আর গ্রামে ১৩৫ লিটার।

ভারতীয় মান IS1172-1971 অনুসারে জন প্রতি প্রতিদিন প্রয়োজনীয় ন্যুনতম জলের পরিমাণ:

| বিবরণ | শহর | স্বল্প আয়ের/আর্থিক দুর্বল ব্যক্তি/গ্রা |
|---|---|---|
| পানীয় জল | ৩ লিটার | ৫ লিটার |
| রান্নার জল | ৪ লিটার | ৫ লিটার |
| স্নানের জল | ২০ লিটার | ৫৫ লিটার |
| স্যানিটেশন | ৪০ লিটার | ৩০ লিটার |
| পোশাক ধোওয়া | ৪০ লিটার | ২০ লিটার |
| থালা-বাসন পরিষ্কার | ২০ লিটার | ১০ লিটার |
| ঘরোয়া বাগান, বাড়ি পরিষ্কার | ২৩ লিটার | ১০ লিটার |
| ব্যবহার্য মোট জলের পরিমাণ | ১৫০ লিটার | ১৩৫ লিটার |

**নগরায়নে নগরবাসী**

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বছরে আনুমানিক প্রায় ৮কোটি করে বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রস্তাবিত জনসংখ্যা ১০০০ কোটিতে পৌঁছাবে। বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের কাছাকাছি লোক শহরে ও নগরে বাস করছে। অবশ্য এই শতাংশের হার সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকবে (UWC & M)।

নগরগুলিতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে দুই শতাংশ, যেখানে নগরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ, প্রায় চার শতাংশ প্রতি বছর। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে প্রায় ৩৭.৭ কোটি মানুষ, দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১.১৬ (প্রায়) শতাংশ শহরে বাস করে। অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় ৬৪ শতাংশ এবং উন্নত বিশ্বের ৮৬ শতাংশ শহরে বসবাস করবে। ২০৫০ সালে নগরবাসীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে প্রায় ৩০০ কোটি, যার সিংহভাগ বৃদ্ধি পাবে আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে। উল্লেখনীয়, জাতিসংঘের প্রস্তাবনা অনুসারে, ২০১৭ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই হবে

সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। পরবর্তী ১০বছরে (২০৩০ সালের মধ্যে) ১১০ কোটি নতুন নগরবাসী বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ কালক্রমে উল্লেখযোগ্যভাবে জীবনের মানের অবনমন হবে। বেশিরভাগ শহরবাসীর জন্য জমির কৃত্রিম অভাব তৈরি হবে। বাস্তবিকপক্ষে পানীয় জলের চরম সংকট দেখা দিতে চলেছে। পরবর্তী ২০ বছরের সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জীবনযাপনে পরিবর্তন, সার্বিক উন্নয়ন এবং কৃষিকাজের পরিচর্যার জন্য ক্রমবর্ধমান অত্যধিক জলের চাহিদা বাড়বে। ২০৫০ সালের মধ্যে কল কারখানা এবং গৃহকর্মে জলের বর্তমান চাহিদার থেকে আরো ২০ থেকে ৫০ শতাংশ বাড়বে (Global Trends)।

**নগরে আবাসনের আগমন**

শহর/নগরগুলোতে আত্যধিক জন সমাগমের চাপে বাসস্থান বা আশ্রয়স্থলের যোগান কমে যাচ্ছে। সাধারণ মানসিকতা শহরের কেন্দ্রস্থলে সর্বাধিক ও সর্বোত্তম পরিষেবা সহজলভ্য। সেইসাথে পর্যটক, পরিযায়ী চাকুরীজীবী ও পরিযায়ী বেকার। গ্রাম থেকে, জেলা থেকে শুধু বেকার যুবক-যুবতী নয়, কর্মহীন আবালবৃদ্ধবনিতা শহরে ভীড় জমায় কাজের সন্ধানে। জমির অভাবে বাসস্থানের প্রয়োজনে বহুতল আবাসনের প্রবর্তন হয়েছে। একেকটি আবাসন একেকটি গ্রাম (গ্রামের নিরিখে) বা ওয়ার্ড (শহরে)। একেকটি আবাসনে পৌরসভাগুলোতে কম করে ৩০-৪০টি এবং বহুজাতিক পৌরনিগমগুলোতে ২০০-২৫০টি করে অথবা আরো বেশি ফ্ল্যাট রয়েছে। আবাসনে প্রথম এবং সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় উপাদান হল জল।

**নগরায়নে জলের চালচিত্র**

দিল্লী পৌরনিগমের প্রায় ১ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ নগরবাসীকে ১৪,৩৩৫ কিলোমিটার নলবাহী জল এবং ১০৭টি প্রাথমিক ভূগর্ভস্থ জলাধার সমন্বয়ে যৌথ জল সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জল পৌঁছে দেয়।

মুম্বাই পৌরনগমে ২২০-৫৫০ সেন্টিমিটার ব্যাসের মোট প্রায় ১০০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মাধ্যমে অশোধিত এবং পরিশোধিত দুই রকম জলই বিতরণ করা হয়। মুম্বাইয়ের উপকণ্ঠে অবস্থিত ৪টি বাঁধ বৈতরনা, তানসা, ভাতসা ও মোদক সাগর এবং মুম্বাইয়ে অবস্থিত ৩টি হ্রদ ভেহার, তুলসি ও মধ্য বৈতরনা থেকে মিষ্টি জল ব্যবহার করা হয়। বাঁধ এবং হ্রদগুলোর বর্তমানে জলের সঞ্চয় কমে ৫৮.৮৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ভয়ঙ্কর অবস্থা। এখনই সতর্ক হতে হবে।

বাঙ্গালুরুর জন্য বেশিরভাগ জল শহরের ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে কাবেরী নদী থেকে আমদানি করা হয়। কাবেরীর জল মূলত থোরেকদনাহল্লি গ্রামের কাছে জলাধার থেকে তোলা হয়। বাঙ্গালুরুর লেকসিটি বা গার্ডেনসিটি তকমা মুছে যেতে বসেছে। সেই বাগানও নেই, সেই হ্রদও নেই। কাবেরীর জলই ভরসা। সেটাও এখন বাড়ন্ত।

কলকাতা পৌরনিগম হুগলী নদীর জল পাম্পের সাহায্যে তুলে পলতায় ওয়াটার ওয়ার্কসে পাঠায়। প্রতিদিন ২৬০০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্দিরা গান্ধী ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে জল পরিশোধন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র ভাগীরথী-হুগলী নদীই কলকাতা ছাড়াও মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থেকে নদী বরাবর ছোট বড় বহু শহরের জল সরবরাহকারী নদী। ফারাক্কা বাঁধ এবং ভাগীরথী নদী সংযোগকারী ফিডার ক্যানাল ভাগীরথী-হুগলী নদীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সারা বছর জলপ্রবাহ বজায় থাকে।

বর্তমান ভারতে প্রায় ৪০০০ শহর ও নগর রয়েছে যেখানে নদী, হ্রদ বা জলাধারের জলে নগরবাসীর জলের প্রয়োজন মিটছে। কিন্তু মফস্বলের শহর বা নগরের উপকণ্ঠের পৌরসভাগুলোর অনেকাংশের চিত্র বিপদজনক। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনে অতিরিক্ত জলের চাহিদা পূরণ করতে পরিকল্পনা ছাড়া নিয়ন্ত্রনহীন ভূগর্ভস্থ জল ব্যপকভাবে তোলা হচ্ছে। ভূগর্ভের জলস্তরও ক্রমাগত দ্রুত নেমে যাচ্ছে নাগালের বাইরে। যন্ত্রও ব্যর্থ হচ্ছে। গভীর বা অগভীর নলকূপ, বিদ্যুৎ চালিত সাধারণ জল উত্তোলক পাম্প, জেট পাম্প বা সাবমার্সিবল পাম্প সবই ভূগর্ভ থেকে জল উত্তলনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আবাসনে জল সরবরাহ সংযোগের প্রাথমিক দায়িত্ব যখন নির্মাণ সংস্থার তখন সংস্থা সাবমার্সিবল পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল তোলার ব্যবস্থা করে দেয়। তাদের হাতের কাছে সাধ্যের মধ্যে সুলভ ব্যবস্থা ভূগর্ভে নিমজ্জিত পাম্প (সাবমার্সিবল পাম্প)। আমাদের দেশের প্রায় জায়গার ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিক প্রবণ হওয়ায়, নিশ্চিত আর্সেনিকমুক্ত পানযোগ্য সহজলভ্য জল পেতে ভূগর্ভে নিমজ্জিত পাম্প ব্যবহার করে। যদিও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পৌরসভার অনুমোদন দেওয়া হয় না। এখন পৌরসভা সাবমার্সিবল পাম্প নিষিদ্ধ করেছে। তা সত্বেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। আবাসনগুলোতে জল সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো অনেক পৌরসভারই নেই। জরুরী ভিত্তিতে পৌরসভাগুলিকে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন এবং এক্ষুনি উদ্যোগী হওয়া উচিৎ, অনিবার্য বিপদ থেকে মুক্তি পেতে।

**ভবিষ্যৎ নগরায়নে জলের উৎস**

আগামী দিনেও শহর ও নগরগুলোতে প্রয়োজনীয় জলের এক এবং একমাত্র উৎস হল ভূপৃষ্ঠতলের মিষ্টি জলের জলাভূমি। নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাঁচতে দিতে হবে সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতি ও পরিবেশে। দূষণমুক্ত সুষম জীববৈচিত্র সম্পন্ন নদী নিজেই নদীর জল বিশুদ্ধ রাখে। খাল, বিল, পুকুর, জলাভূমি ইত্যাদি উৎসগুলোকে রক্ষা করতে হবে, জলপুষ্ট রাখতে সকলকে যত্নবান হতে হবে। মজে যাওয়া, মজে যাওয়া নদী, পুকুরের নিয়মিত সংস্কার প্রয়োজন। হ্রদ, সরোবর ইত্যাদি জলাভূমির জলভান্ডার ও জীববৈচিত্রের সংরক্ষণের সাথে সাথে ভূতাত্বিক এবং প্রকৃত আকৃতিক গঠনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয়। জলাভূমি ভরাট সম্পূর্ণ বেআইনি। বুজিয়ে দেওয়া, বেআইনি দখল নদী, পুকুর, জলাভূমি পুনরুদ্ধার করে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে। স্থানীয় মানুষজনকেই সচেতন হতে হবে। উদ্যোগী হয়ে জলাভূমি ভরাট রুখতে হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে জানাতে হবে। জলাভূমি সংক্রান্ত বহু আইন প্রণয়ন হয়েছে। আইনের সহায়তা নিতে হবে। আদালতও এবিষয়ে সদর্থক ও সক্রিয় পদক্ষেপ করে থাকে। ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বেই পরিবেশবাদী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অসংখ্য পরিবেশকর্মী, বিজ্ঞানকর্মী, সমাজকর্মী সমবেতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেন। তাঁরাও আপনাদের ডাকে এগিয়ে আসবেন, সমবেত হয়ে কাজ করার জন্য।

নদী, বিল, জলাশয় ইত্যাদির সংস্কার ও নিরাপত্তা দরকার। বেদখল হয়ে যাওয়া সম্ভাব্য ভরাট অংশ উদ্ধার করে খনন, সংস্কার ও স্থায়ী নিরাপদ করা প্রয়োজন। বিদ্যমান জলাশয়, জলভান্ডারগুলোর জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার। আগামী দিনের শহর এবং নগরের বিপুল জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় জলের জন্য বর্তমান জলের উৎসগুলো যথেষ্ট হবে না। দরকার হবে অতিরিক্ত জলাধার, জলভান্ডার। নতুন নদী ও পুকুর খনন, জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর, শহরের উপকণ্ঠে

বা দূরে সহজলভ্য সুবিধাজনক জায়গাতে উপযুক্ত আয়তনের জলাশয়, জলাধার তৈরি করতে হবে। বৃষ্টির সংগৃহীত জল, নগরবাসীর গার্হস্থ কাজে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বর্জ্য জল সংরক্ষণ করা যেতে পারে। জলের ঘাটতি পূরণের জন্য জলের পরিমাণ বজায় রাখতে পুকুর এবং বিলগুলি জলদ্বার (sluice gate) নিয়ন্ত্রিত খালের মাধ্যমে বহমান নদীর সাথে সংযোগ করতে হবে। পৌরসভা বা নিগমের প্রযুক্তিও রয়েছে। শুধু পরিকাঠামো বাড়াতে হবে।

### নগরায়নে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার সমূহ বিপদ

ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গেলে, জল সংকটের সাথে সাথে জল দূষিত, বিষাক্ত হয়ে পড়ে। ব্যবহারযোগ্য থাকে না। দূষিত, বিষাক্ত জল ব্যবহারে চর্মরোগ সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগে, মানুষ ছাড়াও জীবজন্তু, উদ্ভিদও আক্রান্ত হয়। ভূগর্ভের জলের প্রাচুর্যতা কমে গেলে শোষক যন্ত্রের শোষণে উদ্ভূত শোষণ চাপের টানে ভূস্তরের বিশেষ বিশেষ খাঁজ (Pocket) থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক ভারী ধাতব এবং অধাতব যৌগ জলের সাথে মিশে যায়। যে যৌগগুলি সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় জলে মিশে না। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গার জল আর্সেনিকে দূষিত। সহনশীল আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ পিপিএম (50 parts per million)। তার বেশি হ'লে ব্যবহারযোগ্য থাকে না। আর্সেনিক দূষণে চামড়া, দেহের ভিতরের কোষ কলা আক্রান্ত হয়। শেষ পরিণতি ক্যানসার। কোথাও ভূগর্ভস্থ জলে ফ্লুরাইড যৌগের আধিক্য থাকে। ফ্লুরাইড সংক্রমণে দাঁত ও দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যায়। হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। হাড়ের কাঠিন্য কমে যায়, ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। রিকেট রোগে আক্রান্ত হয়। রিকেটে মানুষের হাত, পায়ের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায়।

অতিদ্রুত যে হারে ভূগর্ভ থেকে জল তোলা হচ্ছে, সেই হারে সমপরিমাণ জল ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করতে পারছে না। ফলে ভূগর্ভে ক্রমশ জলের ঘাটতি বাড়ছে। পক্ষান্তরে ভূপৃষ্ঠের জল ধীরে ধীরে মাটি চুইয়ে ভূগর্ভে ঢুকে। বর্তমানে সমতা আনতে জল উত্তলনে ভূগর্ভের দীর্ঘ বিশ্রাম দরকার। বন্ধ করতে পারলে ভালো হয়। তা সম্ভব নয়। সভ্যতা থমকে যাবে।পরিবেশ দূষণ, উষ্ণায়ণ ইত্যাদি কারণে উত্তোলিত জলের একটা অংশ ভূগর্ভে ফিরে যাচ্ছে না। বাষ্পীভূত জল সব সময়েই ঊর্ধ্বাকাশে রয়ে যাচ্ছে, কখনই বৃষ্টি হয়ে ভূপৃষ্ঠে নামতে পারছে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের শরীরে জল (৬৫-৭০%) দীর্ঘ সময়ের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

### জলাভাবে নগরবাসীর মুক্তির বাণী

জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তির সহজ উপায় ভূপৃষ্ঠের জলের (Surface Water) ব্যবহার। পুকুর, নদীনালা, খালবিল, দীঘি, হ্রদ প্রভৃতি জলাভূমির জলের সুপরিকল্পিত ব্যবহার। ভূপৃষ্ঠের জল আর্সেনিক ও অন্যান্য দূষণমুক্ত। বৃষ্টির জল সম্পূর্ণ আর্সেনিক মুক্ত শুদ্ধ পাতিত জল। পানযোগ্য। কিন্তু এখন বায়ু দূষণের ফলে উষ্ণায়ণের কারণে বাতাসের নাইট্রাস অক্সাইড ($N_2O$), নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ($NO_2$), সালফার-ডাই-অক্সাইড ($SO_2$) ইত্যাদি গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জলের অম্লত্ব বাড়ছে। তবুও ব্যবহারযোগ্য।

### নগর পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার শর্ত সাপেক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে, ভূপৃষ্ঠের জলের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এটা শুধু পৌরসভার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়। পঞ্চায়েত এলাকাতেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আবাসনের নক্সা অনুমোদনের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ছাড়াও দেখতে হবে ভূপৃষ্ঠের জল ব্যবহারের পরিকাঠামো রয়েছে। মাটির নীচে জলাধার থাকবে। জলাধারের আয়তন এমন হতে হবে যেন আবাসনের সমস্ত মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

❑ নক্সা অনুমোদনে লক্ষ্যণীয় বিষয়, আবাসনে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পরিকাঠামো থাকতে হবে। আবাসনের ছাদে থাকবে করোগেটেড শীটের উল্টো ভী (V) আকৃতির ঢালু ছাদ। ছাদের সমস্ত বৃষ্টির জল পাইপের সাহায্যে নীচের জলাধারে জমা হবে, একই বা পৃথক জলাধারে। বৃষ্টির অতিরিক্ত জল বের করে দিতে হবে। পাইপের মাধ্যমে পৌরসভার জলাধারে জমা হবে।

❑ প্রত্যেক আবাসনে ছাদবাগান এবং আবাসনের চারপাশে জমিতে বৃক্ষ রোপণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। নগর সৌন্দার্যায়ণের অঙ্গও হতে পারে।

❑ শহরের ও নগরের বাসিন্দাদের ব্যবহৃত জলের পুনঃব্যবহার প্রয়োজন। ব্যবহৃত জল সংশোধনাগারে পরিশোধন করে পরিশোধিত জলের গুণমান আনুসারে পুনরায় পানের জন্য, স্নান, সেচ ও অন্যান্য কাজে বারবার ব্যবহার করা যায়। ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও তত্বাবধানের দায়িত্ব পৌরসভা এবং নিগমের।

❑ শহর/নগরে অত্যধিক জনস্ফীতির চাপ কমাতে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের জনজোয়ার নিয়ন্ত্রণ দরকার। লাভজনক উন্নত ব্যবস্থার বহুমুখী কৃষিকাজ হলে মানুষ চাষাবাদে আগ্রহী হবে। গ্রামে স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। অতি প্রয়োজনীয় দপ্তরগুলোর প্রাথমিক কাজকর্মের কেন্দ্র স্থাপন দরকার। গ্রামে থেকে ঘরের কাছে মানুষ যেন পরিসেবা পেতে পারে। গ্রামেও উন্নত পরিকাঠামো সম্পন্ন আধুনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা দিতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য আধুনিক প্রযুক্তি এবং পণ্য সামগ্রীর সহজলভ্যতা গ্রামেও প্রয়োজন রয়েছে। সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বোত্তম উন্নতি হওয়া চাই।

❑ মানুষের জন্য নগরায়ন, কিন্তু মানুষই নগরায়নের প্রতিবন্ধক। জনস্ফীতি শহর এবং নগরের আনেক সমস্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ। সুতরাং সুন্দর নগর গড়তে হ'লে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরী। এ দায় কার? উত্তর আপনার কাছে রয়েছে। শুধু মনে রাখতে হবে, অন্যকে দোষারোপ সমস্যার সমাধান নয়। সুনিয়ন্ত্রিত জনগণের জন্য সুপরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে জল সম্পন্ন স্বচ্ছ নগর গঠন সম্ভব।

### তথ্যসূত্র


1. Hindustan Times 25.04.2023
2. Jagranjosh.com 23.11.2015
3. Times of India 06.02.2023
4. Urban Water Crisis and Management
5. আবাসন-জল ও জীবন, আমাদের পদক্ষেপ(পত্রিকা), পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা-২০২৪
6. Website of Delhi Jal Board, Government of NCT of Delhi, Water Supply Department of Mumbai, Bangalore Water Supply and Sewerage Board, Kolkata Municipal corporation

রা জা রা উ ত

# জলাভূমি-প্রকৃতির কিডনি

পরিবেশ আজ বিপন্ন এ বিষয়ে সন্দেহের অবশ্য কোনো অবকাশ নেই। আনুমানিক ২৭০ কোটি বছর পেরিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার। আর তারপর বিবর্তন ও অভিব্যক্তির হাত ধরে এসেছে বিভিন্ন প্রজাতির জীবাণু, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ। শুধু তাই নয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় কৃত্রিমভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণুও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে আজকের দিনে। অথচ আমাদের ভোগবাদী মানসিকতার একমুখী পরিবর্তনও সমতালে ক্রমশ বেড়েই চলছে। আমাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলেই বিশ্ব পরিবেশে ক্রমশ উথালপাতাল অব্যাহত, চলছে ধ্বংসাত্মক সব পরিবর্তন আর তাতে আমাদের নিজেদের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশের যেসব প্রাকৃতিক ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে বা ধবংস করে দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে ‘জলাভূমি’ (Wetland) অন্যতম।

মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে জলাভূমি মানব সমেত যে কোনো জীবের জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিবেশবিদ্‌দের ভাষায় জলাভূমি হল ‘প্রকৃতির বৃক্ক বা কিডনি (Nature’s Kidney)’। কিডনি বা বৃক্ক যেমন আমাদের দেহের বিপাকজাত বর্জ্যপদার্থ পরিষ্কার করে তেমনি জলাভূমি প্রকৃতির বর্জ্য শোধনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশকে দূষণ মুক্ত হতে সাহায্য করে।

## জলাভূমি কি?

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে জলাভূমির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া হল--- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিদ্‌দের মতে যেসব অঞ্চল বছরের অন্তত কিছু সময় ২.৫ সেমি থেকে ৩০০ সেমি পর্যন্ত জল ধরে রাখে তাকেই ‘জলাভূমি’ বলা যায়।

*একটি আদর্শ জলাশয়*

এশিয়ান ওয়েট ল্যান্ড ব্যুরোর (Asian Wetland Bureau) মতে, জলাভূমি বলতে বোঝায় খাঁড়ি, ব-দ্বীপ, মিষ্ট ও লবণাক্ত জলাজায়গা, ম্যানগ্রোভ অঞ্চল, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, বাদাবন, নদীনালা, মানুষের তৈরি ধানের ক্ষেত যেখানে জল জমে, মাছের পুকুর প্রভৃতি।

১৯৭১ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত ‘রামসার’ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী— ‘জলাভূমি হল ভূপৃষ্ঠের উপরে স্বাভাবিক বা মানুষের তৈরি অগভীর জলে ডোবা এলাকা, ছোট-বড়ো মাপের পুকুর, বিল, হ্রদ এবং অন্যান্য জলাশয় যার জল লবণাক্ত, কষা বা মিষ্টি হতে পারে এবং যা ভূ-পৃষ্ঠের যে-কোনো জায়গায় হতে পারে যেমন নদীর অববাহিকায় সমুদ্রের উপকূলে পাহাড়ের ঢালে, মরুভূমির মধ্যে ইত্যাদি’।

এক সময় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জলাভূমিগুলোকে বোজানো হয়েছে কিংবা নষ্ট করা হয়েছে। চল্লিশের দশকে পরিবেশবিদদের মধ্যে প্রথম জলাভূমির গুরুত্ব বিষয়ক ধ্যান ধারণার অবতারণা। এরপর IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources নামক পরিবেশ প্রেমী সংস্থার উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে সারা বিশ্বজুড়ে জলাভূমির উপর একটি গবেষণা চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বহুদেশ জলাভূমি সংরক্ষণের উপর একটি সাধারণ নীতি তৈরি করার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার নামক শহরে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। যেখানে বিশ্বের বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা জলাভূমি সংরক্ষণ, উদ্ধার এবং তার বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার এর জন্য একটি চুক্তিতে সই করেন যাকে ‘Contracting Party’ বলা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো উক্ত দেশগুলো মেনে চলবে বলে স্থির হয়। এই বৈঠকের সূত্র ধরেই একটি রামসার ব্যুরো (Ramsar Bureau) তৈরি করা হয় সুইজারল্যান্ডের গ্লান্ড শহরে। একটি হিসেব অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে মোট ২১৬৭টি প্রাকৃতিক জলাভূমি যার মোট আয়তন ১৪,৫০, ৮৬১ বর্গ হেক্টর এবং ৬৫,৩৫৩টি মনুষ্যসৃষ্ট জলাভূমি যার মোট আয়তন ২৫,৮৯,২৬৬ বর্গ হেক্টর। অবশ্য বিশেষভাবে চিহ্নিত সারা পৃথিবীতে ‘রামসার জলাভূমি’র সংখ্যা ১১৭৯টি যা বিশ্বের অন্তত ১৩৩টি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যার মোট আয়তন ১০,২১,২৬, ৭৬০ হেক্টর। পৃথিবীর প্রথম বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ‘রামসার জলাভূমি’ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ‘কোবুর্গ পেনিনসুলা’। আবার অস্ট্রেলিয়র ক্রিস্টমাস আইল্যান্ডে অবস্থিত হস্‌নিস্ স্প্রীং পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ‘রামসার জলাভূমি’ যার আয়তন মাত্রা ০.৩৩ হেক্টর এবং বৎসোয়ানার ওকনাভাঙ্গো ডেল্টা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রামসার জলাভূমি যার আয়তন ৬, ৮৬৪,০০০ হেক্টর সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার স্বাদু জলাভূমিকে সর্ববৃহৎ জলাভূমি হিসেবে ধরা হচ্ছে।

আমাদের দেশে ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম জলাভূমি সংরক্ষণ আইন তৈরি করে। পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে এই আইন পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়। ভারতের বিভিন্ন জলাভূমি সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভারত সরকারের অধীনস্থ এই কমিটি ১৬টি জলাভূমিকে রামসার চিহ্নিত করে সংরক্ষণ কার্যক্রম নেওয়ার সুপারিশ করেছেন যার মধ্যে ওড়িশার ‘চিল্কা’, অন্ধ্রপ্রদেশের ‘কলেরু’, চণ্ডীগড়ের ‘সুখনা’, রাজস্থানের নিচোলা ফতেহসাগর, পাঞ্জাবের ‘কাঞ্জলি ও হারিক’, জম্মু ও কাশ্মীরের ‘উলার’, মনিপুরের ‘লোকটাক্’, হিমাচল প্রদেশের ‘রেনুকা’, মধ্যপ্রদেশের ‘ভোজ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গে ৫৪টি প্রাকৃতিক এবং ৯টি মনুষ্যসৃষ্ট জলাভূমিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছর ইংরাজি ১৬ই জুন বা বাংলা ১লা আষাঢ়কে জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস পালন করে আসছে। মূলত রাজ্য মৎস্য দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি ভাবে এই দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। তবে, সারা বিশ্বে ২রা ফেব্রুয়ারী

আন্তর্জাতিক জলাভূমি দিবস পালন করা হয়।

সারা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর জলাভূমি সংরক্ষণ করা দরকার। ১৯৯৫ সালে রাজ্যে বনবিভাগ পুনর্গঠনের সময় জলাভূমি সংরক্ষণ ও জৈববৈচিত্র্যে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে 'Institute of Wetland Management' প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিকভাবে রাজ্যের আটটি জলাভূমি সংস্কার করার সুপারিশ করে যার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার বর্তি বিল, হুগলী জেলার 'কাজলা দিঘি', বর্ধমান জেলার 'চুপিচর ( পূর্বস্থলী)' মুর্শিদাবাদের 'কাটিগঙ্গা ও 'মতিঝিল', দক্ষিণ দিনাজপুরের 'মালিয়ান দিঘি' ও 'আলতাদিঘি' এবং কোচবিহারের 'রসিক বিল' উল্লেখযোগ্য।

## জলাভূমির গুরুত্ব

১। **জীববৈচিত্র্য রক্ষায় :** জলা ভূমিতে এক বিশেষ ধরনের জটিল বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়। বহু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এখানে বসবাস করে। শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া ও অন্যান্য বহু অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিযায়ী পাখি এখানে আসে। খাদ্য, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। জলাভূমি নষ্ট হলে জলাভূমির উপর নির্ভরশীল এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচবে না ফলে বাস্তুরীতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে যার পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ফল আমরা ভোগ করবো।

২। **ভৌমজলের পরিমাণ বজায় রাখা :** জলাভূমির জল চুঁইয়ে মাটির নীচে ধীরে ধীরে জমতে থাকে যা ভৌমজলের ভাণ্ডার রূপে কাজ করে। আর এই ভৌমজলই আমরা গভীর ও অগভীর নলকূপ বসিয়ে ব্যবহার করি। যেভাবে আমাদের দোষেই পানীয় জলের স্তর ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে তাতে আগামী দিনে জলের তীব্র সংকট দেখা দিতে পারে। সেদিক থেকে দেখলে জলাভূমি সংরক্ষণের উপরও সঞ্চিত ভৌমজলের পরিমাণ নির্ভর করছে। জলাভূমি সংরক্ষণ করতে না পারলে ভৌমজলের পরিমাণ কমে যাবে আর তাতে জলের সরবরাহ কমে আসবে।

৩। **জলের গুণগত মান বজায় রাখা :** জলাভূমিতে যে সমস্ত জলজ উদ্ভিদ বিশেষ করে শ্যাওলা জন্মায় তারা জলাভূমির জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থকে শোষণ করে নেয়, যাদের উপস্থিতি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে জলাভূমির জলের গুণগতমান বজায় থাকে।

৪। **বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলমগ্নতারোধ :** ভারী বর্ষণের পর অতিরিক্ত জল ধারণ করে সাময়িকভাবে বন্যা রোধ করতে পারে এই জলাভূমি। এছাড়া দ্রুত জল নিষ্কাশনের মাধ্যমে রাস্তাঘাটকে জলমগ্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে জলাভূমি সাহায্য করে।

৫। **সামুদ্রিক ঝড় এবং উপকূল অঞ্চলে ক্ষয়রোধ :** সমুদ্রের নিকটবর্তী জলাভূমি ঝড় বা তুফানের তীব্রতা অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এছাড়া সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ জলাভূমিতে ভেঙে পড়ে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে জমির ভাঙ্গন রোধ করে।

৬। জলাভূমি জল সঞ্চয় করে একদিকে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে অন্যদিকে মাটির আর্দ্রতা বজায় রেখে খরাও নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। **দূষণ রোধে :** জলাভূমি দূষণ রোধে এবং পয়ঃপ্রণালীর দূষিত বর্জ্য জল পরিশোধনে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৮। **মশা নিয়ন্ত্রণে :** মশা দমনেও জলাভূমির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জলাভূমির কয়েকটি মাছ মশার লার্ভা ভক্ষণ করে। এতে মশার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৯। **অগ্নিনির্বাপন :** জলাভূমি কাছাকাছি থাকলে সহজেই দুর্ঘটনাজনিত কোনো অগ্নিকাণ্ড রোধ করা যায়। সম্প্রতি কলকাতার বড় বাজার এলাকায় জলাভূমির অভাবের জন্য ঐ এলাকাটি অগ্নিকাণ্ডে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১০। **অর্থনৈতিক উপকরণ হিসেবে :**

ক) জলের ভাণ্ডার হিসেবে স্থানীয়ভাবে জলাভূমি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খ) নানান ধরনের বাণিজ্যিক ফসলের চাষ হয় জলাভূমিতে-যেমন পাট, ধান, পানিফল প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভেষজ মূল্যবান উদ্ভিদ জন্মায় এখানে।

গ) জলাভূমিতে মাছ এবং চিংড়ির চাষ ভালো হয়।

ঘ) পলি ধরে রাখা এবং নতুন জমি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মালভূমির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ঙ) জলাভূমির জল, সেচের কাজে এবং পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চ) জলপথ পরিবহনে ও শক্তি উৎপাদনেও জলাভূমি ব্যবহার করা যায়।

সর্বোপরি খাদ্য শৃঙ্খলার ভিত্তিস্থাপনে জলচক্রের কার্যকারিতা রক্ষায়, মানব সম্পদ উন্নয়নে জলাভূমির জুড়ি মেলা ভার।

## জলাভূমিক সংরক্ষণের আমাদের ভূমিকা কি?

**বর্তমান সংকটগ্রস্ত জলাভূমি :** জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম অথচ জলাভূমি ধ্বংসের ব্যাপকতা গত কয়েক দশক জুড়ে সারা পৃথিবীতেই চলছে। নতুন নতুন নগরায়ণ, কলকারখানা, চাষবাস ও বসতির চাহিদা মেটাতে, কৃষি বর্জ্যের দূষণ, আগাছা বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য জলাভূমি ধ্বংসের মুখে। আমাদের রাজ্যের খোদ রাজধানীর উপকণ্ঠে সল্টলেক বা লবণহ্রদ নামক বিশাল জলাভূমি বুজিয়ে প্রচুর সরকারি ও বেসরকারি অফিস-কাছারি, বাড়ি, ঘর ও বিনোদন পার্ক গঠন করা হয়েছে। অথচ এই লবণহ্রদকে 'কলকাতার ফুসফুস' বলা হত। খুব সামান্য অংশই এখনও বেঁচে রয়েছে।

'জলাভূমি' নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই সাধারণ মানুষ কিংবা প্রশাসনের। এ বিষয়ে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও একটার পর একটা জলাভূমি বুজিয়ে শহর এলাকায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আবাসন তৈরি করা হচ্ছে। এই আইনে দোষী ব্যক্তির জেল ও জরিমানা দুটিরই সংস্থা রয়েছে অথচ দুঃখের বিষয় আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দেশেরই বড় বড় শহর বিশেষ করে কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর জলাভূমি বুজিয়ে বহুতল বাড়ি তৈরি করা এবং মোবাইল টাওয়ার বসানো হচ্ছে।

এই জলাভূমির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রশাসনকে আরও বেশি দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। প্রত্যেকের বাসযোগ্য, নির্মল, সুস্থির পরিবেশরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদেরকেও আরও অনেক বেশি দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। বর্তমানে ন্যূনতম ৫ কাঠা জমির ওপর তৈরি প্রাকৃতিক জলাভূমি কিংবা ন্যূনতম ১৫-২০ বছর পুরোনো কৃত্রিম জলাভূমি বোজানো যায় না। এমনকি জেলা মৎস্য দপ্তরের পরামর্শ মেনে জলাভূমি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। অদূর ভবিষ্যতে, জলাভূমির এই মাপকাঠিরও পরিমার্জন হতে পারে। এখনই জলাভূমি নিয়ে ভাবা দরকার অন্যথায় অনেক দেরি হয়ে যাবে।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :** 'জলাভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব'— একটি প্রতিবেদন, ডা. গৌতম ঘোষ, জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব (JSNC)

পা ন্না মা নি

# অবাক পৃথিবীর জল কথা

*রক্ত যদি হয় মানুষের শরীরের সংবহন কলা, জল হল সমাজের সংবহন কলা। রক্ত চলাচল করলে মানুষ সুস্থ থাকে, বেঁচে থাকে। সেরকম জলপ্রবাহ থাকলে সমাজ সুস্থ থাকবে, বেঁচে থাকবে। সমাজ থেকে জলকে যদি তুলে নেই মানব সভ্যতার অস্তিত্বই থাকবে না। দূষিত রক্ত যেমন মানুষের শরীরে রোগ বহন করে, দূষিত জল তেমন সমাজকে অসুস্থ করে তোলে। ছোটবেলার মুখস্ত করা রচনার অন্যতম লাইন 'জলের অপর নাম জীবন' এখন যেন আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে কথাটা।*

পৃথিবী কতটা অবাক বা বিস্ময়ের তা জানতে হলে পৃথিবীর জলসম্পদ বা জলকথা জানতে হবে। সমগ্র জীবজগতের একটি অপরিহার্য উপাদান হল জল। অবাক পৃথিবীর সাথে মানুষের এ ব্যাপারে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়, মানুষের দেহে শতকরা সত্তর ভাগ জল আর পৃথিবীরও প্রায় একাত্তর ভাগ জল। পৃথিবীর একাত্তর ভাগ জল! অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে জল আছে তবে প্রচুর পরিমাণে জলের বেশিরভাগটাই মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। পৃথিবীতে মোট জল প্রায় ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার, এর প্রায় ৯৭ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৩৫.৮ কোটি ঘন কিলোমিটার জল সমুদ্রের নোনা জল। এই জল আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি না। এর বেশিরভাগটাই, মোট জলের ২.৩১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৩.২৩ কোটি ঘন কিলোমিটার জল উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বরফে জমে আছে। অবশিষ্ট মোট জলের ০.৬৯ ভাগ জল অর্থাৎ মাত্র ০.৯৭ কোটি ঘন কিলোমিটার জল ভূগর্ভে, নদী-নালা, খাল-বিল, বাঁওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়গুলিতে এবং বায়ুতে জলীয় বাস্প হিসেবেই বিরাজমান এবং এই জলই আমরা সরাসরি ব্যবহার করি।

আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে সুন্দর সুন্দর হ্রদ, যেমন কাশ্মীরের গ্রেট লেকস অফ কাশ্মীর, অনেক পর্যটকই কাশ্মীরের হ্রদগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য গ্রেট অফ কাশ্মীরে ট্রেক করে থাকেন। এরকম সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় হ্রদ। হ্রদের ছোট সংস্করণ, প্রয়োজন অনুযায়ী সারা বছর নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য জল ধরে রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হল পুকুরের মাধ্যমে। আমরা যদি শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই ভাবি, পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম অধ্যুষিত জেলাগুলি যেমন মেদিনীপুর বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ইত্যাদি জেলায় কোথাও কোথাও পরিবার পিছু বা কোথাও কোথাও প্রতিটি পাড়ায় নিজস্ব পুকুর থাকার নিদর্শন দেখা গেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বেশ কয়েকটি ব্লকে প্রতি পরিবারের নিজস্ব পুকুর থাকার একটি চল দেখা যায়। তবে শুধু পুকুরই নয় অনেক সময় দেখা গেছে বড় আকারের দীঘি বা ঝিল—মাছ চাষের প্রয়োজনে এবং সব সময় জল পাওয়ার কারণে খনন করতে দেখা গেছে (যদিও বর্তমানে ব্যাপারটা কমতে শুরু করেছে অবশ্য তার প্রধান কারণ বাসস্থান)।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি ব্লকের কথা বলছি, সেখানে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চাষবাস গবাদি পশুপালন গৃহস্থালির সমস্ত কাজকর্মই হত ভূপৃষ্ঠস্থ জলাধারগুলির জল থেকে (পুকুর, খাল, বিল)। তখন অবধি পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল সরকারি টিউবওয়েল। সরকারি টিউবয়েলগুলি বরাদ্দ ছিল কোন কোন জায়গা দেড় থেকে দু কিলোমিটার বা তারও বেশি ব্যাসার্ধের জনবসতির জন্য একটি করে। বাড়ির মহিলারা কলসিতে করে খাওয়ার জল দেড়-দু কিলোমিটার বা আরো বেশি পথ হেঁটে নিয়ে আসতেন, শুধু খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত এই জল। অন্য সমস্ত কাজ এবং রান্নাও হত পুকুরের জলে। সমীক্ষায় দেখা গেছে আরো আগে (৯০ দশকের আগে) তারা পুকুরের জল পানও করত এবং সমস্ত খাল বিল পুকুর স্বাস্থ্যকর জলে পরিপূর্ণ থাকত। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সালের পর থেকে চিত্রটা পাল্টেছে। খাল, বিল, পুকুরের জল বিভিন্ন রাসায়নিক এবং কীটনাশকের প্রয়োগের ফলে দূষিত হয়ে চলেছে, যা পানের অযোগ্য হয়েছে এবং সরকারি টিউবয়েলের সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সম্প্রতি ওইসব খাল বিল পুকুরে জলের পরিমাণ ভয়ানক ভাবে কমে এসেছে। সরকারি টিউবওয়েলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাল, বিল, পুকুরের নাব্যতা ধরে রাখতে পারেনি, সময় মত উপযুক্ত সংস্কার হয়নি এবং ধীরে ধীরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে মাটির তলার জলের উপরে।

একজন বড় ব্যবসায়ীর ছেলের একটি সৌজন্যমূল সাক্ষাৎকারে তার ছোটবেলার ব্যবসায়ী বুদ্ধির নমুনা শুনলাম। তার ব্যবসায়ী বুদ্ধিটি এরকম : দু-টাকার বেলুন কিনো, ওতে হাওয়া ভরো, হাওয়া তো ফ্রি। এবার ওটাকে ১০ টাকায় বিক্রি কর। এই বুদ্ধিটা কিন্তু নতুন নয়। আমরা বাড়ির বাইরে বেরোলেই জলের তেষ্টা মেটাই প্যাকেটজাত তথাকথিত মিনারেল ওয়াটারের বোতল দিয়ে। আগে আমরা দূরে কোথাও ঘুরতে গেলে তখন হয়তো এ ধরনের জলের বোতল নেওয়ার প্রচলন ছিল। যেটা এখন বাড়ির বাইরে বেরোলেই প্রয়োজনের তালিকার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এই বোতলবন্দি তথাকথিত মিনারেল ওয়াটার গুলো কি আদৌ স্বাস্থ্যসম্মত? কখনোই নয়। তা সে কোন স্থানীয় কোম্পানিরই হোক বা কোন বহুজাতিক কোম্পানিরই হোক। এই সমস্ত জল বিক্রির ব্যবসায়ীরা ওই একই বুদ্ধিতে কাজ করছে। জল তো ফ্রি। আমরা নিয়ে ভরে বিক্রি করি। এইভাবে এইসব জল কোম্পানিগুলি এবং নরম পানীয়র কোম্পানিগুলি যথেচ্ছ ভাবে মাটির তলার জল তুলে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রকৃতির ভয়াবহ ক্ষতি করে চলেছে। তার পাশাপাশি যথাযথ গুণগত মান বজায় না রেখেই বাজারজাত করে চলেছে তাদের তথাকথিত মিনারেল ওয়াটারের বোতল ও গরমে ঠান্ডা (?) রাখার নরম পানীয়।

**জলের দূষণ কথা :** জল বিভিন্নভাবে দূষিত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে কয়েকটি দূষণে সরাসরি আমাদের দোষ থাকে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে আমরা দায়ী। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিকেও বিভিন্ন সময়ে আমরা দূষিত করে তুলেছি, যেমন ১৯৯১ সালে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে প্রায় ২০০ লক্ষ টন তেল সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে ডিসেম্বর মাসে স্পেনের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে তৈলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনায় প্রচুর তেল সমুদ্রে মিশে যায়। ১৯৯৩ সালে ডিসেম্বর মাসে স্পেন-এর উত্তর-পশ্চিম উপকূলে তৈল বাহী জাহাজ দুর্ঘটনায় প্রচুর তেল সমুদ্রে মিশে যায়। ১৯৯৩ সালে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এর কাছে বঙ্গোপসাগরে ডেনমার্কের একটি বড় জাহাজ অন্য একটি খালি জাহাজের সাথে ধাক্কা মারলে আগুন ধরে যায় এবং সেই কারণে জাহাজের সমস্ত তেল সমুদ্রে ফেলতে হয়।

সমুদ্রে এইরকম দূষণ ঘটেছে বেশ কয়েকবার এইভাবে সমুদ্রের জল দূষিত হলে সমুদ্রের ওই অঞ্চলের সামুদ্রিক প্রাণী ও সামুদ্রিক মাছের জীবন বিপন্ন হয়।

আমাদের মিষ্টি জলের ভান্ডারও দূষিত হয়ে চলেছে। দূষিত করে তুলেছি আমরা প্রতিনিয়ত, বারবার। পানীয় জল আমরা পেয়ে থাকি সাধারণত ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডার থেকে। আমরা দেখব ভূপৃষ্ঠস্থ জল কি ভাবে দূষিত হচ্ছে।

জলদূষণ

**কয়েকটি সাধারণ দূষণ :** কৃষিক্ষেত্রে সার ও কীটনাশক জলাশয়ে মিশে জল দূষিত করে তোলে যেমন গঙ্গা নদীতে প্রতিদিন গ্রামের জমিগুলি থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ্য টন রাসায়নিকের সার ও সাত হাজার টন কীটনাশক এসে মেশে। এইভাবে শুধুমাত্র গঙ্গায় নয় অন্যান্য নদী নালা, খাল, বিল ইত্যাদি জলাশয়গুলির জল কীটনাশক ও রাসায়নিক সার দ্বারাও দূষিত হয়।

বিভিন্ন শহরের পৌর আবর্জনা নদী ও অন্যান্য জলাশয়গুলোতে মিশিয়ে দেওয়ার ফলে জল অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ছে। যেমন শুধুমাত্র গঙ্গানদীতে প্রতিদিন বিভিন্ন শহরের পৌর আবর্জনা প্রায় ১৩ কোটি লিটার বর্জ্য গঙ্গার জলকে দূষিত করে। নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের জল হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক গুণমান।

বিভিন্ন কল কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নোংরা জল ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ মিশিয়ে দেয় জলাশয়গুলোতে। শুধু গঙ্গা নদীতে প্রতিদিন বিভিন্ন কলকারখানা থেকে প্রায় ২৬ কোটি লিটার নোংরা জল নির্গত হয়ে মেশে।

এগুলি জলের সাধারণ দূষণ, এই দূষণগুলি আমাদের ইচ্ছাতেই ভূপৃষ্ঠের জলে ঘটে থাকে, আমরা সতর্ক থাকলেই এই দূষণগুলিকে জলে মিশতে নাও দিতে পারি। পরিশ্রুতকরণের মাধ্যমে নিষ্কাশন করতে পারি।

ক্ষীণ আশার আলোয় জোগাতে হবে ইন্ধন। কিন্তু প্রতিকারের কোন সঠিক ব্যবস্থাই নেই। শুধুমাত্র গভীর নলকূপ বসানোর কাজ চলছে যা এই সমস্যার সমাধান দেখাতে অক্ষম। তাই নিতে হবে সুদুরপ্রসারী পদক্ষেপ। যেমন—বর্ষাকালে বৃষ্টির সম্পূর্ণ জলটাই ধরে রাখতে হবে, জল শোধনাগারে শোধন করে সরবরাহ করতে হবে। উদ্বৃত্ত জল চাষ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। মাটির নিচের অর্থাৎ ভূগর্ভের জল তোলা বন্ধ করতে হবে। যত্রতত্র গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানো বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে। নদী ও অন্যান্য সকল জলাশয়গুলোর গভীরতা বাড়াতে হবে, মজা নদী পুনরুদ্ধার করতে হবে। নদী ও অন্যান্য সকল জলাশয়ের গভীরতা বাড়াতে পারলে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়বে, এই জল পরিশোধন করে পানের যোগ্য করে তোলা যাবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যাবে। ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণগত ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রশাসনিক ও উপযুক্ত কারিগরি পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে ভূগর্ভস্থ জলের স্বাস্থ্য ফিরে আসে। জীবকুলের টিকে থাকার স্বার্থে, সুস্থ থাকার জন্য, জলের সকল সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের সকলকে এই পদক্ষেপগুলি কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি অঞ্চলে যত ছোট বড় জলাশয় আছে, সব রকম জলাশয়ের (পুকুর, খাল, বিল, নালা, বাঁওড় ইত্যাদি) জল ধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে হবে। জলাশয়ের বহুমুখী উপযোগিতার কথা মাথায় রেখে জলাশয় সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে বিভিন্ন অজুহাতে এবং মেকি উন্নয়নের দোহাই দিয়ে জলাশয় বুজিয়ে শহর উন্নয়ন চলছে এবং ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ, তৈরি হচ্ছে জল সংকট। জলসম্পদ তথা পরিবেশ বাঁচানোর জন্য, পরিবেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য বাঁচাতে হবে জলাশয়গুলি, তবে বাঁচবে জনসম্পদ। বন্ধ করব আমাদের তৈরি জলদূষণ, বাঁচব আমরা, বাঁচবে জীবজগৎ, বাঁচবে আমাদের অবাক পৃথিবীর জলসম্পদ।

## মেঘ, বৃষ্টি ও জলচক্র

নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি পৃথিবীর নানা জলভাণ্ডার থেকে জল অনবরত বাষ্প হয়ে ওপরে উঠছে। ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের চাপও কমতে থাকে। চাপ কমলে বাতাসের অণুগুলো একটু বেশি জায়গা নিয়ে ঘোরাঘুরি করার সুযোগ পায়। তার মানে, বাতাস আয়তনে বাড়ে ও ঠাণ্ডা হতে থাকে। এভাবে উপরে উঠতে উঠতে বাতাস আরো ঠাণ্ডার এক সময় সম্পৃক্ত হয়ে যায়—আর জলীয় বাষ্পকে জায়গা দিতে পারে না। ওপরের আরো ঠাণ্ডাতে জলীয় বাষ্প ভাসমান ধূলিকণা ও অন্যান্য কণার ওপর জলকণা হিসেবে জমে মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘের জলকণাগুলি পরস্পর জোট বেঁধে বড় হয়। তারা ভারী হয়ে পৃথিবীর টানে মাটিতে টপটপ করে পড়ে। আমরা সেটাকেই বলি বৃষ্টি।
পৃথিবীর টানে মেঘের ভারী জলকণা মাটিতে নেমে আসে ঠিকই। কিন্তু তা যে মাটিতে পড়বেই তার কোনো মানে নেই। বৃষ্টি নামলেও নদী-সমুদ্র প্রভৃতি থেকে জলীয় বাষ্প যেমন ওঠার উঠে চলেছে। অবশ্য কম বেশি হতে পারে। কিন্তু ঐ জলীয় বাষ্প যদি বৃষ্টির চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি ওঠে তাহলে বৃষ্টি শেষ পর্যন্ত মাটিতে এসে নাও পৌঁছোতে পারে। তাছাড়া, নিচের বায়ুস্তরের উষ্ণতা যদি এমন হয় যে বৃষ্টিকণা নামার সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্প হয়ে গেল তাহলে তো টপটপ করে বৃষ্টি পড়ার কোনো প্রশ্নই থাকবে না। যাই হোক এই দুটো বাধা যদি না থাকে তাহলে পৃথিবীতে বৃষ্টি হবে। মাটিতে পড়ার পর তার অনেকটাই মাটির নিচে চলে যায়। এবং বাকিটা নদ-নদী, হ্রদ, সমুদ্রে পড়ে, ছোটখাটো খাল-ডোবা-পুকুর তো আছেই। তাছাড়া বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে তা পাহাড়ে বরফ হয়ে গললে সেই জলও ঐভাবে নানা জায়গায় গিয়ে পড়ে। এই জল আবার সূর্যকিরণে বাষ্প হয়ে মেঘ-বৃষ্টির ধাপ পেরিয়ে নদ-নদী, সমুদ্রে গিয়ে মেশে। এই জলচক্র যুগ-যুগ ধরে আমাদের জলের যোগান দিয়ে চলেছে। সেই জল যদি আমরা বেহিসেবীর মতো অপচয় করে চলি তাহলে জলসংকটে মানুষের জীবনেই সংকট আসবে।

*—যুগল কান্তি রায়*

সূর্যেন্দু দে

# খাল বিল জলাশয় : গুরুত্ব ও সংরক্ষণ

*১৯৭১ সালে ইরানের রামসার শহরে অনুষ্ঠিত 'জলাভূমির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব' নির্ধারণে যে অনুষ্ঠানটি হয় সেই থেকেই সাধারণ মানুষ জলাভূমির গুরুত্ব অনুধাবন করতে শিখেছে। আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জলাভূমি কথাটি বৃহদর্থে বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছেন। সম্মেলনে জলাভূমির সংজ্ঞা দেওয়া হয় Wetland are areas of marsh, fen, peatland or water whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh brackish or salt, including areas or marine water, the depth of which at low tide does not exceed six metres and may include riparian and coastal zones adjacent to the wetland or island or bodies of marine water deeper than six metres or low tide lying within wetland সংজ্ঞাটির বাংলা করলে যেমন হতে পারে : জলাভূমি হল বিভিন্ন প্রকৃতির যেমন মার্স, ফেন, পিটল্যান্ড বা জলা যা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে, হতে পারে স্থায়ী বা অস্থায়ী, যা স্রোতযুক্ত বা স্রোতহীন হতে পারে। হতে পারে মিষ্ট বা সামান্য লবণাক্ত, যার মধ্যে সামুদ্রিক জল অন্তর্ভুক্ত, যার ভাটার সময় ৬ মিটার জলের উচ্চতা থাকবে, যা নদীর তীরস্থ বা সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন এলাকা অথবা দ্বীপ বা সমুদ্র জলের জলাধার যার ভাটার সময় গভীরতা ৬ মিটারের বেশি। সেগুলি জলাভূমির অন্তর্গত।*

১

কত বিচিত্র পদ্ধতিতেই না খাল বিল জলাভূমির সৃষ্টি হয়। এরাজ্যে অনেকগুলি নদনদী আছে। কিছু নদী বরফজলে পুষ্ট, কিছু আবার মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই সব নদনদী সারা রাজ্যে জালক আকারে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে। এই নদীগুলি বয়ে চলতে চলতে এক পাড় ভাঙে অন্য পাড় গড়ে। নদী বইতে বইতে বারবার খাত বদলায়। বইতে শুরু করে নতুন খাতে। পরিত্যাগ করে আসে পুরাতন খাতগুলি। এই পরিত্যক্ত নদীর খাতগুলি থেকেই জন্ম হয় নতুন বিলের।

*একটি আদর্শ বিল*

ফরাক্কায় ব্যারেজ নির্মাণের ফলে মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেকগুলি বিলের সৃষ্টি হয়। কিছু বিল নব কলেবর ধারণ করে। ফিডার ক্যানেল তৈরি হওয়ার পরই আহিরণ বিলের আবার আয়তন বেড়ে যায়। একই ভাবে তৈরি হয়েছে বংশবাটি বিল, ভেলকর বিল। ফরাক্কায় ব্যারেজ হওয়ার আগে কাটিগঙ্গার ভাদ্রমাসে নিয়ম করে জল ঢোকাতে গেট খোলা হত, কাটিগঙ্গা তখন সজীব থাকত। ফরাক্কায় ব্যারেজ হওয়ায় সেই গেট আর খোলা হয় না। কাটিগঙ্গা এখন আবদ্ধ জলাভূমি। বালাগাছি দামোশ বিল ফরাক্কা ব্যারেজের আগে একটি দীর্ঘ নালা ছিল। ব্যারেজ হওয়ার পর দামোশটি ৫০০ একর এলাকায় বর্ধিত হয়েছে।

ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে উৎপন্ন দ্বারকা-ব্রহ্মাণীর মিলিতধারা, এছাড়া ময়ূরাক্ষী, কুয়ে নদীগুলি শেষ পর্যন্ত হিজলে এসে পড়ে গতি হারায়। এখানকার ভূপ্রকৃতি সমতল হওয়ার দরুন এই মিলিত নদীগুলির জল হিজলে স্থিতিশীল হয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে হিজল বিল।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক নদীপাড় মাটি দিয়ে বাঁধা দেওয়ায় অনেক নদী মজে গেছে। এসকল নদী প্লাবনভূমি থেকে উঁচুতে উঠে যাওয়ায় সারা রাজ্যে অনেক জলাভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

২

গত শতাব্দীর ৭-এর দশকের মৎস্য দপ্তরের এক অধিকর্তার পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এরাজ্যের দু লক্ষ একর বা ৮১ হাজার হেক্টর বিল বাওড় ছিল। পরে ২০০০ সালের ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় ফিশারির সমীক্ষায় এ রাজ্যে খাল বিল ৪২ হাজার হেক্টর জুড়ে আছে। এটি আন্তর্জাতিক ফিশারির ২২ শতাংশ। এই বিলগুলি জলের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উৎস ফিশারিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে। প্রায় ঐ একই সময়ে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের রিপোর্টে জানা যায় এই জলাভূমির এলাকা ৪১,৭৮১.৬৫ হেক্টর। যার ৫১.২১ শতাংশে মাছ উৎপন্ন হচ্ছিল। হিসাবমত মাত্র ৬০ বছরে রাজ্যের বিলগুলির এলাকা অর্ধেক হয়েছে। এই পরিসংখ্যান অনুসারে আজকের দিনে বিলগুলির অবক্ষয় সহজেই অনুমেয়।

কলকাতা শহরের পরিসংখ্যানও বেশ করুণ। কলকাতা যতই পূর্বদিকে বেড়েছে ততই গ্রাস করেছে জলাভূমি। গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে পূর্ব কলকাতার ১৫০০ হেক্টর জলাভূমি হারিয়ে গেছে। পরে রাজারহাট উপনগরীর জন্য অনেক জলাভূমি চাপা পড়ে। যতই নগরায়ণ বেড়েছে ততই জলাভূমি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছিল তা বেড়েই চলেছে। নিউটাউন রাজারহাট ছাড়াও ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটন বাইপাস তৈরিতে।

অন্য এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির আয়তন ২০ হাজার হেক্টর যা কমতে কমতে ১৯৮১ সালে ১২,৫০০ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে।

**২০০০ সালের ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় সংস্থার সমীক্ষায় এরাজ্যে বিল চিত্র**

| রাজ্য | বন্টন | নদী অববাহিকা | স্থানীয় নাম | পরিধি (হেক্টর) |
|---|---|---|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | ২৪ পরগণা, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, কোচবিহার, বর্ধমান, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, মেদিনীপুর | হুগলি, ইছামতি, ভাগীরথী, চূর্ণী, বাঁকর, কালিন্দী, পাগলা, জলঙ্গি, বেহুলা, তোর্সা, এবং মহানন্দা | বিল, চরজা এবং বাওড় | ৪২ হাজার ৫০০ |

এই একই সংস্থার সমীক্ষা থেকে জানা যায় এরাজ্য বড় বিড় বিলের সংখ্যা ১৫০, যার অর্ধেক ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার এবং নদীয়া জেলায় অবস্থিত। তবে নদীয়া আর মুর্শিদাবাদ জেলায় এই বিলের সংখ্যা সর্বাধিক। অতিসম্প্রতি কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক বাংলা তথা সমগ্র দেশে যে জলচিত্র তুলে ধরেছে তাতে বলা আছে দেশে এই মুহূর্তে জলাশয় সংখ্যা ২৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৪০টি। যার এক-তৃতীয়াংশ বাংলাতেই অবস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জলাশয়ের সংখ্যা—

| রাজ্য | জলাশয় সংখ্যা |
|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৮০টি |
| উত্তরপ্রদেশ | ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৭টি |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৭৭টি |
| ওড়িশা | ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৬৭টি |
| অসম | ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৯৬টি |

**Statewise Distribution of Waterbodies**
**State–West Bengal**

| No. of Districts | Ponds | Tanks | Lakes | Reservoirs | Water Conservation Schemes/Percolation Tanks/Check dams | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 457274 | 7585 | 1349 | 280585 | 610 | 77 | 747480 |

Source : Water Bodies First Census Report, Vol. I Govt. of India

বাংলার মোট জলাশয়ের ৯৬% এর বেশি গ্রামীন এলাকায়। পঞ্চায়েত এলাকায় জলাশয় ৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৫৪টি। পুর এলাকায় জলাভূমি কম, ২৭ হাজার ৮২৬টি।

৩

আপাতদৃষ্টিতে এরাজ্যের জলচিত্র সন্তোষজনক দেখালেও বেশিরভাগ পুকুর-পুষ্করিণী, খাল-বিল, জলাভূমি আজ মজে গেছে। অনেকাংশ চলে গেছে দখলদারদের কবলে। এখন বিলগুলির এক বড় পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘদিন অবহেলা উপেক্ষার ফলে এবং সংস্কারের অভাবে বিলগুলির উৎস মুখগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ষার নতুন জল সংযোগকারী নালা দিয়ে এখন আর বিলে ঢোকে না। বিলগুলির পাড় ভেসে পলি ভরাট হয়ে গেছে। বিলগুলি এখন দূষণ জর্জরিত। মাছ চাষ প্রায় বন্ধ।

ইতিমধ্যে বাংলায় হাজির হয়েছে সবুজ বিপ্লব। অতিরিক্ত ভৌমজল তোলার ফলে সৃষ্ট হয়েছে জল সংকট। মাটির উপরের জলটুকু হয়ে উঠল কৃষিবিষে জর্জরিত। ধ্বংস হতে লাগল খালবিলের দেশি মাছগুলো। ধ্বংস হয়ে গেল বিলের বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য। বিলগুলি হয়ে উঠল সবদিক থেকে বন্ধ্যা।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত বিলগুলির সমস্যা এখন বহুমুখী। সরকারি উদ্যোগে দুদশক আগেই বিলগুলির পাড় পাট্টা দেওয়া শুরু হয়েছে। ফলে সরকারি বিলগুলি কার্যত ব্যক্তি মালিকানার দিকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বড় সমস্যা হল বিলগুলি জবরদখল। বিল দখল করে ঘরবাড়ি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, অনেকে ব্যক্তিগত ফিশারি বানিয়ে চলছে মাছ চাষ। কোন কোন বিলে দখলদারের দাপটে পাট পচাতে গেলেও পয়সা লাগে। এ বিষয়ে প্রশাসন খুবই উদাসীন।

বিল থেকে মাটি তুলে নেওয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জলকরের দাম গত কয়েক বছরে বেড়েছে বেশ কয়েক গুণ। অন্যদিকে কমে যাচ্ছে বিলগুলির জলার এলাকা। বাস্তবে প্রতিটি বিলেরই জলার পরিমাণ ভীষণভাবে কমে গেছে। সরকারি খাতায় জলার যে পরিমাণ লিপিবদ্ধ আছে, সরকার সেই অনুসারে ডাকের দাম নির্ধারণ করে। এই কারণেই গত কয়েক বছর অনেক বিলের ডাকই হয়নি। প্রায় সব বিলেই গন্ডগোল লেগেই আছে। মাছ চাষও বন্ধ আছে। অনেকগুলি বিলে মামলা চলছে যা এখনও অমীমাংসিত। বিলে পাট পচানোকে কেন্দ্র করে মাছ চাষি আর পাট চাষির মধ্যে মাঝেমধ্যেই সংঘর্ষ লেগে যায়। মৎস্যজীবী কৃষিজীবী সংকট লাগে। বিলগুলি নানান কারণে আজ দূষণ জর্জরিত।

একদিকে নগরায়ণে যেমন বিলের আয়তন কমেছে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে নতুন নতুন সড়কপথ, রেলপথ বিলের উপর দিয়েই তৈরি হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের তেলকর বিলের উপর চার লেনের রাস্তা তৈরি হয়েছে। এতে কমে গেছে বিলের এলাকা, ব্যাহত হচ্ছে মাছচাষ, ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র।

বিলগুলিতে মাছ উৎপাদনে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই সমবায় সমিতিগুলি নির্দয় হয়ে পড়েছে। এই বিলগুলি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বর্তমান মাছ জল সংকটের দিকে বিলগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী।

৪

পুরানো ছেড়ে আসা খাতকে নদী সহজে ভোলে না। একটা সংযোগ অন্তত থেকেই যায়। যেখান দিয়ে সারা বছর না হোক বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠা নদীর জল বিলে ঢোকে। নদীর অতিরিক্ত জল বিলে ঢুকলে জলের সমতা বজায় থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া পাট পচানো, পাড় ভাঙার ফলে যে পলি জমে নদীর নতুন জলে সেই পলি সহ দূষিত জল দূরীভূত হত। জল নির্মল থাকত।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আসা নদীর জলের সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছেদের ডিম, ডিমপোনা, চারাপোনা এমনকি বড় বড় মাছ বিলের জলে ঢুকে পড়ত। মাছের প্রাকৃতিক খাবার ফাইটোপ্ল্যাংটন ও জুপ্ল্যাংটনে পরিপূর্ণ ছিল বিলগুলি। এই প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে ডিমপোনা, ছোট মাছ বড় হত। বিলগুলি ছিল দেশি মাছেদের আঁতুড়ঘর।

বিলের চারপাশে জমিগুলি বর্ষার প্লাবনে পলি জমে ভীষণ উর্বর হয়ে উঠত। গ্রীষ্মে বিলের জলেই চারপাশের জমিগুলিতে বোরো ধানের চাষ হত। রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের তেমন প্রচলন ছিল না। এখন উচ্চফলনশীল ধানচাষও শুরু হয়নি। এইভাবে বিলগুলি জলে মাছ আর ডাঙায় বোরোধান অকৃপণ ভাবে উপহার দিত। তখন ছিল না কোন বিল ভরাট। বিল দূষণ বা বিল দখল। আবার শীতের শুরুতেই দেশ-দেশান্তর থেকে পরিযায়ী পাখিরা এই বিলগুলি আলো করে রাখত। তখন বিলে জলের অভাব ছিল না। কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার ছিল না। তাই বিলে পাখিদের খাদ্যের অভাব ছিল না। ছিল না চোরাশিকারিদের অত্যাচার। তখন পাখিরা শীতের শুরুতে এখানে এযস ডিম পেড়ে বাচ্চা পালন করে তাঁদের জীবনচক্রের একটা বড় অংশ বিলগুলিতে কাটিয়ে যেত।

বিলগুলির সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রথমেই বিলের অংশগুলি পাট্টা দেওয়া বন্ধ করা প্রয়োজন। বিলগুলির ডাকের টাকা বেড়ে যাওয়ায় অনেক বিলের ডাক বন্ধ আছে। এমতাবস্থায় ডাকের টাকা পুনর্মূল্যায়ন

হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন বিল পতিত হয়ে পড়ে না থাকে। শহরে অবস্থিত বিলগুলিতে শহরের নালার যে দূষিত জল পড়ে সেই জল শোধন করে বিলে ফেলা প্রয়োজন। যেসব রাস্তাঘাট, রেলপথ নতুন ভাবে নির্মিত হচ্ছে সেগুলি যাতে জলাশয়, খালবিলের উপর দিয়ে তৈরি না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। প্রতিটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সক্রিয়তা ফিরিয়ে এনে বিলগুলিতে মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

ফিশারি ডিরেক্টর সাহা বলেছেন, to remedy the siltation it has been suggested that bill area should be reclaimed by the Government direct and then leaned out to the fishermen's co-operative on economic sent for fish cultivation.

নানান সমস্যায় জর্জরিত বিলগুলি সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী। ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে বা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ আইন দ্বারা অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃত প্রকল্প দ্বারা এই সংস্কার করে পাড়গুলি বাঁধতে হবে। এর উদ্বৃত্ত মাটি ইটভাটা ইত্যাদিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এত সংখ্যক জলাভূমি সমৃদ্ধ রাজ্যে বিলগুলি সংস্কার হলে ডাঙায় ধান আর জলে মাছ চাষ করা হবে। এই মাছ আর ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করা গেলেও লক্ষ্য রাখতে হবে মাছ ও ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি বজায় রেখেও যতদূর সম্ভব পরিবেশ কম দূষিত হয়।

বিলগুলিতে মাছ উৎপাদনে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রতিটি বিল সংস্কার করার পর স্থানীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে স্বাভাবিক ডাকের টাকায় লিজ দিতে হবে। স্থানীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সকল সদস্যদের নিয়ে সর্বোচ্চ মাছ উৎপাদনের চেষ্টা করবে।

বিলগুলি নিয়ে এখন বহুমুখী গঠনমূলক চিন্তাভাবনার সময় এসেছে। মুর্শিদাবাদের 'আহিরণ' বিলকে কেন্দ্র করে একটি পাখিরালয় গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। এর ফলে সেখানে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠবে। এতে স্থানীয়এলাকার অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এছাড়া বাংলার অনেক বিলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে ইকো ট্যুরিজম। এর ফলে সেই এলাকার অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটবে। অনেক বিলেই ট্যুরিজম স্পট গড়ে তোলার মত যথেষ্ট সহায়ক মূল্য আছে।

তীব্র জল সংকটের দিনে বিলগুলি সংস্কার করলে তাতে প্রচুর জল থাকবে। এই জল চাষ ইত্যাদিতে কাজে লাগবে। ভৌমজলের ব্যবহার কমবে এছাড়া বিলগুলির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির নিচের জলভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে। বর্ষার অতিরিক্ত জল বিলগুলি বুকে ধারণ করলে বন্যার প্রকোপ কমে। জলাভূমি তো পরিবেশের কিডনি। বিলগুলি পরিবেশ ঠান্ডা ও মনোরম রাখে। বিলগুলির নির্মল পরিবেশে পরিযায়ী পাখিরা আবার ফিরে আসবে।

### গঙ্গাজল : দূষণ চিত্র

**বিশ্বাস :** নদী হিসেবে গঙ্গার জল সব সময়ই বিশুদ্ধ। এ নদীর জলে কোনো ময়লা জমতে পারে না। এ নদীতে স্নান করলে বা এর জল পান করলে পুণ্য হয়, মোক্ষলাভ হয়।

**বিজ্ঞান :** গঙ্গা নদী হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নদী। ভারতের নদীগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম—1,560 মাইল। পাঁচ কোটির বেশি মানুষের বাস এ নদীর দুপাড় জুড়ে। অত্যন্ত উর্বর এই নদীঅববাহিকার সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন।

এ মুহূর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ নদীর জল ধর্মভীরু মানুষের কাছে যতই পবিত্রতার প্রতীক হোক, বিশ্বাস যতই গভীর হোক, নদীর পাশের শহর গ্রাম ধোঁয়া, আবর্জনা, নদীর দুপাশের কলকারখানার দূষিত জলে ভায়ংকর রকম আক্রান্ত এই নদী।

1550 মাইল দৈর্ঘ্যের নদীটির দুপাশে রয়েছে 29টি বড় শহর, 70টি মাঝারি শহর এবং কয়েক হাজার গ্রাম। প্রতিদিন 13 কোটি লিটার নোংরা জল পৌর আবর্জনা নিয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। আরো প্রায় 26 কোটি লিটার নোংরা জল কারখানা থেকে নির্গত হয়ে প্রতিদিন গঙ্গায় এসে মেশে। 60 লক্ষ টন রাসায়নিক সার এবং 9 হাজার টন কীটনাশক জলবাহিত হয়ে প্রতিদিন গ্রামের ক্ষেত থেকে এসে গঙ্গার জলে মেশে।

গঙ্গা নদী বিষপানে আজ নীলকণ্ঠ। পৌর আবর্জনার সঙ্গে কলকারখানার দূষিত জলে গঙ্গার বিষ আজ সীমা ছাড়িয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে চাষের জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে। গঙ্গার আশেপাশের হাজার হাজার গ্রামের চাষজমি ধুয়ে এই সমস্ত কীটনাশক ও সার এসে পড়ছে এই নদীতে।

মনে রাখা দরকার, এই দূষিত জলপান করা তাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। গঙ্গার বিষপানে যে মাছের উৎপাদন কমেছে তা আমরা অভিজ্ঞতাতেই বুঝি। একইভাবে ডায়ারিয়া, আমাশয়. অন্ত্রঘটিত আরো নানা রোগ যে বাড়ছে তাও আমরা টের পাচ্ছি হাড়ে হাড়ে।

গঙ্গার জলে জৈব আবর্জনার জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমেছে। জলে ভাসমান ময়লার পরিমাণও যথেষ্ট বেশি। এর ফলে জলে যে সব প্রাণীরা থাকে তাদের প্রাণধারণ অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। একইভাবে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ, কারখানার বর্জ্য, কীটনাশক, সার ও অন্যান্য পানীয় হিসাবে তা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে এবং এ ব্যাপারে এখনই সাবধান হওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের জোর এ বিপর্যয় ঠেকাতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ভারতের অন্যতম প্রধান নদী যা উত্তর ভারতের মানুষের কাছে অত্যন্ত পবিত্র নদী হিসাবে স্বীকৃত, সেই যমুনা নদীর জল একইরকম ভাবে দূষিত এবং এর ব্যবহারও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। *—জয়দেব দে*

### সহায়ক গ্রন্থ


১। Surjendu Dey, Fishermen of the Coastal Districts of Bengal : A Study in Socio-Cultural Transformation.

২। Bulletin No. 103 of CICFRI, Ecology and Fisheries of Beels in West Bengal.

৩। প্রণব সরকার সম্পাদিত লোক বাংলার দিঘি জলাশয়, ২০০৩।

**ছাত্র-ছাত্রীদের কলম**

ঋ তু শ্রী চ ক্র ব র্তী

# জল ও জলাভূমির সংরক্ষণ

হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপিঠ, নবম শ্রেণি

*ভারত তথা পৃথিবীর সকল সভ্যতার উন্নতিবিধানের প্রাচুর্যের জননী হল জল। সভ্যতার কল্লোলিত প্রাণধারা তাকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছে পৃথিবীব্যাপী এক বিশাল ও সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক জীবন। তাইতো জল হল জীবন। কিন্তু যা একদা ছিল প্রাণপ্রদায়ী, সেই পবিত্র জলধারা আজ মানুষের মূঢ়তা ও অপরিণামদর্শিতার পরিণামে হয়ে উঠেছে অবিশ্বাস্যরূপে প্রাণঘাতী। সুন্দরী শস্য শ্যামলা এই ধরাধামের স্মৃতিরোমন্থনের জোনাকির ঝিঁঝির পরিচিত শব্দের বদলে জায়গা করে নিয়েছে ত্রিফলা অট্টালিকা, বিনোদনী শপিংমল কিংবা কর্মসংস্থানের কলকারখানা শুধুই বাদ পড়ে গেছে প্রাণদায়ী প্রকৃতি।*

**জল ও জলাভূমির সংকটের কারণ :** জলাভূমি ও জলা বসতিতে দেখা দিয়েছে যে সংকট ফুটে উঠেছে তাতে চিন্তাশীল মহলের কপালে চিন্তার ভয়াবহ বলিরেখা। জল সংকটে উপমহাদেশে বিভিন্ন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের সম্মুখে ঘনিয়ে এসেছে এক দুর্ভাগ্যজনক সমস্যার কালোমেঘ।

১. **জলবায়ু পরিবর্তন :** প্রথমত বর্ষা আসছে বিলম্বে। দেশের একটা বড় অংশে খরার করালছায়া বিজ্ঞানীদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের জেরেই কী এই জল সংকট? উত্তরটা আপেক্ষিক কারণ, কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যানুসারে শিল্পবিপ্লবের আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা যা ছিল তার তুলনায় ১৫° সে.। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও গলে যাবে ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ১/৩ অংশ হিমবাহ কোনো অঞ্চল হবে জলমগ্ন। আবার কোনো অঞ্চলে আসবে খরার, শুষ্কতার করালছায়া।

২. **ভূগর্ভস্থ জলাভাব :** ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার জল সংকটের অন্যতম কারণ। ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের নিরিখে ভারত বিশ্বের এক নম্বর স্থানাধিকারী বেশিরভাগ কৃষি-শিল্প-শহর-গ্রাম নির্ভরস্থিত এই ভূগর্ভস্থ জলের ওপরেই। অনিয়ন্ত্রিত হারে জল নিষ্কাশন এবং ক্রমান্বয়ে জলতল হ্রাসের কারণে সাবসিডেন্স বা ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরীণ গঠনের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। পালটে যাচ্ছে স্বাভাবিক জলপ্রবাহ। প্রকট হচ্ছে চরম জল সংকট।

৩. **জল সংকটে দায়ী কৃষিকাজ :** গ্রামের জলকষ্ট এক নীতিজনিত সমস্যাভুক্ত কলকারখানার ও জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য আহ্লাদিত সবুজ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শর্ত—রাসায়নিক সার প্রয়োগের কারণে বৃষ্টিবিধৌত হয়ে তা নিক্ষিপ্ত হয় পার্শ্ববর্তী জলগর্ভে। ফলে ব্যবহার্য জল হয়ে উঠেছে অব্যবহার্য। এই অব্যবহারযোগ্য জল বাদ দিতে গিয়ে পৃথিবীব্যাপী বিশল জলভাণ্ডার এগিয়ে চলেছে জলশূন্যতার মুখে।

৪. **জলাভূমির সংকট :** জলাভূমি কথার অর্থ হল স্বাদু কিংবা লবণাক্ত স্থির মৌসুমীভিত্তিক কম গভীরসম্পন্ন প্রাকৃতিক জলগর্ভ। এই জলগর্ভ কি সত্যি ব্যবহার্য জলগর্ভ? এই ব্যবহারযোগ্য জলজননীর পঙ্কিলতা গিয়েছে মাত্রা ছাড়িয়ে বা তা লুপ্তপ্রায় কোনো কোনো উন্নত অঞ্চলে। কারণ—

বিকাশমান নগরায়ন বা শিল্পায়নের কারণে এদের শ্রেণি পরিবর্তিত হয়েছে আবাসিক বা বাণিজ্যিক পরিকাঠামোয়।

সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর বা সংস্থাগুলির দায়সারা দায়িত্ব পালনের কারণে শহরে ও গ্রামে বিদ্যমান জলাভূমি আজ মৃত্যুমুখে।

**জল সংকটের নিদর্শন :** এইভাবেই জল সংকট আজ ষোলোকলায় পূর্ণ। আজকের মানুষের একবারও মনে হয়েছে তার পরবর্তী প্রজন্মের কথা? ১০ বছর বাদে নিজেদের অবস্থার কথা? দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতের প্রতিটি কোণায়—সরকারি ট্যাঙ্কারের প্রতীক্ষায় কয়েক কিলোমিটার জুড়ে বিভিন্ন কলসির সারি দৃশ্যমান।

রাজস্থানের কয়েক লিটার জল পেতে কয়েক কিলোমিটার অতিক্রম করে মহিলা, কিশোর, কিশোরীরা অপেক্ষমান লাইনে।

বৃষ্টিতে মন্দার ধাক্কা দেশের অর্থনীতিতে। ধানের বীজ ৯% জমিতে কম বোনা হয়েছে তৈলবীজের চাষের অভাব।

শিল্পের চাকায়ও বৃহৎ ধাক্কা—পাটশিল্পে অভাব জলের—জলাভূমির কৃষিজাত আয়ের পরিসংখ্যানও বাস্তবে বিবর্ণ।

**চাষের কাজে জল সংরক্ষণ :** জল সংকট রোধে পিছপা হয়নি ২০১৮ সালের জাতি সংঘের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট। জোর দিয়ে চাষের পদ্ধতি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ওপর। আনতে হবে বিকল্প ভাবনা, পদ্ধতি বদলে কাজে লাগাতে হবে বিন্দু সেচ। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তযোগ্য নিদর্শন হল ইজরায়েলের কিবুৎজা ও মসহ্যাভ বিন্দু সেচ প্রণালী।

**প্রকল্পানুসারে জল সংরক্ষণ :** তবে অসংখ্য জলপ্রকল্প নির্মাণে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন রাজস্থানের আলওয়ার জেলার রাজকুমার সিং যিনি খরাবিধ্বস্ত ১০০০টি গ্রামে দিয়েছেন জলের জোগান। এইরূপ দৃষ্টান্তকে সামলে রেখে এগিয়ে যেতে হবে, গড়ে তুলতে হবে জল সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত ভারতের অন্যান্য স্থানে।

সেই সঙ্গে ধরে রাখতে হবে জৈব ও পরিবেশের বৈচিত্র্যকে, করতে হবে রেনওয়াটার হারভেস্টিং-এর মত প্রকল্প। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত জল ধরো জল ভরো প্রকল্প দৃষ্টান্তমূলক। যার অন্যতম উদ্দেশ্য বৃষ্টিজল সংরক্ষণ ও কূপ খনন।

আবার তামিলনাড়ুতেও দৃষ্টান্তযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় বৃষ্টিবারি সংরক্ষণের। আবার মিজোরামে প্রবল বর্ষায় জল নামছে টিনের চাল থেকে রিজার্ভারে।

তাই এককথায় 'জল ধরো জল ভরো' কিন্তু তামিলনাড়ু ও মিজোরামের জল সংরক্ষণের উপায় এক একটি অভিনব জল সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত।

**ভূগর্ভস্থ জল রক্ষণ :** অন্যদিকে সংকটের মুখে ভূগর্ভস্থ জলও বাঁচাতে হবে তাকেও। চাই নির্দিষ্ট আইন—Indian casements acts-2006—এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক। এছাড়াও উদাহরণ হিসেবে পাই উরগুঁয়ের ঘোষিত জলের মৌলিক অধিকার ও সংশোধিত আইনাবলি।

**উপসংহার :** কিন্তু আইনি আশ্রয়ে যান্ত্রিক ও সাময়িক পরিবর্তন সম্ভব কিন্তু অসম্ভব মানসিক পরিবর্তন। তাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে মানুষের সচেতনতাকে। চাই প্রতিটি মানুষের নাগরিক কর্তব্য। তাই শুধু আইনি আশ্রয়ে নয়, হাত ধরতে হবে মানুষেরও। পৃথিবীব্যাপী সকল মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করতে। উচ্চারিত করতে হবে—

**'জল ও জলাভূমি সংরক্ষণের লড়াই**
**জীবন বাঁচানোর লড়াই।'**

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

# অচিন জল

কথায় কথায় বলি, ‘এতো জলের মতো সোজা’, অথচ আকাশ বাতাস মেঘলোকে, সাগর নদী খালবিলে ব্যাপক যার উজ্জ্বল উপস্থিতি, আপনি, আমি-রাম-রহিম যার রহমতে বেঁচে বর্তে আছি, জীবকোষে যার পরিমাণ উনিশ-বিশ হলেই প্রাণ যাই যাই করে, সেই অতি পরিচিত জল যে দুনিয়ার অন্যতম আজব বস্তু তা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না।

সাধারণ তাপমাত্রায় জল তরল থাকে। তরল পদার্থের সাধারণ ধর্ম হল যতই তরলটিকে ঠাণ্ডা করা হবে তার অণুগুলো ততই একটি একটি আর একটির কাছাকাছি চলে আসবে (অণু হল পদার্থের সবচেয়ে ছোট অবস্থা। পদার্থটির যা গুণ ছোট্ট অণুটিরও তাই গুণ। চিনি যেমন খেতে মিষ্টি, চিনির অণুও তাই। কিন্তু আলাদা করে একটি অণু চেখে খাবার উপায় নেই—এতই ছোট। কত ছোট একটা নমুনা পেশ করলেই বুঝবেন—এক ফোঁটা জল যদি পৃথিবীর মতো বড় হয় তবে জলের একটি অণুর ‘সাইজ’ হবে টেনিস বলের মতো। বুঝুন, এমন কত সহস্র কোটি অণু নিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিন্দু জল। আবার এই অণুর চেয়ে ছোট বস্তু আছে, তাকে বলে পরমাণু। যেমন দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে জলের একটি অণু গড়ে তোলে।) এবং এক সময়ে জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে যাবে। সুতরাং তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় যাওয়ার পথে প্রতিপদে বস্তুটির ঘনত্ব বেড়ে চলবে এবং স্বভাবতই কঠিন স্তরে বস্তুটির ঘনত্ব হবে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বভুবনে মানুষের জ্ঞানে যত কিছু তরল পদার্থ আছে একমাত্র জল ছাড়া সবাই এই নিয়মটিকে মেনে চলে।

*পাহাড়ের জলধারা*

ঠাণ্ডা হবার সাথে সাথে জলেরও ঘনত্ব বাড়ে কিন্তু জমাট বেঁধে বরফ হবার বেশ আগে, 4ºC তাপমানেই তরল জল ঘনত্বের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। বরফের ঘনত্ব জলের চাইতে কম তাই বরফ জলে ভাসতে থাকে। জলের এই আজব গুণটির জন্যই মেরু অঞ্চলে বরফের আস্তরণের নীচে জল প্রবহমান এবং সেই জলে জীবজগৎ ভালোভাবেই বেঁচে থাকে, পরিপুষ্ট হয় এবং বংশবৃদ্ধি করে।

এখন প্রশ্ন, অন্য সব তরলের মতো জলের এই কঠিন অবস্থাটা (বরফ) সবচেয়ে ঘন হয় না কেন? হলে কী হত?

কেন হল না তার উত্তর আমরা একটু পরে দেবার চেষ্টা করব। তবে জল যদি অন্যান্য তরলের মতো কঠিন অবস্থায় (বরফ) পৌঁছে সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব অর্জন করত তাহলে আমার এই লেখাটি কোনদিন লেখা হত না এবং আপনারাও এই মর্ত্যধামে পুণ্য মানবদেহ ধারণ করতেন কিনা সন্দেহ?

ব্যাপারটা হল এই পৃথিবীতে অতীতে অনেক হিমযুগ এসেছে। হিমযুগ হল এমন এক একটা যুগ যখন চারদিক বরফে ছেয়ে যায়। বরফের ঘনত্ব যদি জলের চাইতে বেশি হত তবে এত বরফ সব জলের নীচে চলে যেত এবং উপরের জলস্তর ক্রমেই শক্ত হতে হতে নিরেট বরফ হয়ে ধীরে ধীরে প্রাণের শেষ কণাটিকেও নিঃশেষ করে দিত। কিন্তু তা হয়নি। তখনও বরফের নীচে জলের বিপুল ভাণ্ডারে আমাদের অতি-অতি... বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহীর প্রাণবীজ সন্তরণ করে চলেছিল। জলের বিদ্রোহী সত্ত্বার জন্য ‘আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে।’

জলের আর একটি বিশেষ গুণ জল অনেক সময় ধরে অনেকটা তাপ নিজের ভিতর জমিয়ে রাখতে পারে। অবশ্য প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সেই তাপ বিশেষ পরিবেশে ছেড়ে দিতেই হয় কিন্তু তখন সে ছাড়েও আস্তে আস্তে।

একটা সোজা পরীক্ষা করা যাক। দুটো কৌটায় আলাদা আলাদা করে সমপরিমাণ জল ও বালি রেখে রোদে বসিয়ে দিলাম। একটু পরেই দেখব বালি তেতে বেশ গরম হয়ে গেছে কিন্তু জল গরম হলেও সে তুলনায় খুব একটা নয়। এবার কৌটা দুটোকে ঘরের ছায়ার ভিতর রেখে দিলাম। কিছু পরেই দেখা গেল বালি অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিন্তু জলের তাপ খুব একটা কমেনি। জলের এই গুণটির জন্য সাগরতীরে শীতের দিনেও খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ে না। স্থলভাগ তাপ ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে থাকলেও সাগরের বুক থেকে সবসময় ধীরে ধীরে গরম হাওয়া চলে এসে একটা কবোষ্ণ মনোরম আবহাওয়া উপহার দেয়। শুধু তাই নয়, সূর্যকিরণ থেকে জলের এই ধীরে ধীরে তাপ নেওয়া এবং সূর্যাস্তের পর ধীরে ধীরে সেই তাপ ছেড়ে দেবার ফলে গোটা পৃথিবীতে তাপের একটা সাম্যভাব বজায় থাকছে। বালি, লোহা ইত্যাদি বস্তুর মতো জলও যদি তাপের উৎস থেকে চটজলদি তাপ নিত এবং ঠাণ্ডায় চটপট সেই তাপ ছেড়ে দিত তবে দিনে প্রচণ্ড উত্তাপে এবং রাত্রে ঠাণ্ডায় সসাগরা এই দুনিয়া আর বাসযোগ্য থাকত না।

জলের গুণাবলী তো জানলাম কিন্তু জল কী করে এসব গুণ অর্জন করল সেও এক চমকপ্রদ কাহিনি।

পৃথিবীতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে তৈরি সর্বাধিক এবং সহজলভ্য বস্তু হল জল। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুটোই সাধারণ তাপ ও চাপে (অর্থাৎ দুনিয়ায় আমরা যে গড় তাপমাত্রা এবং বায়ুমন্ডলের চাপে বাস করি) গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু এক বিশেষ কায়দায় মিলেমিশে তৈরি করে জলের একটি অণু। হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক ধরলে দেখা যাবে অক্সিজেন পরমাণু তার চাইতে ষোলগুণ ভারী। সুতরাং দুটি হাইড্রোজেন

2 এবং একটি অক্সিজেনের 16, মোট 18 হল একটি জলের অণুর ওজন। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ওজনকে বলে আণবিক গুরুত্ব। অতএব জলের আণবিক গুরুত্ব হল আঠারো। অন্য অনেক যৌগিক পদার্থের তুলনায় জলের এই আণবিক গুরুত্ব বেশ কম। সাধারণত দেখা যায় যে সব পদার্থের আণবিক গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম তারা অল্প তাপেই তরল অবস্থা থেকে গ্যাসীয় স্তরে চলে যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের স্ফুটনাঙ্ক কম বলা হয়ে থাকে। সেরকমভাবে তারা কঠিন অবস্থা থেকে অল্প তাপেই তরল হতে থাকে। (গলনাঙ্ক কম বলা হয়।)

অথচ কী অবাক কাণ্ড জলের চাইতে বেশি আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন যৌগিক পদার্থ কিছু পাওয়া গেল যাদের স্ফুটনাঙ্ক ও গলনাঙ্ক জলের চেয়েও কম। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। জলের একটি অণু বোঝাতে আমরা লিখি $H_2O$, তেমনি হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণুর সাথে সালফার (গন্ধক) এবং সেলেনিয়াম নামে দুটি মেটালিক পদার্থের একটি করে পরমাণুর পৃথক পৃথক মিলনে হাইড্রোজেন সালফাইড এবং হাইড্রোজেন সেলেনাইড তৈরি হয় (যথাক্রমে $H_2S$ এবং $H_2Se$)। এই দুটি যৌগের আণবিক গুরুত্ব জলের চেয়ে বেশি সুদরাং এদের স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক জলের থেকে বেশি হবার কথা। কিন্তু নীচের এই চার্টে আমরা কি দেখছি?

| যৌগ | আণবিক গুরুত্ব | স্ফুটনাঙ্ক | গলনাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| জল ($H_2O$) | 18 | 100ºC | 0ºC |
| হাইড্রোজেন সালফাইড | 34.8 | –60.75ºC | –85.60ºC |
| হাইড্রোজেন সেলেনাইড | 80.98 | –41.5ºC | –60.40ºC |

দেখলাম জলের ($H_2O$) আণবিক গুরুত্ব হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) এবং হাইড্রোজেন সেলেনাইডের চাইতে কম হওয়া সত্ত্বেও জলের স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক ঐ দুটি যৌগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

রহস্যের পর রহস্য। বহু গবেষণার পরে রহস্যের মূল সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল জলের অণুর মধ্যেই। দেখ গেল জলের আণবিক গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম হলেও, অণুগুলো অন্য অনেক যৌগের তুলনায় ছোট হলেও ওরা ঐক্যবদ্ধ হবার শক্তি ধরে। দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু কি ত্রিভুজের আকারে এক একটি জলের অণু গঠন করে এবং সাথে সাথেই একটি অণুর অক্সিজেন পাশের অপর অণুটির হাইড্রোজেনকে টেনে আনে, এভাবে চলতে থাকায় অনেকগুলো অণু কাছাকাছি এসে একটা বড় অণুর আভাস দিতে থাকে (ক এবং খ নং ছবি দেখুন)।

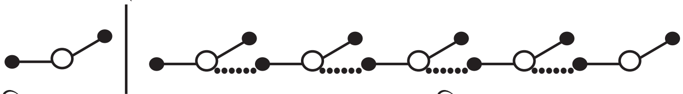

চিত্র-ক চিত্র-খ

● হাইড্রোজেন পরমাণু ○ অক্সিজেন পরমাণু ..... হাইড্রোজেন বন্ধন

জলের এই গুণটি হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) বা হাইড্রোজেন সেলেনাইডের ($H_2Se$) নেই অর্থাৎ সালফার (S) সেলেনিয়াম (Se) পাশের অণুটির হাইড্রোজেনকে (H) টেনে আনতে পারে না তাই তারা ছোট ছোট অণু হয়েই একা একা ঘুরে বেড়ায় আর জলের অণুগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে বড় হয়ে যাবার ফলে জলের স্ফুটনাঙ্ক, গলনাঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক কিছুই ওদের চাইতে বৃদ্ধি পায়।

এখন আমরা যদি পুরনো প্রশ্নে ফিরে আসি সে 'বরফের ঘনত্ব জলের থেকে কম হয় কেন?'- সেটাও জলের এই আণবিক বিন্যাস দিয়ে ব্যাখ্যা মেলে।

ধরুন আমরা এক গ্লাস জল নিলাম। থার্মোমিটারে দেখা গেল সেই জলের তাপমান 28ºC। এবার সেই জলকে ঠাণ্ডা করতে শুরু করলাম, তাপমান নামছে, যতই নামছে, ঘনত্ব ততই বাড়ছে! এভাবে 4ºC অবধি ঘনত্ব বেড়েই চলল তার পরেই 3ºC এসে (জল তখনও তরল, আছে) দেখা গেল এবার ঘনত্ব কমছে 2ºC-তে ঘনত্ব আরো কমল, 0ºC-এ আরো কমে জলের কিছু অংশ বরফ হয়ে ভাসতে লাগল। ঠাণ্ডা যখন হচ্ছিল হাইড্রোজেন বন্ধনে সংযোগিত জলের অণুগুলো গুটিয়ে আরো ঘন হয়ে আসছিল তাই জলের ঘনত্ব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, 4ºC অবধ ঘনত্বটা খুবই বাড়ল কিন্তু তার নীচে তাপমান নামতেই সেই অণুগুলো একট দূরে দূরে সরে গিয়ে বরফের ঘর (কৃষ্টাল বা কেলাস) তৈরির কাজে লেগে পড়ল, তাই ঘনত্ব গেল কমে। সহজ করে বলা যায়, আমরা যখন বাড়ি বানাই তখন বাড়ি তৈরির জন্য বয়ে আনা ইটের পাঁজা একটা বড় লরিতে দিব্যি চলে আসে অর্থাৎ ইটের পাঁজা আর লরির আয়তন প্রায় সমান ধরে নিতে পারি কিন্তু সেই ইট দিয়ে যে দুখানা ঘর গড়ে ওঠে তার আয়তন সেই লরির আয়তনকে নিঃসন্দেহে ছাপিয়ে যাবে।

সুতরাং তরল জল ঠাণ্ডায় বরফ হলে আয়তনে বাড়ে। আয়তনে বেড়ে যাবার ফলে শীতের দেশে তাপমান যখন 0ºC-এ নেমে আসে তখন জলের পাইপ বা গাড়ির রেডিয়েটারের পাইপগুলো হঠাৎ হঠাৎ ফেটে যেতে থাকে, তখন নতুন পাইপ বসিয়ে তাকে ভালো করে কাপড় জড়িয়ে বা রেডিয়েটারের জলে সুরাসার মিশিয়ে এসব ঝামেলা থেকে বাঁচতে হয়। অবশ্য এরকম আয়তন বৃদ্ধি শীতের দেশে কৃষিক্ষেত্রে খুব কাজ দেয়। মাটির নীচে জলে থাকা জল তীব্র ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে ফুলে উঠে উপরের মাটির স্তরকে এমনভাবে ফুটিফাটা করে দেয় যে অনেক সময় জমি আর চাষ করার দরকারই হয় না—বীজ পুঁতে দিলেই হল।

এবার পরের প্রশ্ন ঃ জল তাপ নিতে এবং ছাড়তে এত সময় নেয় কেন?

ঠান্ডা হবার সাথে সাথে জলের একটা অণুর সাথে প্রতিবেশী অণুর হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে (এবার থেকে সংক্ষেপে শুধু H বন্ধন বলব) আরো কাছে আসার প্রবণতা বেড়েই চলে। বরফে অণুর সাথে অণুর এই H বন্ধনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়। তাপ পেয়ে বরফ যখন আবার জল হতে থাকে এই H বন্ধনগুলো তখন একটু একটু করে খুলে যেতে থাকে অর্থাৎ তাপ যতই বাড়বে H বন্ধনহীন মুক্ত অণুর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাবে। অন্য তরলের বেলায় যেখানে অণুগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকে জলের অণুর মতো H বন্ধন করে না সেসব ক্ষেত্রে তাপ এসে সরাসরি সহজে সেই অণুগুলোকে আরো দূরে ঠেলে দিতে পারে (অণুগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে) তাপের প্রভাবে একটা অণুর সাথে আর একটার এইরকম দূরত্ব বেড়ে চললে, এমন সময় আসে যখন তরল আর তরল থাকে না, গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই অবস্থায় তরলটি ফুটতে থাকে। যে নির্দিষ্ট তাপমানে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় সেটাই সেই তরলের স্ফুটনাঙ্ক। জল গরম হবার সময় তাপের একটা বড় অংশ ওই H বন্ধনগুলো খুলতেই খরচ হয়ে যায়, সব বন্ধন খুলে জলকে গ্যাসীয় স্তরে নিয়ে যেতে তাপের পরিমাণ এবং সময় অন্য সব তরলের সাথে তুলনামূলক ভাবে তাই বেশি লাগে। তাপের উৎস সরিয়ে নিলে উল্টো ব্যাপার হয়। আবার একটু একটু করে নতুন নতুন H বন্ধন গড়ে উঠতে থাকে এবং জলের তাপও ধীরে ধীরে কমে আসে।

জলের এইসব ধর্ম বিজ্ঞানীরা জানলেও সাধারণ মানুষদের কাছে তা অজানা। আমাদের চেনা জলকে তাই অচিন জল বললেও তা সত্যের অপলাপ হবে না।

শ তা ব্দী দা শ

# ভারী ধাতুজনিত জলদূষণ : একটি সমস্যা

পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের প্রাথমিক শর্ত হল জল।

বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ মানুষ সহ সমগ্র জীবজগৎ তথা বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই দরকারী। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে বেড়ে চলা জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দ্রুত শিল্পায়ন এবং অপরিণামদর্শিতার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ইত্যাদির ফলে জলসম্পদ অত্যন্ত সংকটে পড়েছে। জলদূষণকারী বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রয়েছে কীটনাশক, রাসায়নিক, রং, প্লাস্টিক, ওষুধ, ঔষধ কারখানার বর্জ্য, ভারী ধাতু, নানারকম জীবাণু প্রভৃতি। ভারী ধাতুগুলির মধ্যে আছে তামা, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, সীসা, পারদ, আর্সেনিক, রূপা ক্রোমিয়াম, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি। এইসব বিষাক্ত ধাতব বর্জ্য প্রতিদিন জলে নির্গত হয় বিভিন্ন উৎস থেকে। অনেক সময় দেখা যায় জলে এদের মাত্রা পানীয় জলের নির্দিষ্ট সহনীয় মাত্রার থেকে অনেক বেশি হয়। তখনই তা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। এই ভারী ধাতুগুলি 'বায়োডিগ্রেডেবল' বা পচনযোগ্য নয় উপরন্তু তারা খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে প্রাণীদেহে প্রবেশ করে। এক 'ট্রপিক লেভেল' থেকে পরবর্তী ট্রপিক লেভেলে প্রবেশ করার সময় তাদের ঘনত্ব বেড়ে যেতে থাকে। একে বলে 'বায়োম্যাগনিফিকেশন' (biomagnification)। অনেক ভারী ধাতুই বিষাক্ত এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (Carcinogenic)। শরীরে সামান্য ঘনত্বে এদের উপস্থিতি ক্ষতি করতে পারে ফুসফুস, বৃক্ক, যকৃৎ, প্রস্টেট, খাদ্যনালী, পাকস্থলী এবং ত্বকের। এছাড়া এরা অ্যালজাইমার্স এবং পার্কিনসন্স রোগ সৃষ্টিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। জলভাগের বিভিন্ন প্রাণী, যেমন মাছ এবং প্রাণীকণা (Zooplankton) ও উদ্ভিদকণা (Phytoplankton)-রও এরা ক্ষতি করে। তাই ভারী ধাতুজনিত দূষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

ভারী ধাতুগুলি যখনই খাদ্যশৃঙ্খলের (Food chain) মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই তারা মানবদেহ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে পৌঁছে যায়। মাছ চাষের পুকুরগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনা না হলে সেই সব জলাশয়গুলিতে ভারী ধাতুজনিত দূষণের সম্ভাবনা থেকে যায়। এছাড়া ভারী ধাতুর উপস্থিতি জল ও তার নীচে থাকা মাটিতে উপস্থিত উপকারী ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করে দেয় বা তাদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায়। নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন, কোষপর্দা, কোষের স্বাভাবিক কাজকর্ম, বিভিন্ন অনুঘটকের কাজ, ইত্যাদিকে নষ্ট করে ভারী ধাতুর উপস্থিতি। মানবদেহের হাড়ে এইসব ভারী ধাতু জমা হলে বিভিন্ন রকম ঘাটতিজনিত অসুখ দেখা দেয় এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেও দুর্বল করে দেয়। বিভিন্ন জলাশয়, যেগুলি ভারী ধাতুজনিত দূষণে আক্রান্ত, সেইসব জলাশয়কে ভারী ধাতুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করার উপায় বের করা বিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

কয়েকটি বিষাক্ত ভারী ধাতু নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। পারদ এরকমই একটি বিষাক্ত ভারী ধাতু। বিভিন্ন কারখানা, যেসব জায়গায় ক্লোরিন এবং কস্টিক সোডা তৈরি হয়, কাগজ, কাগজের মন্ড, কৃষিক্ষেত্রের রাসায়নিক, ঔষধ কারখানা প্রভৃতি থেকে পারদ জলভাগে নির্গত হয়।

ক্যাডমিয়াম হল অপর একটি বিষাক্ত ভারী ধাতু। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং শিল্প, ব্যাটারি, সাইকেল কারখানা, রঙ ও বয়ন শিল্প, খনিজ, পাথর ইত্যাদি থেকে ক্যাডমিয়াম জলে নির্গত হয়।

আর্সেনিক (একটি ধাতুকল্প) দূষণযুক্ত পানীয় জল এশিয়ার দেশগুলির একটি বড় সমস্যা, যা মানুষের স্বাস্থ্যহানির জন্য দায়ী।

খুব কম মাত্রায় ভারী ধাতু পরিবেশে (জল, মাটি প্রভৃতিতে) থাকলেও তা মানুষ ও অন্য প্রাণীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিছু কিছু ভারী ধাতু দেহে খুব সামান্য মাত্রায় প্রয়োজনীয় হলেও বেশিরভাগ ভারী ধাতু মোটেই উপকারী নয়। ক্যাডমিয়াম, সীসা প্রভৃতি তো খুব সামান্য মাত্রাতেও অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

গত শতাব্দীতে জাপানে ঘটে যাওয়া ভারী ধাতুজনিত দূষণের দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা আমাদের অনেকেরই জানা আছে।

১৯৫৬ সালে জাপানের উপকূলীয় এলাকায় পারদ দূষণ ঘটেছিল। ওই উপসাগর থেকে ধরা মাছের মাধ্যমে মানুষের দেহে পারদ-জনিত দূষণ ঘটেছিল যা 'মিনামাতা' রোগ নামে পরিচিত, যার ফলে মিথাইল মার্কারি ঘটিত দূষণে মারা যান বহু মানুষ। ১৯৬৫ সালে একই রকম ঘটনায় জাপানের আগানো নদীর জল ও মাছ থেকে একই রকম বিপর্যয় ঘটেছিল। এতে মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তির ওপরেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল।

১৯৬০ সালে ওই জাপানেই জিনজু নদীর জলে ক্যাডমিয়াম দূষণের ফলে মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল ইতাই-ইতাই (itai-itai) অসুখে। ওই অঞ্চলে অবস্থিত খনি থেকে নির্গত বর্জ্য থেকেই ওই দূষণ ঘটেছিল। খনি থেকে প্রায় ৩০ কি.মি. দূরেও এই দূষণের প্রভাব দেখা গিয়েছিল।

এইসব ক্ষতিকারক ভারী ধাতুগুলিকে কয়েকটি পদ্ধতিতে জল থেকে অপসারিত করা যায়, যার মধ্যে আছে Adsorption, ion-exchange প্রভৃতি। এছাড়া কিছু রাসায়নিক পদ্ধতি, যেমন ইলেক্ট্রোকাইনেটিক পদ্ধতি, কেমিক্যাল পদ্ধতিতে অধঃপাতিত করা এগুলিও করা যায়। আবার কিছু বায়োলজিক্যাল উপায়, যেমন ফাইটোরিমেডিয়েশন (Phytoremediation) পদ্ধতিতেও ভারী ধাতুর আয়নগুলিকে জল থেকে অপসারিত করা যায়। তবে এইসব পদ্ধতি এতই ব্যয়বহুল, যে এগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা খুবই অসুবিধাজনক।

Advanced oxidation পদ্ধতি ব্যবহার করেও এই কাজ করা হচ্ছে। আরও ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন এই সমস্যা নিরসনের জন্য। দরকার কম খরচে এবং পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি প্রয়োগ করে জলকে ভারী ধাতুজনিত দূষণ থেকে রক্ষা করা। দরকার দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ, যার থেকে তৈরি হবে বিভিন্ন সমাধান সূত্র। তবেই জলের স্বাস্থ্য, জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষা পাবে এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য তথা পরিবেশের ভারসাম্য সঠিকভাবে বজায় থাকবে।

**তথ্যসূত্র**


1. Heavy metal pollution in the aquatic environment: efficient and low cost removal approaches to eliminate their toxicity-a review. Aziz et al. Rsc. Adv.2023, June 9, 13((26): 17595-17610.
2. Bioremediation of industrial waste for enviromental safety. Saini S. and Dhania G. Springer, 2020; 357-387.

সায়ন ভট্টাচার্য

# পরিবেশে ফ্লোরাইড দূষণ

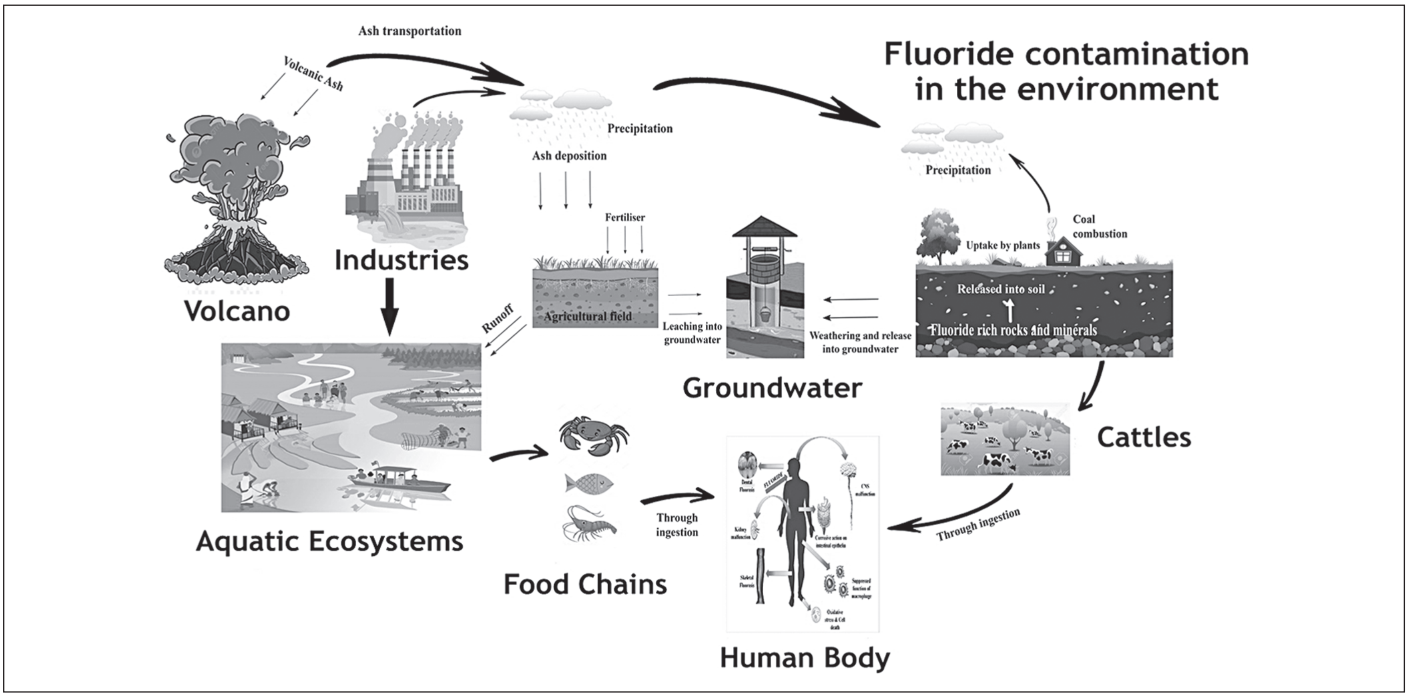


ফ্লোরিন (F) পৃথিবীপৃষ্ঠে ১৩ তম সর্বাধিক প্রাপ্ত মৌল। পরিবেশে ফ্লোরিনের বিভিন্ন আকরিক পাওয়া যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফ্লোরাইট (Fluorite), হর্নব্লেন্ড (Hornblende), বায়োটাইট (Biotite), টোপাজ (Topaz) প্রভৃতি। ফ্লোরাইড হলো ফ্লোরিনের (F) ঋণাত্মক আয়নিক অবস্থা ($F^-$)। ফ্লোরাইড ইলেক্ট্রোনেগেটিভ হবার কারণে অত্যন্ত সক্রিয়। বিভিন্ন আকরিক থেকে ফ্লোরাইড ক্ষয়ীভূত হয়ে পরিবেশে মেশে। মাটিতে ফ্লোরাইডের রাসায়নিক অবস্থা নির্ভর করে বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর, যেমন মাটির পলিকণার প্রকৃতি, জৈব পদার্থের পরিমাণ, ফসফরাস, বিনিময় যোগ্য ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম, pH ইত্যাদি। ফ্লোরাইড পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, তবে অত্যধিক বা মাঝামাঝি শুষ্ক অঞ্চলে ফ্লোরাইড দূষণের প্রবণতা বেশি থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং ঋতুর উপর নির্ভর করে ভূগর্ভস্থ জলে ফ্লোরাইডের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়।

বিভিন্ন উদ্ভিদ বাতাস থেকে পাতার মাধ্যমে এবং মাটি ও জল থেকে মূলের মাধ্যমে ফ্লোরাইড শোষণ করতে সক্ষম। প্রজাতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উদ্ভিদের ফ্লোরাইড শোষণ করার ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়। ফ্লোরাইড সহ্য করতে পারে এমন গাছগুলিতে ফ্লোরাইড সঞ্চিত হলেও প্রাথমিক স্তরে বিষক্রিয়া দেখা যায় না (যেমন, চা গাছ)। ফ্লোরাইড দূষণের ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদে অঙ্কুরোদগম, ক্লোরোফিলের উৎপাদন, সালোকসংশ্লেষ, পুষ্টিকর মৌলের শোষণ প্রভৃতি পদ্ধতি বিঘ্নিত হয়, যার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং জীবভর (biomass) কমে যায়। বিভিন্ন প্রাণীর উপরেও ফ্লোরাইডের প্রভাব মারাত্মক। ফ্লোরাইড বিভিন্ন কীটপতঙ্গের বৃদ্ধি ও প্রজননকে ব্যাহত করে। স্থলচর, বিশেষত গবাদি প্রাণীরা ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চলে ফ্লোরাইড যুক্ত জল পান করে এবং ফ্লোরাইড যুক্ত উদ্ভিদ খায়, পাশাপাশি ফ্লোরাইড যুক্ত মাটি থেকেও প্রাণীদেহে সঞ্চয় হয়। উট, মোষ, গাধা, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে এই মৌলের দূষণের ফলে হাড়ের ও দাঁতের ফ্লোরোসিস, প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস, আন্ত্রিক সমস্যা, স্নায়বিক গোলযোগ প্রভৃতি সমস্যা দেখা গেছে।

World Health Organization (WHO) নির্ধারিত ফ্লোরাইডের সহনশীল মাত্রা জলে 1.5 ppm. (mg/lt.)। অল্প পরিমাণে ফ্লোরাইড মানুষের শরীরে এনামেল এবং হাড়ের গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়। ফ্লোরাইডের অভাবে মানুষের শরীরে হাড়ের গঠন ব্যাহত হয়, হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং দাঁতের সমস্যা দেখা যায়। মানুষ সহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে ফ্লোরাইড প্রবেশ করলে তার প্রায় অর্ধেকটাই ঘাম, মল বা প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, বাকি ফ্লোরাইডের প্রায় পুরোটাই হাড়ে জমা হয়। ফ্লোরাইড দূষণের ফলে ক্রমশ জীবদেহে ফ্লোরাইডের সঞ্চয় বাড়তে থাকে। ফ্লোরাইড ইলেক্ট্রোনেগেটিভ হবার কারণে শরীরের পজিটিভ আয়নগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে। ফ্লোরাইডের আধিক্যে মানবদেহে দাঁতের ও হাড়ের ফ্লোরোসিস (dental fluorosis and skeletal fluorosis) দেখা যায়। তাই মানুষের শরীরে ফ্লোরাইড কম হলেও বিপদ, আর বেশি হলেও বিপদ।

পৃথিবীর ২৫ টিরও বেশি দেশে প্রায় ২০ কোটি মানুষ ফ্লোরাইড দূষণ জনিত সমস্যায় ভুগছেন; আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভারত, চীন, আর্জেন্টিনা, ইথিওপিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, কেনিয়া প্রভৃতি। বিশেষত ভারত এবং চীনে ফ্লোরাইড দূষণের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পৃথিবীতে প্রাপ্ত মোট ৮৫ মিলিয়ন টন ফ্লোরাইডের মধ্যে ১২ মিলিয়ন টন-ই পাওয়া যায় ভারতে। অতিরিক্ত মাত্রায় ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন ও ব্যবহারের ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ আকরিক থেকে ফ্লোরাইড ক্রমান্বয়ে মাটি ও জলে এসে মিশেছে। ভারতে ফ্লোরাইডের সমস্যা ক্রমবর্ধমান; ১৯৩০ সালে ভারতের ৪টি রাজ্যে, ১৯৯২ সালে

১৫টি রাজ্যে এবং ২০১৫ সালে ২০টি রাজ্যে ফ্লোরাইড দূষণ দেখা গেছে। ভারতবর্ষের ফ্লোরাইড অধ্যুষিত রাজ্যগুলি হল রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র প্রমুখ। ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের ৫০% এবং গ্রামাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলের প্রায় ৯০%-এ ফ্লোরাইড পাওয়া যায়। ভারতে ফ্লোরাইড দূষণের মূল কারণ হলো বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা ফ্লোরাইড যুক্ত পাথরের স্তর। ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চলে ফ্লোরাইডের মাত্রা ১.৫ ppm.-এর চেয়ে বেশি, সেখানে শিশু ও কিশোরদের প্রায় ৭০%-ই দাঁতের ফ্লোরোসিসে আক্রান্ত। মূলত শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে দাঁতের ফ্লোরোসিস বেশি দেখা যায়, পরিণত ও বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে হাড়ের ফ্লোরোসিস বেশি দেখা যায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাড়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়, হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়, নানাপ্রকার স্নায়বিক সমস্যা দেখা যায়, মাংসপেশী শিথিল হয়ে যায়, এমনকি পক্ষাঘাতেরও সম্ভাবনা থাকে। ফ্লোরাইডের আধিক্যে মানুষের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা যায় এবং লোহার ঘাটতির ফলে অ্যানিমিয়া হতে পারে। ফ্লোরাইড দূষণের ফলে হাড়ের ক্যান্সার (Osteosarcoma) হয়, যা শিশুদের ক্ষেত্রে হলে মৃত্যুর হার হয় প্রায় ৫০% এবং অনেক ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গতা দেখা যায়। ফ্লোরোসিসের অপেক্ষাকৃত পরিণত এবং ভয়াবহ অবস্থা হল crippling fluorosis, যাতে কিডনি, লিভার প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফ্লোরাইড যেহেতু একটি মৌল, তাই একে রাসায়নিকভাবে ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। তবে ভূগর্ভস্থ জল ছাড়া জলের অন্যান্য উৎস ব্যবহার করে, জলকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে শোধন করে বা জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমিয়ে বৃষ্টির জল এবং মাটির উপরে অবস্থিত বিভিন্ন জলাশয়ের জল ব্যবহার করলে ফ্লোরাইডের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। জলকে ফ্লোরাইড মুক্ত করার জন্য সহ-অধক্ষেপন (co-precipitation), বিপরীত অভিস্রবণ (reverse osmosis), অধিশোষণ (adsorption), তঞ্চন (coagulation) প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় ফ্লোরাইড সহ জলের বিভিন্ন দূষক পদার্থের অপসারণে ন্যানোটেকনোলজি-র প্রয়োগ নতুন পথ নির্দেশ করেছে। এছাড়া ফ্লোরাইড প্রতিরোধকারী বিভিন্ন জীবাণু ও উদ্ভিদ প্রয়োগ করে ফ্লোরাইড নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে বলা হয় বায়ো-রেমেডিয়েশন (bioremediation)। ফ্লোরাইডকে বেশিমাত্রায় শোষণ করতে পারে এমন উদ্ভিদগুলিকে চিহ্নিত করা, তাদের জিনগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা এবং পরিবেশ থেকে ফ্লোরাইডের হ্রাস বা অপসারণে সেগুলোকে প্রয়োগ করা দরকার। জল ও মাটিতে ফ্লোরাইড দূষণের পাশাপাশি খাদ্যশৃঙ্খলে ফ্লোরাইডের বিস্তারকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। মাটির ধৌতকরণ (soil washing) আরেকটি নতুন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে মাটি থেকে ফ্লোরাইডকে সফলভাবে সরানো সম্ভব। তবে, এখনো পৃথিবীর বহু দেশের বিভিন্ন স্থানের মানুষ ফ্লোরাইড দূষণের ভয়াবহ প্রভাব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়। ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সরকারের উচিত ফ্লোরাইড অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বসবাসকারী মানুষদের আরো সচেতন করা এবং এ বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা।

### তথ্যসূত্র


1. Ali, S., Thakur, S.K., Sarkar, A., Sekhar, S. 2016. Worldwide contamination of water by fluoride. Environmental Chemistry Letters, 14, 291-315.
2. Bhattacharya, S. 2017. Application of nanostructured materials in fluoride removal from contaminated groundwater. European Water, 58, 87-93.
3. Katiyar, P., Pandey, N., Sahu, K.K. Biological approaches of fluoride remediation: potential for environmental clean-up. 2020. Environmental Science and Pollution Research, 27, 13044-13055.


## বরফের চেহারা আছে জলের কেন নেই

জল জমলে বরফ হয়, ফোটালে বাষ্প হয়। প্রত্যেকটাই তো জলের অণু দিয়ে গড়া। তাহলে এমনটা দেখতে হয় কেন? কেন জলের কোনো চেহারা নেই? কেনই বা বাটিতে জল ফুটিয়ে সকালে চা করতে গেলে জল উথলে আসে—এরকম আরো কত প্রশ্ন আছে।

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অণুদের কাণ্ডকারখানার কথা বলতে হয়। কোনো পদার্থ কঠিন, না তরল, না বায়বীয় অবস্থায় আছে তা নির্ভর করছে সেই পদার্থের অণুগুলো কীভাবে রয়েছে তার উপর। যে কোনো পদার্থের অণুগুলোর অভ্যেস একেবারে বাচ্চাদের মতো—সবসময় ছোটা-দৌড়া করতে চায়। কিন্তু কঠিন পদার্থে অণুগুলো এত কাছাকাছি থাকে যে তাদের মধ্যেকার কোনো দূরত্ব থাকে না বললেই চলে। তাই তারা নড়াচড়াও করতে পারে না। ঠাসাঠাসিতে শুধু কাঁপতে থাকে। খুব কাছাকাছি থাকার জন্য তাদের নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ বলও (যাকে সংসক্তি বলা হয়) সবচেয়ে বেশি হয়—ফলে একে অপরকে দারুণভাবে আটকে রাখে। তাই শুধু বরফ কেন, অন্যান্য কঠিন পদার্থেরও একটা নির্দিষ্ট আকার বা চেহারা আছে এবং একটা জায়গা যেহেতু দখল করে আছে তার আয়তনও আছে। গায়ে ছ্যাঁকা লাগলে আমরা যেমন চিড়বিড়িয়ে উঠি, কঠিন পদার্থে অণুগুলির অবস্থাও তাই। তাপ দিলে অণুগুলির কাঁপুনি বেড়ে যায়, তারা দূরে দূরে সরতে থাকে—তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলও কমতে থাকে। শেষে এমন একটা অবস্থা হয় যে, এই আকর্ষণ বল তাদের আর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখতে পারে না। তারা কিছুটা স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করে—এই অবস্থায় যখন পদার্থটি আসে তখন সেটি তরল হয়ে পাত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তাপশক্তির জোর পেয়ে অণুগুলি একে-ওকে ধাক্কা দিয়ে এদিক-ওদিক অনবরত ছুটতে থাকে। জল তরল—তারও অণুগুলো একইভাবে ছড়িয়ে থাকার জন্য তার কোনো নির্দিষ্ট চেহারা বা আকার গড়ে ওঠে না। যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন তাকে সেই পাত্রের মতোই দেখতে লাগে। এই জলকে তাপ দিলে তাপশক্তিতে তার অণুগুলোর বেগ আরো বেড়ে যায়। তারা আরো জায়গা নিয়ে ছুটতে থাকে। তার মানে জলের আয়তন বেড়ে যায়, কাজেই বাটিতে জল ফোটালে জল উপচে পড়ে। এমন একটা সময় আসে যখন তাদের মধ্যেকার আকর্ষণ বল তাদের আর ধরে রাখতে পারে না। অণুগুলি তরলের বাইরে এসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। তরল তখন গ্যাসে বা বাষ্পে পরিণত হয়। এ সময় তারা একেবারে নাগালের বাইরে চলে যায়। যে যেদিকে পারে ছুটে বেড়ায়—কখনো-সখনো তাদের বেগ ঘন্টায় ৫০ মাইলেরও (৯০ কি.মি.) বেশি হয়।

*—যুগল কান্তি রায়*

দী প ঙ্ক র  চ ক্র ব র্তী*

*(স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ-এর প্রাক্তন অধিকর্তা-র সাক্ষাৎকার)

# বিষয় : আর্সেনিক দূষণ

*যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ (SOES) দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ও বাংলাদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের ওপর সমীক্ষা চালাচ্ছে এবং এই দূষণের ফলে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংস্থার অধিকর্তা ড. দীপঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমরা চেতনা পত্রিকার তরফে মিলিত হয়েছিলাম গত ২৪ এপ্রিল ১৯৯৯-এর সন্ধ্যায়। এই সাক্ষাৎকারটি মুখপত্র চেতনা পত্রিকার (প্রকাশক বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, মধ্যমগ্রাম উ. ২৪ প.) এপ্রিল জুন ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। মূল্যবান এই সাক্ষাৎকারটি পুনঃপ্রকাশ করা হল।*

*আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত পায়ের ছবি*

**চেতনা পত্রিকা**

**প্র:** আমাদের পত্রিকা এবং কাজকর্ম যেহেতু কলকাতা এবং তার শহরতলীর কিছু অংশ নিয়ে, তাই আমরা জানতে চাইছি সাম্প্রতিকতম গবেষণার ভিত্তিতে আমাদের কাছাকাছি অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের উৎস কি?

**ড. চক্রবর্তী**

**উ:** এখন পর্যন্ত, বলা ভাল এখন আর কোন সন্দেহ নেই আর্সেনিকের উৎসটা ভূতাত্ত্বিক (Geological)। আগে বিজ্ঞানীদের একটা সন্দেহ ছিল নৃতত্ত্ববিষয়ক বংশগতীয় উৎস (Anthro-pogenical Source) বিষয়ে কিন্তু সেটা এখন নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। আজকে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা যাঁরা আর্সেনিক দূষণ নিয়ে কাজ করছেন তাদের আর কোনো সন্দেহ নেই উৎসটা ভূতাত্ত্বিক। তবে ভূতাত্ত্বিক উৎস থেকে কোন্ পথে, কোন্ mechanism-এ ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক আসছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে— যেমন SOES মনে করে পাইরাইট জারণের (Oxidation) ফলে পাইরাইট ভেঙে আর্সেনিক জলে আসছে। এই ভেঙে যাওয়ার কারণ হল, জলস্তর নেমে যাওয়ায় অক্সিজেন জলের ভিতর ঢুকছে এবং সেই অক্সিজেনই এই জারণ ঘটাচ্ছে। আবার একদল বিজ্ঞানী ভাবছেন আয়রন অক্সিহাইড্রক্সাইডের সঙ্গে প্রকৃতিতে ভূগর্ভে যে আর্সেনিক জলে চলে আসছে। আবার কেউ কেউ ভাবছেন Microbial process (জীবাণুঘটিত পদ্ধতি) একটা বড় কাজ করছে আর্সেনিক জলে চলে আসার ব্যাপারে এখন এই আর্সেনিক যে পথেই চলে আসুক সেটা বড় ব্যাপার নয়। সেটা বিজ্ঞানীদের ভিতরের কথা বা বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে কিছু করছেন। সামগ্রিক সিদ্ধান্ত হল বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২টা জেলায় ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক পাওয়া যায় সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রার উপরে। বাংলাদেশের ১২ কোটি জনগণের মধ্যে ৪ কোটি অধিবাসী বিপদের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার দক্ষিণাংশ নিয়ে ৯টা জেলার ভূগর্ভস্থ জলে সহনশীল মাত্রার উপরে আর্সেনিক পাওয়া গেছে তা এই ৯টা জেলার জনসংখ্যা প্রায় ৩.৭ কোটি। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যে কাজটা আমরা করতে পেরেছি সেটি হল একটা জেলাকে চার বছর ধরে সমীক্ষা করে এবং কিছু কিছু জেলার কিছু কিছু ব্লককে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করে এবং সেইসব তথ্যকে Extrapolate করে এবং পরিসংখ্যানসমেত বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ আর্সেনিক দূষিত জল খাচ্ছে এবং এর মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ লোকের গায়ে আর্সেনিকের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

**চেতনা পত্রিকা**

**প্র:** এই সহনশীলতার মাত্রা নিয়ে আমাদের মনে একটু দ্বন্দ্ব আছে কারণ আমরা এ বিষয়ে দুটি মত পেয়েছি। কেউ বলছেন 0.01 mg/litre. আবার কেউ বলছেন 0.05 mg/litre. এর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বলে আমরা ধরে নেব?

**ড. চক্রবর্তী**

**উ:** প্রথমে বহু বছর আগে এই সহনশীলতার মাত্রা নির্দিষ্ট ছিল 0.05 mg/litre. এরপর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা WHO সুপারিশ করল পানীয় জলের ক্ষেত্রে আর্সেনিকের সহনশীলতার সর্বোচ্চ মাত্রা থাকতে পারে 0.01 mg/litre. এই দুটি মাত্রার কথাই আপনারা শুনে থাকবেন। এখনও অনেক দেশ 0.01কে মানছে, অনেক দেশ 0.05কে মানছে আবার হালে আমেরিকা স্বতন্ত্র এই মাত্রাকে 0.05 থেকে কমিয়ে 0.01-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার, যেটা সাধারণত আলোচিত দিক—সেটা হল পাশ্চাত্য দেশে প্রতিদিন একটা লোক কতটা জল পান করে? সামান্যই পান করে। ফ্রান্সে তো জলের থেকে মানুষ wine-ই বেশি পান করে। সাধারণত দেখা যায় যে প্রতিদিন গড়ে দুই লিটার জলপানের ভিত্তিতে এই সহনশীলতার মাত্রাটা ঠিক করা হয়েছে কিন্তু ওরা অনেকেই দুই লিটার জলও পান করে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের জলবায়ু এমন যে আমরা গত দশ বছরের সমীক্ষায় দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে গড়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক প্রতিদিন প্রায় চার লিটার জল পান করে এবং গ্রামে কেউ কেউ প্রতিদিন আট থেকে দশ লিটার জলও পান করে এবং শিশুরা দিনে দুই লিটার জল পান করে। যদি আমরা দুই লিটার জল পানের বিচারে সহনশীলতার মাত্রা 0.01 বা 0.05কে ধরে নেই তবে পশ্চিমবঙ্গ ছিল বাংলাদেশে এই সহনশীলতার মাত্রা 0.05 বা 0.01 থেকে অনেক কমে যাওয়ার কথা। এছাড়াও এখানে আর একটা বড় কথা হল পুষ্টির মান (Nutrition Status)। আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, যারা ভাল খাদ্য পায় তাদের আর্সেনিকজনিত রোগগুলি কম প্রকটভাবে দেখা যায়, তাদের আর্সেনিকজনিত ক্ষতগুলি কম ফুটে ওঠে বা

আদৌ ফুটে ওঠে না। দেখা যায় গরিব এলাকায় আর্সেনিকের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে। আমাদের যাদবপুরে আর্সেনিকের পেশেন্ট আছে আমার পাশের বিভাগ Chemical Engineering-এ, এখানে Electronics Engineering-এর এক ডিপ্লোমা হোল্ডার সুশান্ত রায় মারা গেছে আর্সেনিকের জন্য Skin Cancer-এ। যাদবপুরে ডা: বিমল সেন বলে একজন ডাক্তার আছেন। তার বাড়ির জলে আর্সেনিক রয়েছে 0.30 mg/litre, ওঁরা গত কুড়ি বছর ধরে এই জল পান করছেন কিন্তু একমাত্র ডা: সেনের স্ত্রী ছাড়া বাকি কারো শরীরে আর্সেনিকের কোনো চিহ্ন নেই। অথচ এই 0.30 mg/litre মাত্রার আর্সেনিক দূষিত জল পান করে গ্রামে যারা গরিব এমন বহু লোকের গায়ে আর্সেনিকজনিত চর্মরোগের চিহ্ন ফুটে বেরোয়। গ্রামের দিকে পুষ্টির মান খারাপ হওয়ার জন্য গরিব গ্রামবাসীদের দেহে আর্সেনিক দূষণজনিত ক্ষতগুলি ফুটে ওঠে তাড়াতাড়ি।

**চেতনা পত্রিকা**

**প্র:** আপনাদের একটি সমীক্ষার রিপোর্টে আমরা দেখেছি একটা নির্দিষ্ট ব্লকে পাশাপাশি দুটো গ্রামে জলে আর্সেনিক দূষণের ফলে দুরকম প্রতিক্রিয়া ঘটেছে কারণ দুটি গ্রামের গ্রামবাসীদের পুষ্টির মান (Nutrition status) আলাদা। এক্ষেত্রে আমরা জানতে চাইছি পুষ্টির মধ্যে এরকম কোন ফ্যাক্টর কি চিহ্নিত হয়েছে যেটা মানুষের দেহে আর্সেনিকের আক্রমণটা ঠেকাতে পারে?

**ড. চক্রবর্তী**

**উ:** এ সম্পর্কে দেখা গেছে আর্সেনিক যখন দেহে ঢোকে তখন সেটা লিভার বা যকৃতে যায়। এই আর্সেনিক লিভারে methylation প্রক্রিয়ায় unine-এর মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়। লিভারে আর্সেনিক methylation-এর কাজ করে একটা organism, যা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে যদি শরীরে প্রয়োজনীয় মিথিওনিন (methionine) যৌগ উপস্থিত থাকে। শরীরে এই মিথিওনিনের পরিমাণ নির্ভর করে পুষ্টিকর খাবার, এ সবের প্রয়োজন আছে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য। এইজন্যই দেখা যায় শিশুদের ক্ষেত্রে আর্সেনিকজনিত ক্ষতগুলো শরীরে দশ/এগার বছর বয়সের আগে আসে না কারণ অল্পবয়সে লিভারে methylation-এর কাজটা ঠিকমত হয়। বয়স বেশি হয়ে গেলে শরীর অশক্ত হয়ে পড়ে, methylation প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এইসব কারণে বলা যায় পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর থেকে আর্সেনিক নিষ্কাশনের ক্ষমতাটা বেড়ে যায়।

**চেতনা পত্রিকা**

**প্র:** কিছু গণসংগঠন বর্তমানে জলে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে কাজ করছে এবং প্রয়োজনে জলে উপস্থিত আর্সেনিকের মাত্রা নিরূপণও করছে। তাদের কাছে কিছু kit থাকছে যার সাহায্যে মাত্রা নিরূপণের কাজটি করা হয়। আমাদের মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে যারা এই কাজে পারদর্শী নয় তারা কি kit ব্যবহার করে সত্যিসত্যিই সঠিক মাত্রাটি নিরূপণ করতে পারছে? এবং এই নিরূপণের ভিত্তিতে তারা কোন কোন টিউবওয়েলকে বিপদজনক ঘোষণা করার জন্য— এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? যে কেউ কি এই kit ব্যবহার করতে পারে?

**ড. চক্রবর্তী**

**উ:** এক্ষেত্রে আমি বলব যে কেউ এই kit ব্যবহার করতে পারে না? যে ব্যবহার করবে তার একটা ভাল ট্রেনিং দরকার। বিশেষ করে আর্সেনিকের মাত্রাটা যদি কম (lower level) থাকে। 0.20 mg/litre পর্যন্ত আর্সেনিক সহজেই ধরা যায় যদি kitটা ঠিক থাকে কিন্তু 0.10 mg/litre-এর নীচে প্রায় 70% ক্ষেত্রে মাত্রা নিরূপণে ত্রুটি থেকে যায়। এ বিষয়ে একটা ঘটনা বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বাংলাদেশের ফেলি জেলাতে kit দিয়ে পরীক্ষা করে ওরা আশিটা টিউবওয়েলের জলকে আর্সেনিক বিপদমুক্ত বলে ঘোষণা করে। এই টিউবওয়েলগুলি ওরা Replace করতে চায় গভীর নলকূপ (Deep Tubewell) দিয়ে। আমরা দেখলাম এর জন্য নলকূপ পিছু ৫০,০০০ টাকা করে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমরা তখন বলি, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমরা এইসব টিউবওয়েলের জল নিয়ে গিয়ে আমাদের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে আপনাদের রিপোর্ট দেব। তারপর আপনারা replacement-এর কথা চিন্তা করবেন। পরীক্ষাগারে এসে আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম ওরা যে আশিটা টিউবওয়েলের কথা বলেছেন তার মধ্যে পঞ্চাশটা টিউবওয়েলের জল বিপদমুক্ত এবং বাকি ত্রিশটা টিউবওয়েলের জল সহনশীল মাত্রার উপরে আর্সেনিক দূষিত। তাহলে বুঝতেই পারছেন ঠিক লোকের হাতে ঠিক kit না পড়লে— ঠিক মানে kit-এ যে জিনিসগুলো থাকে— ব্রোমাইড পেপার, সেটা যদি ঠিকমত সংরক্ষণ না করা হয়, অ্যাসিড, জিঙ্ক এগুলো যদি ঠিকমত না হয় তবে kit কিন্তু ঠিক result দেবে না। এজন্যই নিয়ম হল, kit ব্যবহারের আগে একটা জানা মাত্রার আর্সেনিক দ্রবণ নিয়ে তার মাত্রা নিরূপণ করা এবং এইভাবে দেখে নেওয়া kitটা সঠিক রিডিং দিচ্ছে কিনা। বহু জায়গায় আমরা দেখেছি— বিশেষতঃ বাংলাদেশে, যেহেতু সেখানে কাজটা অনেক দ্রুত হচ্ছে— কিছু কিছু টিউবওয়েলের জল পরীক্ষা করে তাকে আর্সেনিক দূষিত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে তবে সেটা আদৌ দূষিত নয়। বড় কাজে এটুকু ভুলচুক হয় তবে এই ভুলচুকের জন্য যে kitকে বন্ধ করে দেবে এমন কথা আমি বলছি না, বরং আমি বলব kitকে ব্যবহার করা হোক সেই level-এ যে level-এ kit মোটামুটি সঠিক result দেয়। এর নীচে হলে সেই নমুনাগুলো যেন অবশ্যই সঠিক ল্যাবরেটরি থেকে, ভাল ল্যাবরেটরি থেকে বা সরকারি ল্যাবরেটরি থেকে analysis করানো হয়।

**চেতনা পত্রিকা**

**প্র:** ইতিমধ্যেই আর্সেনিকযুক্ত জল পরিশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন জায়গায় আমরা জেনেছি যেমন ফিটকিরি দিয়ে একদিন রেখে পরদিন ছেঁকে নিয়ে ইত্যাদি। উৎস থেকেই জলকে যাতে আর্সেনিক মুক্ত করা যায় এমন চিন্তাভাবনাও চলছে। কিছুদিন আগে শিবপুর বি.ই. কলেজ উদ্ভাবিত অমল আর্সেনিক ফিল্টারের কথাও আমরা শুনেছি— এগুলো আপনার মতে কতটা কার্যকরী এবং ভবিষ্যতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য বাজারে আসার সম্ভাবনা আছে কি?

**ড. চক্রবর্তী**

**উ:** জল আর্সেনিক মুক্ত করার পদ্ধতিটা বহু বছর ধরে চিলি, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু আছে। দুটো পদ্ধতি আছে। জলে লোহার যৌগ অর্থাৎ ফেরাস সালফেট [$FeSo_4$], ফেরিক সালফেট [$Fe_2(So_4)_3$], ফেরিক ক্লোরাইড [$FeCl_3$] মিশিয়ে একটা জারক পদার্থ (Oxidising agent) দিয়ে সহ অধঃক্ষেপণ (Coprecipitation) করে আর্সেনিকটাকে বের করে দিতে পারি। এখানে অধঃক্ষেপ (precipitation)-টা দলবদ্ধ হয়ে নীচে পড়ে, সেটা আমরা যে কোন বাজারী ফিল্টার দিয়ে ছেঁকে নিতে পারি। এছাড়া অন্য পদ্ধতি

হল সক্রিয় অ্যালুমিনা (activate alumina) দিয়ে একই পদ্ধতিতে জলকে আর্সেনিক মুক্ত করা। আর্সেনিক দূর করাটা বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সঠিকভাবে লক্ষ্য রাখা ফিল্টারের কার্যকারিতা বজায় আছে কিনা, এর মাধ্যমে আর্সেনিক সত্যিসত্যিই দূর হয়েছে কিনা। এই দুটো প্রক্রিয়াতেই আর্সেনিক ছাড়া জলে উপস্থিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণগুলোও জল থেকে দূর হয়ে যায়, পরিশ্রুত জলটা প্রায় distilled water-এর মত হয়ে পড়ে। এই জল পানের উপযুক্ত কিনা সেটাই একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। আমরা এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার টিউবওয়েলের জল analysis করেছি। এর মধ্যে 47% কলের জল আর্সেনিক মুক্ত। এমন একটাও গ্রাম পাওয়া যাবে না (ব্যতিক্রম আছে) এখানে সমস্ত কলের জল দূষিত। যে টিউবওয়েলগুলো ভাল সেগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পারি এবং গ্রামের মানুষকে আমরা যদি সচেতন করতে পারি তাহলে ঐ ফিল্টার, ট্যাবলেট, আর্সেনিকমুক্ত কলের জল ব্যবহারের ব্যাপারে মানুষকে যদি বোঝাতে পারি তবে আসল কাজটা হবে।

গ্রামে সবচেয়ে মুশকিল হল এরা আর্সেনিক দূষণের সঠিক শুরুটা বোঝে না। খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার এদের পৃথিবী। বহু গ্রামে দেখেছি সাধারণ মানুষ, আর্সেনিক দূষণের ফলে মারাত্মক চর্মরোগের শিকার তবু তাদের এ নিয়ে নানা কুসংস্কার আছে। কেউ বলে আমার বাবার গায়ে ছিল, আমার গায়েও আছে আমার পূর্বজন্মের পাপের ফল, কেউ বলে মৃতদাহ করবার সময় 'শয়তান' আমার মুখে মূত্রত্যাগ করেছে তাই এমন হয়েছে, কারো কারো মনে, টিউবওয়েল ধরতে গিয়ে সাপের মাথায় আঘাত করেছিলাম তাই সাপ বিষ উদগীরণ করায় এমন হয়েছে—এই কুসংস্কার ও সঠিক চেতনার ভাবটাই আজকে গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বড় সংকট। দশ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে যে চেহারাটা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের ধারণা—জলের জন্য তাদের নিজেদের কিছু করতে হবে না, সরকার জল দেবে। এজন্য আপনারা গ্রামে গিয়ে দেখবেন পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা আছে এমন গ্রামের 90% কলের মাথা নেই। গলিত সোনার মত জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

একটা উদাহরণ দিই, মুর্শিদাবাদ থেকে রাত প্রায় এগারটার সময় ফিরছি, একদল লোক হঠাৎ আমাদের আটকে দিয়ে বলল দীর্ঘদিন হয়ে গেল আমাদেরই এই টিউবওয়েলটার মাথা ভেঙে গেছে, সরকার সারাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে আমরা এই দূষিত কলের জল পান করছি। আমরা তাদের বলার চেষ্টা করলাম, আপনাদের সন্তানরাও তো এই জল পান করছে। সন্তানের জন্য, তাদের মানুষ করার জন্য আপনারা তো কত পরিশ্রম করছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করছেন, আর আপনাদের সন্তানরা যে জল পান করলে সুস্থ থাকবে তার জন্য সবাই মিলে সামান্য কিছু চাঁদা তুলেও তো কলটাকে ঠিক করা যেত। এই হল প্রকৃত অবস্থা।

আজও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্কতা, সচেতনতা আদৌ নেই। এখনও ওরা যে কোন অন্ধকারে পড়ে আছে বিশ্বাস করা যায় না। আর দু-এক মাস আগের কথা বলছি, আমরা পুরো দল নিয়ে কাতলামারি গিয়েছি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন দুজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। দেখি গ্রামবাসীরা আমাদের কাছে আসছে না। আমরা অবাক হলাম, এতবড় একটা দল নিয়ে আমরা এসেছি গ্রামবাসীরা আসছে না কেন? জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা আসছ না কেন? তারা বলল, গাড়ি কোথায়? গাড়ি? হ্যাঁ, ভোটের সময় তোমরা গাড়ি করে ভোট দিতে নিয়ে যাবে আর এখন গাড়ি করে নিয়ে যাবে না। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপারটা কি জানেন, কাতলামারির পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। গ্রামবাসীরা সেই জল পান করে না। আমরা জিজ্ঞাসা করতে বলল, খাব কি! পাইপলাইন দিয়ে তো হলুদ জল বেরোয়, পচা পাট বেরোয়। আমরা বললাম, কেন? তার বলল, যখন যার দরকার পুকুর ভরানোর জন্য বা পাট পচানোর জন্য পাইপটাকে ফাটিয়ে দেয়। তারপর পুকুর ভরার পর সেই জলে পাট পচায় বা মাছ চাষ করে। পুকুর ভরার পর জল বরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে পাট পচা জল Supply-এর পাইপে ঢোকে। সবচেয়ে আশ্চর্য কাতলামারিতে দুটো গভীর নলকূপ আছে, সেগুলো চালানোর জন্য লোকও আছে। এগুলো সরাসরি সরকারের হাতে নয়, Contractor-কে Contract দেওয়া আছে। লোকে ইচ্ছামত কলের মাথাগুলো খুলে নিয়ে চলে যায়,Contractor হয়তো ন-মাসে ছ-মাসে কলের মাথাগুলো আবার ঠিক করে। Contractor-রা ওখানে থাকে না, থাকে কলকাতায়, সুতরাং কল বা পাইপ খারপ হওয়ার কত মাস বাদে যে সেটা ঠিক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে গ্রামের লোকেরা জেনেশুনে ঐ বিষ পান করে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতাটা আমরা ঢোকাতে পারিনি।

**চেতনা পত্রিকা**

**প্র:** সরকারের প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল তখন একটা প্রশ্ন না করে পারছি না, আপনার লেখাতেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার যথাসম্ভব কম করে ভূপৃষ্ঠের জল ব্যবহারের পরামর্শ আপনি দিয়েছেন। এছাড়া যেমন বোরো ধান চাষে যতটা জল ভূগর্ভ থেকে তোলা হয় তার মাত্র চার/পাঁচ শতাংশ চাষের কাজে ব্যয় হয়, বাকিটা অপচয়। আমাদের জিজ্ঞাসা আপনি ইদানিংকালে কোথাও দেখেছেন আমাদের দেশে Integrated water management-এর ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি ঘটেছে? আমাদের রাজ্য ছাড়াও অন্য কোনো রাজ্যে?

**ড. চক্রবর্তী**

**উ:** আমি বলব, পৃথিবীর মধ্যে ভগবানের আশীর্বাদ যদি জলে পেয়ে থাকে তবে এই দুটি দেশ পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ পেয়েছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু ভূপৃষ্ঠস্থ জলের পরিমাণ ১১৭০০ বর্গ মিটার। পৃথিবীতে এর থেকে বেশি ভূপৃষ্ঠস্থ জল খুব কম দেশে আছে। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু ভূপৃষ্ঠস্থ জলের পরিমাণ প্রায় ৭০০০/৮০০০ বর্গ মিটারের কাছাকাছি। পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রথম টিউবওয়েলটা বসল ১৯৬০ সালে তার আগে কিন্তু 'আল্লা ম্যাগ দে, আল্লা পানি দে' এই ছিল চাষিদের মনের কথা। আমাদের গানে রয়েছে, 'যদি হয় চৈতের কোণা, হালিয়া মধুর কানের সোনা', 'যদি হয় মাঘের শেষ, ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ'। মালদায় গিয়ে যদি গৌড়ের মঠের উপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন দেখবেন চারিদিকে শুধু দিঘি আর দিঘি। তখনকার রাজা বা জমিদাররা কিন্তু Water Shade Management-এর কথা জানত। শুধু তাই না, মহাভারতের যুগেও দেখা গেছে, যে সব লোক জলের সংরক্ষণ এবং বন্টন ঠিকমত করতে তাদের কর থেকে রেহাই দেওয়া হত। ১৯৬০ সালে যখন চাষের জন্য এবং পানের জন্য প্রথম গভীর নলকূপটা বসল পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় তখন মানুষ ছুটে পালিয়েছিল, শয়তানের জল উঠছে, শয়তানের জল উঠছে বলে। কারণ তাদের ধারণা ছিল ভগবান থাকে স্বর্গে এবং শয়তান থাকে নরকে। এদের অনেক করে বোঝানো হল, তোমরা এই জল পান কর, এই জলই তোমাদের

সুস্বাস্থ্য দেবে, তোমাদের খাদ্য দেবে। অবাক হবেন শুনলে এখন নদীয়ায় গিয়ে গ্রামে যদি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার যদি কোন ইচ্ছা পূরণ করতে চাই তুমি কি বলবে? বলে, বাবু আমার যেন নিজের একটা 'টিউকল' হয়। অথচ তাকিয়ে দেখুন এই নদীয়ায় চাঁদবিল, আর একটা সীমানা বাংলাদেশের সঙ্গে, বাসুদেব বিল, ব্যাঁটরা বিল—কত শত বিল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৪০০০ বর্গকিমি জলাভূমি। উত্তর চব্বিশ পরগণার দিকে তাকিয়ে দেখুন প্রায় সমস্ত জলাভূমি শুকিয়ে, কচুরিপানা ভর্তি হয়ে পড়ে আছে, মজে যাচ্ছে। দেগঙ্গার কাছে মরাপদ্মা বাইশ কিমি লম্বা। এর সংস্কারের কোন চেষ্টা হচ্ছে না। একটাই শব্দ রয়েছে Pump, যখনই প্রয়োজন চব্বিশ ঘন্টা, আটচল্লিশ ঘন্টা চালানো হচ্ছে। মজার কথা কি জানেন, মাটির তল থেকে আমরা যে জলটা তুলি তার ২ শতাংশ হয়তো চাষের কাজে লাগে, বাকি ৯৮ শতাংশ অপচয় হয়। ইজরায়েলে ওরা drip cultivation করে, গাছের গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে চাষ করে। নিজেদের দেশে অফুরন্ত জল নেই বলে চাষের জলও ওদের অন্য দেশের কাছ থেকে কিনতে হয়। তাতেও ওরা যে ফসল ফলায় তা আবার রপ্তানিও করে। আমাদের দেশে জলের সংরক্ষণ ও বন্টন নিয়ে চিন্তাভাবনা আজ পর্যন্ত সেভাবে চোখে পড়ে না। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কোন চেষ্টাই হয়নি। আজকে আমি একবারও আপনাদের প্রথমেই বলব না ভূগর্ভস্থ জল তুলো না। আমি বলব, আগে তোমার ভূপৃষ্ঠে যে জল আছে সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার কর, তারপর যদি প্রয়োজন হয় ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার কর। কিন্তু আমরা ঠিক উল্টোটা করছি। আমাদের কোন নিয়মকানুন নেই।

মুর্শিদাবাদের একটা বিরাট বিল আহিরণ বিল। ঐ বিলের পাশের মাঠেই দেখা যায় ভূগর্ভস্থ জল দিয়ে চাষ হচ্ছে যখন চাষিদের জিজ্ঞাসা করলাম, আহিরণ বিল থেকে জলটা নিচ্ছ না কেন, ওর বলল, পাইপের জন্য বেশি পয়সা লাগে হিসাব করে দেখা গেল সেই পাইপের খরচ একশ/দেড়শ টাকা বেশি। কিন্তু মাটির তলার জল তো মায়ের রক্তের মত, আরও মা কি জানেন, আমাদের মন্ত্রীরা কোন জায়গায় জল পরিশোধন ও বন্টনের জন্য কোনো পরিকল্পনা উদ্বোধন করবেন, সমস্ত খবরের কাগজগুলো ফলাও করে পুরো পাতা জুড়ে তা ছাপবে। সে পরিকল্পনা কবে বাস্তবায়িত হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল যে সাধারণ মানুষের সচেতনতার জন্য আর্সেনিকের বিষয় নিয়ে যদি এরকম একটা advertisement দেওয়া যায় তাহলে অনেক লোকে ব্যাপারটা জানতে পারবে। সচেতনও হবে এ বিষয়। আমি একটি নামী সংবাদপত্রে টেলিফোন করে জানতে চাইলাম এরকম একটা advertisement আমি করতে চাই এক পাতা জুড়ে। পরে জেনে হতাশ হলাম এরকম একটা advertisement-এর জন্য ছ-লাখ টাকা লাগবে। তখন আমি একটা লিখলাম PHED-র secretary-কে যে, আপনারা তো স্বাস্থ্য সম্পর্কে পাঁচটা/ছটা বিজ্ঞাপন দেন তাতে একটা বিজ্ঞাপন অন্তত দিন, তাতে লেখা থাকবে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে মানুষের কি করণীয়। এখন আপনাদের বলি কি করণীয়—

১) প্রতিটি গ্রামেই (জলে আর্সেনিক দূষণ আছে এমন গ্রামে) কিছু নিরাপদ টিউবওয়েল আছে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই টিউবওয়েলের মাথাগুলো সবুজ রং করি এবং খারাপ (আর্সেনিক দূষিত) টিউবওয়েলেরা মাথাগুলো লাল রং করি। এছাড়া ঐ যে টিভি, ভিডিও দেখানো হয় ঐভাবে গ্রামের লোকজনকে ডেকে প্রথমে একটা নামকরা হিন্দি সিনেমা দেখিয়ে তারপর আর্সেনিক দূষণের কথা এবং এর ফল কি হতে পারে তা দেখাতে হবে। আর যেটা দরকার সচেতনতাটা মায়েদের কানে ঢুকিয়ে দেওয়া। এটা যদি পারা যায় তাহলে আমরা অনেকটাই সফল হব কারণ মা-এর সচেতনতার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের শিশুরা এই আর্সেনিক দূষণের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমরা এমন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করি না যাতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করে। আর একটা সমস্যা হল ধারাবাহিক maintenance-এর অভাব। এই জন্যই অধিকাংশ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত যা সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এইজন্যই অত্যন্ত জরুরী। প্রতি তিনমাস অন্তর দূষণমুক্ত টিউবওয়েলের জলও পরীক্ষা করে দেখতে হবে আর্সেনিকের মাত্রা কি পরিবর্তন হয়েছে বা আদৌ পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

২) আর্সেনিকের ওষুধ কিছু বেরোয়নি, এর একমাত্র ওষুধ আর্সেনিকমুক্ত জল। দ্বিতীয় যেটা দরকার সেটা হল ভাল খদ্যে। আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে মাছ-মাংস না খেলে কষ্ট হয় না। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে শাকসবজির অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও দেখা যায় গ্রামের মানুষের শরীরে Vitamin-B-র deficiency। আসলে আমরা শাকসবজি খাই না আর খেলেও তার রান্নার যা পদ্ধতি তাতে খাদ্যের খাদ্যগুণ প্রায় পুরোটাই নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সহজলভ্য ফল আমলকী, বাতাবিলেবু, কামরাঙা, সয়াবীন, কমলা—শীতের সময় মটরশুঁটি, বীন, বীট, গাজর—এ সবের খাদ্যগুলোর কোন তুলনা হয় না।

৩) দৈহিক পরিশ্রম করতে হবে। আর্সেনিক দূষণজনিত প্রতিক্রিয়া যাদের দেহে সদ্য প্রকাশ পেয়েছে তাদের ওষুধ হিসাবে ভিটামিন দিতে পারি।

৪) গ্রামে গ্রামে মানুষকে সচেতন করতে হবে। আজকে ভারতবর্ষের সাতাশটা রাজ্যের মধ্যে ষোলটি রাজ্যে ফ্লুরোসিন, পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিকোসিস, মধ্যপ্রদেশেও জলে আর্সেনিক দূষণের খবর পাওয়া গেছে। আমাদের ধারণা অদূর ভবিষ্যতেই আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, ক্যাডমিয়াম মার্কারী দূষণ হবে। ভূগর্ভস্থ জল প্রকৃতির রক্ত, একে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। ভীষ্ম যখন শরশয্যায়, মারা যাবার আগে একটু জল চাইলেন। তখন কেউ সোনার পাত্রে, কেউ রূপার পাত্রে, কেউ বা মাটির পাত্রে জল নিয়ে এল। ভীষ্ম অর্জুনের দিকে তাকালে অর্জুন বরুণাস্ত্র মেরে মাটির তলা থেকে জল তুললেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করালেন দাদা, মাটির নীচে যখন এত ভাল জলই পাওয়া যায় তখন আমার মা-বোনেরা কেন ক্রোশ ক্রোশ দূরে জল আনতে যায়? আমরা তো এই জলই ব্যবহার করতে পারি। তখন যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন— ভাই, এই জল প্রকৃতির সমতা বজায় রাখার জন্য, একে তুমি যেনতেন প্রকারে ব্যবহার করতে পারবে না। যীশুখ্রিস্টের জন্মের বারশ বছর আগে মহাভারতের যুগের লোকেরা যা জানত আমরা তা জানি না। তখন জলের জন্য মানুষের উৎসাহ ছিল, তারা সেভাবে চিন্তা করত। দিঘি খনন হবে, যতদূর অবধি ঢাকের আওয়াজ যাবে ততদূর অবধি। দিঘির পাড় তুলে দেওয়া হত যাতে জল দূষিত না হয়। আমরা মানুষকে শুধু শিক্ষিত করলেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে সচেতন করতে হবে আর এজন্য বিভিন্ন কাজে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

*সাক্ষাৎকার : মানস প্রতিম দাস*
*অনুলিখন : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়*

সোমা বসু

# জল : খাচ্ছি, কিন্তু ভাবছি কি?

*জল-ই জীবন'— জল ছাড়া চলে না আমাদের একমুহূর্ত! শরীর সুস্থ রাখতে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ জল পান করতেই হবে। আর এই 'বিশুদ্ধতার' প্যাঁচে পড়ে আমরা পকেটের কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচ করে বেছে নিচ্ছি বোতলবন্দি জল। কখনো বা ঘরে বসাচ্ছি আর ও ফিল্টার মেশিন। কিন্তু, এইসব জল-ই ডেকে আনতে পারে নানারকমের শারীরিক সমস্যা। কেন এবং কিভাবে? লিখছেন ফিজিওলস্টিট ড. সোমা বসু।*

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জল নিয়ে আমাদের বিপন্নতা বেড়েই চলেছে প্রতিদিন। এই বিপন্নতা একটি বহুমাত্রিক পরিবেশগত সমস্যা। জল নিয়ে বিপন্নতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিবেশের সবকটি দিক আর কিছু মানুষের সীমাহীন লোভ। বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত, জল ছাড়া চলে না আমাদের— তাইতো জলের আরেক নাম জীবন। আমরা যে জলে প্রাণ বাঁচাই অর্থাৎ পানীয় জল— তা মিষ্টি জল। এই মিষ্টি জল দু ধরনের— পৃষ্ঠ জল বা সারফেস ওয়াটার (নদী, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা ইত্যাদির জল) আর ভূগর্ভস্থ জল বা গ্রাউন্ড ওয়াটার। সব মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে একশো ভাগ জলের মধ্যে আছে ২.৪ শতাংশ মিষ্টি জল— এর মধ্যে ভূগর্ভস্থ অর্থাৎ ভৌমজল মাত্র শূন্য দশমিক সাত শতাংশ (০.৭%)। এই মিষ্টি জলেই চলে সবকিছু— শুধু তো প্রাণ বাঁচাতে পান করা নয়, চাষ থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন। তাইতো এইটুকু জল নিয়ে পৃথিবী জুড়ে কাড়াকাড়ি। আগে মানুষ সারফেস ওয়াটারেই কাজ চালিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতায় মানুষ 'মাটির বুকের ভিতর বন্দি যে জল', তা টেনে বের করে নিচ্ছে। শুধু তো চাষে নয়, বোতল বন্দি জলের রমরমা এখন সর্বত্র। আমাদের ছোটবেলায় শহরে বাতাসের মতো জলও বিনে পয়সায় পাওয়া যেত। কিন্তু কিছুটা বড়ো হতেই দেখলাম জলের জন্য পয়সা লাগছে। প্রথমে রাস্তাঘাটে বিদেশিদের মতো জলের বোতল কিনে খাওয়া শুরু হল, এরপর এল ঘরে-ঘরে ফিল্টার মেশিন, একটি বিখ্যাত কোম্পানির মেশিন-ঘরের দেওয়ালে ঝুললেই স্বাস্থ্য এবং 'স্ট্যাটাস'! এখন অবশ্য একটি নয়, অনেক কোম্পানি আর বছর-বছর নির্দিষ্ট টাকার গুনগার (হাসিমুখে) আমাদের 'শহুরে বঙ্গ জীবনের অঙ্গ'। বাংলা প্রবাদ— 'জলের দামে বিক্রি' মানে বোঝাত নামমাত্র মূল্য। এখন কিন্তু জলের দাম মোটেও কম নয়, লিটার প্রতি ন্যূনতম কুড়ি টাকা! উপায় নেই, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তাই-ই সই! প্রত্যন্ত গ্রামেও বিক্রি হচ্ছে বোতল বন্দি জল। রাস্তাঘাটে জল খেতে হলে আমাদের ভরসা প্লাস্টিক বোতলে বন্দি জল। এছাড়া আর উপায়-ই বা কি? সারাদিনে যাদের ঘুরে বেড়াতে হয়, দূরদূরান্ত থেকে যাঁরা যাতায়াত করেন অথবা বেড়াতে গিয়ে প্রত্যেকেই আমরা ভরসা করি এই বোতলবন্দি জলেই। কিন্তু আমরা অনেকেই এই প্লাস্টিক বোতল বন্দি জলের বিপদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নই। ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে ডেকে আনছি নানা অসুখের বিপদ।

প্রথমেই বলি জলের এত দামের জন্যই অনেক সময় পকেট বাঁচাতে কম জল পান করি, যা শরীরের পক্ষে ভালো নয়।

জলবাহিত রোগ প্রতিরোধে প্লাস্টিক বোতল বন্দি জল ব্যবহার করি ঠিকই কিন্তু কোম্পানিগুলো যে সঠিক মানে জীবাণুমুক্ত জল সরবরাহ করছে, তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আমাদের জানার উপায় নেই। বাজারে হাজির হচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রতিদিন-ই নতুন-নতুন কোম্পানি।

প্লাস্টিক বোতল বন্দি জল যদি রোদে থেকে গরম হয়ে যায়, তবে সেই জলে মেশে নানা ধরনের টক্সিন পদার্থ। নানান গবেষণায় দেখা গেছে এই বিষাক্ত পদার্থগুলো নানা রকমের ক্যান্সার সৃষ্টি করে, যার মধ্যে অন্যতম হল স্তন ক্যান্সার।

সাধারণ জলের (পি.এইচ ৬.৫-৭.৮) তুলনায় বোতলবন্দি জল অম্লধর্মী। নানান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে দীর্ঘদিন ধরে অম্লধর্মী জল পান করলে তা আমাদের শরীরে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা ডেকে আনে। প্রথমেই আক্রান্ত হয় পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র অর্থাৎ আমাদের পরিপাকতন্ত্র— যার পরিণতিতে দেখা দেয় হজমের গন্ডগোল। এছাড়াও অনেকদিন ধরে অম্লধর্মী জল পান করলে দেখা দেয় কিডনির অসুখ।

আমাদের দেশে কারখানায় উৎপাদিত হওয়ার পরে বোতলবন্দি হয়ে রাস্তা আর দোকান ঘুরে আমাদের হাতে এসে পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় দুই থেকে তিন মাস। ততদিনে বিসফেনল-এ নামে একটি রাসায়নিক জলে এমন মাত্রায় মেশে, যা আমাদের দেহের ইস্ট্রোজেন হরমোনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, যোগসূত্র তৈরি হয় ডায়াবেটিস, ওবেসিটি-র মতো রোগগুলোর সঙ্গে।

*আর. ও. ওয়াটার ফিল্টার পদ্ধতি*

আজকাল এসেছে 'আর. ও. ওয়াটার'। রাস্তাঘাটে হামেশাই কান পাতলে শোনা যাচ্ছে— 'এই তো বাড়িতে একটা আর. ও. বসালাম। জলেই তো স্বাস্থ্য।' পেছনে কতটা সচেতনতা আর কতটা বিজ্ঞাপনী মোহ, বোঝা দায়। আসলে কি এই 'আর. ও. ওয়াটার'? কখন দরকার হয় এই ধরনের জলের? সবার জন্য কি ভালো এই জল?

'আর.ও. ওয়াটার' হল একধরণের জল, যাতে দ্রবীভূত নানা ধরনের খনিজ লবণ প্রায় থাকে না বললেই চলে (লো বা ডিমিনারালাইজড জল) —যা রিভার্স অসমোসিস অর্থাৎ বিপরীত বা উল্টোমুখী অভিস্রবণ পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটি কেমন? খুব সহজ করে বললে একটা অর্ধভেদ্য (সেমিপারমিয়েবল) পর্দার মধ্যে দিয়ে বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবাহিত করা হয়। ফলে খুব ভালোভাবে জীবাণু, দ্রবীভূত লবণ দূর করে। এই পদ্ধতিতে জল জীবাণুমুক্ত, পরিস্রুত হয় বেশি। জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার জল, তাই শরীরের পক্ষে ভালো। তবে একইসঙ্গে এই জলে

দ্রবীভূত লবণের পরিমাণও কমে যায়। সাধারণ ফিল্টারের জল বা ট্যাপ কলের জলের থেকে এতে টি ডি এস (টোটাল ডিসলড সলিড) অর্থাৎ দ্রবীভূত লবণ, রাসায়নিক পদার্থ, পলল/অধঃক্ষেপ ইত্যাদি থাকে কম। এই টি ডি এস পানীয় জলের স্বাদে, গন্ধে অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর.ও. পদ্ধতিতে এগুলোকে জল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়, তাতে জলের স্বাদ বাড়ে। অনেকেই তা পছন্দ করেন। আর এখান থেকেই শুরু হয় গন্ডগোলের। এই দ্রবীভূত লবণের মধ্যে বেশ কিছু থাকে, যারা আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আর.ও. ওয়াটারকে 'নিরাপদ পানীয় জল' বলে ছাড়পত্র দিলেও কম টি ডি এস-র ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। বিশেষ করে যাঁদের কিডনির অসুখ বা মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি আছে। এই সমস্ত মানুষদের প্রতিদিন আর.ও. ওয়াটার না খাওয়াই ভালো।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উপদেশ হল পানীয় জল থেকে সম্পূর্ণ খনিজ লবণ সরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, কারণ এগুলো মানুষের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি আমাদের শরীরের এন্টিটক্সিক ক্যাপাসিটি কমিয়ে দেয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ লবণগুলো তাদের এন্টিটক্সিক ক্যাপাসিটির মাধ্যমে লেড, ক্যাডমিয়ামের মতো দূষিত পদার্থের শোষণে বাধা দেয়। মানুষ এতদিন জল আর খাবারের মাধ্যমেই তা পেয়ে আসত। এছাড়াও আর.ও. জলে ফ্লোরাইড থাকেই না, এটি দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

দ্য ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্যান্ডার্স (বি.আই.এস.) বলেছে প্রতিলিটার জলে ৫০০ মিলিগ্রাম টি.ডি.এস. হল গ্রহণযোগ্য মাত্রা। বেশি থাকলে কী হয়? জলের স্বাদ বদলে যায়, এমনকি অতিরিক্ত দ্রবীভূত লবণের কারণে দেখা দেয় পেটের গন্ডগোল (গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ইরিটেশন)। আবার, পানীয় জলে টি.ডি.এস. মাত্রা শূন্য বা আশি মিলিগ্রাম প্রতিলিটার-এর নিচেও গ্রহণযোগ্য নয়— যা কিনা আর.ও. ওয়াটার-এ থাকে।

<৩০০ = খুব ভালো (এক্সসেলেন্ট)
৩০০ - ৬০০ = ভালো (গুড)
৬০০ - ৯০০ = ঠিক (ফেয়ার)
৯০০ - ১২০০ = খারাপ (পুয়র)
>১২০০ = গ্রহণযোগ্য নয় এবং পানের অনুপযুক্ত
............................................................
**জলে টি.ডি.এস. মাত্রা মিলিগ্রাম/লিটার**

ভারতের নানা শহরের জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পানীয় জলের টি.ডি.এস.-র মাত্রা সাধারণত ২৫০ থেকে ৩০০-র মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। গঙ্গানদীর জলে এই মাত্রা ১৮০-১৯০। সাধারণত জলে ৫০০-র নিচে টি.ডি.এস. থাকলে আর. ও. মেশিন না লাগানোই ভালো।

আমরা যখন বাড়িতে আর.ও. মেশিন বসাই তখন কি টি.ডি.এস. পরীক্ষা করাই? কোম্পানি তাদের মেশিন বিক্রির স্বার্থে যা বলে, তাই বিশ্বাস করি। আর.ও. মেশিন কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে খুব চলছে। এই সব এলাকায় পানীয় জল হিসেবে গঙ্গানদীর জল-ই ব্যবহৃত হয়। কাজেই এই জলের জন্য আর.ও. কতটা সঠিক? তর্কের খাতিরে মেনে যদি নেওয়াই যায় যে পানীয় জল সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করার জন্য-ই আর.ও. ওয়াটার মেশিন, তবে মনে রাখতে হবে এই জলে কিন্তু দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ খুব কম। কতটা কম? বাইরের কোন জল পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন। আর.ও. ওয়াটারে দ্রবীভূত খনিজ

*আর. ও. ওয়াটার ক্যান্ডেল*

লবণ সাধারণত ১৫০ মিলিগ্রাম/লিটার থাকলে, তবেই তাকে আদর্শ বলা যাবে। যদি কোন জলে তা ৫০-র নিচে থাকে, তবে পানীয় জল হিসেবে গৃহীত হবে না। কারণ এতে প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ থাকবে না। আপনার বাড়িতে আর.ও. থাকলে, অবশ্যই সে জলের টি.ডি.এস. মাত্রা দেখে নেবেন, কখনোই তা যেন ৮০-র নিচে না নামে। কারণ, জলেই স্বাস্থ্য ভেবে যে জল পান করছেন দিনের শেষে সেই জল-ই না হয়ে দাঁড়ায় অস্বাস্থ্যের কারণ! আর পরীক্ষার ঝামেলা না নিতে পারলে, খাদ্যতালিকার দিকে সতর্ক নজর রাখতেই হবে। যদি একজন সুস্থ মানুষ খাদ্যের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে মিনারেল আর ইলেক্ট্রোলাইট গ্রহণ করেন, তবে খুব একটা অসুবিধে হয় না। কিন্তু, ফাস্টফুড/জাঙ্কফুডে অভ্যস্ত আমাদের পাতে যথেষ্ট মিনারেল/ইলেক্ট্রোলাইট থাকে তো?

এছাড়াও আর.ও. মেশিনে প্রচুর জল নষ্ট হয়— যা আগামী দিনের জলসঙ্কটের প্রেক্ষাপটে মোটেই সুখকর নয়। যদি জলে টি.ডি.এস.-এর মাত্রা ১২০০-র বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে সাধারণ পিউরিফায়ারগুলো এত উচ্চমাত্রা কমিয়ে গ্রহণযোগ্য করতে সক্ষম হয় না। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতি ভালো কাজ করে।

সবশেষে বলি প্লাস্টিকের বোতলবন্দি জলের মতোই আর.ও. ওয়াটারও অম্লধর্মী। দীর্ঘদিন ধরে এই অম্লধর্মী জলপানের বিপদ সম্বন্ধে আগেই বলেছি। তাই, একটু ভাবুন। প্রয়োজনে তো জল কিনতেই হবে, তবে বিকল্প নিয়ে চিন্তা করুন। প্লাস্টিক বোতল বন্দি জল দোকান থেকে না কিনে, যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে নিয়ে যান। মাত্র দশ বছর আগেও এক-দু লিটার জল আমাদের বাড়তি বোঝা হয়ে ওঠেনি। তাই, মানসিকতা বদলানো খুব দরকার। আজকাল বেশিরভাগ কাজের জায়গায় ভালো মানের জল থাকে। সরকার যে জল সরবরাহ করে তার মান উন্নত হলেই সমস্যা মেটে অনেকটাই। এর জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও সচেতনতা আমাদেরই প্রদান করতে হবে। সুস্থ থাকুন—ভালো থাকুন।

**তথ্যসূত্র**


1. National Institute of Hydrology (Roorkee) - A TDS report of R O Water. Journal of Indian Medical Association. August, 2023.
2. WHO–A health bulletin on using of R O system, 2005.
3. Down to Earth, 21 March, 2024.
4. https//m.Economicties.com, 27 March, 2024.

সায়ন ভট্টাচার্য

# গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণ এবং ধানগাছে আর্সেনিকের সঞ্চয় : ক্ষতিকর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

*আর্সেনিক একটি ধাতুকল্প (metalloid), অর্থাৎ এর মধ্যে ধাতু ও অধাতু উভয়ের বৈশিষ্ট্যই আছে। প্রকৃতিতে আর্সেনিকের ২০০-এর বেশি খনিজ রূপ দেখা যায়, যার মধ্যে আর্সেনাইট, আর্সেনাইড, আর্সেনেট, মিথাইল্যাটেড (মিথাইল গ্রুপ যুক্ত) আর্সেনিক, মৌলিক আর্সেনিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের কারণ মূলত ভূতাত্ত্বিক। এছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ যেমন খনিজ দ্রব্য উত্তোলন, কৃষিকাজ, কলকারখানার উৎপাদন প্রভৃতির ফলেও আর্সেনিক দূষণ ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে আর্সেনিক দূষণের সমস্যা রয়েছে, যেমন বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, মেক্সিকো, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, কোরিয়া, নেপাল, কম্বোডিয়া, পোল্যান্ড, বলিভিয়া, রোমানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি প্রভৃতি। এর মধ্যে অনেক দেশের ভূগর্ভস্থ জলে প্রাপ্ত আর্সেনিকের পরিমাণ WHO-র অনুমোদিত সীমা (10 ppb) থেকে অনেক বেশি। পৃথিবীর ১০০ টিরও বেশি দেশে প্রায় ২০ কোটিরও বেশি মানুষ আর্সেনিকের কবলে আক্রান্ত।*

### গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম আর্সেনিক কবলিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের প্রায় ৭.৫ কোটি মানুষ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৫ কোটি মানুষ যে জল ব্যবহার করছে তাতে আর্সেনিকের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য সীমার (10 ppb) চেয়ে বেশি। ভারতের প্রায় ১৭টি রাজ্যের মানুষ আর্সেনিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বসবাস করেন এবং আর্সেনিকযুক্ত জল গৃহস্থালি, কৃষিকাজ এবং কলকারখানার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করেন।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে আর্সেনিকের উৎসের সন্ধানে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা হয়েছে এবং অনেক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক গবেষকের মত অনুসারে ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পাইরাইট (pyrite) আকরিক বাতাসের সংস্পর্শে এসে জারিত হয়, ফলে পাইরাইটের সাথে যুক্ত আর্সেনিক মুক্ত হয়ে জলে মেশে। এছাড়াও দেখা যায় গাঙ্গেয় উপত্যকার ভূস্তরে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের ফলে লোহার যৌগ (ferric hydroxide) বিজারিত হয়, এবং ferric hydroxide-এর উপরে যুক্ত থাকা আর্সেনিক মুক্ত হয়। এই পদ্ধতিতে আর্সেনিক +5 যোজ্যতা স্তর থেকে +3 যোজ্যতা স্তরে আসে, যার গতিশীলতা (mobility) অপেক্ষাকৃত বেশি।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল, তাই গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে সেচের জল উত্তোলনের জন্য হাজার হাজার গভীর এবং অগভীর নলকূপ খনন করা হয়। গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ আর্সেনিক জলে নিঃসৃত হয়। ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পাইরাইট আকরিক বাতাসের সংস্পর্শে এসে জারিত হয়, ফলে আর্সেনিক নির্গত হয়ে জলে মেশে। নলকূপ ও পাম্প ব্যবহারের মাধ্যমে আর্সেনিকযুক্ত জল উঠে আসে মাটির উপর। এই জল কৃষি জমিতে ব্যবহারের ফলে মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সেই আর্সেনিক সঞ্চিত হয় উৎপাদিত খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য ফসলে। জল ও উৎপাদিত খাদ্যশস্যে আর্সেনিক দূষণের কারণে গাঙ্গেয় উপত্যকার অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিভিন্ন স্থানে চাষের জমিতে আর্সেনিকযুক্ত ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করার ফলে চাষের জমির উপরের স্তরে আর্সেনিক ক্রমাগত জমা হচ্ছে। আর্সেনিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ব্যবহৃত প্রভূত পরিমাণ জলে পর্যাপ্ত আর্সেনিক থাকে, যা ধীরে ধীরে চাষের জমির উপর জমা হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে জল বাষ্পীভূত হতে পারে, কিন্তু জলে মিশ্রিত আর্সেনিক মাটির উপরে থেকে যায়। ফলে গাঙ্গেয় বদ্বীপ উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে চাষের জমির উপর আর্সেনিকের সঞ্চয় দেখা যায়। বাংলাদেশে আর্সেনিক যুক্ত জমির ৮০ শতাংশই ব্যবহার করা হয় চাষের জন্য। গাঙ্গেয় উপত্যকায় উৎপাদিত বিভিন্ন শস্য যেমন বার্লি, ডাল জাতীয় উদ্ভিদ, ভুট্টা, ধান প্রভৃতি আর্সেনিককে মাটি থেকে শোষণ করে নিজ দেহে সঞ্চয় করতে পারে। এগুলোর মধ্যে ধান গাছ প্রভূত পরিমাণ আর্সেনিককে মাটি থেকে মূলের মাধ্যমে শোষণ করতে সক্ষম, যার একাংশ জমা হয় শস্যে। সারা পৃথিবীতে ৩০০ কোটিরও বেশি মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান, তাই ধানে আর্সেনিকের সঞ্চয় সারা পৃথিবীর বহু মানুষের খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে বিঘ্নিত করতে পারে।

দীর্ঘকাল আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলে মানব শরীরে আর্সেনিকোসিস হয়, যা আসলে আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়ার বিভিন্ন লক্ষণের সমন্বয়। মানুষের শরীরে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা, পায়ের শিরায় উপশিরায় সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা বৃদ্ধি, ক্যান্সার, এবং প্রজননগত সমস্যা প্রভৃতি দেখা যায়; যকৃত, কিডনি, ব্লাডার প্রভৃতির ক্যান্সার হতে পারে। এছাড়াও স্নায়ুতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, সংবহনতন্ত্র এবং জননতন্ত্রের উপর প্রভাব পড়তে পারে। হাতের তালু এবং পায়ের পাতা শক্ত ও খসখসে হয়ে যায়। শরীরের ত্বকের বিভিন্ন স্থানে, যেমন হাতে, পায়ে, বুকে এবং পিঠে কালচে বর্ণের ছোপ এবং গুটি দেখা যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এর ফলে নানা ধরণের অর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা যায়, যেমন কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় পরিবারের উপার্জনে প্রভাব পড়ে, মেয়েদের অসুস্থতার পাশাপাশি বিয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

### গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে উৎপাদিত ধানে আর্সেনিকের সঞ্চয়

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে চাষের জমিতে জল জমে থাকা অবস্থায় ধান চাষ করা হয়। চাষের জমি জলে ডুবে থাকলে মাটিতে অবাত অবস্থা (anaerobic condition) তৈরি হয়। এই অবস্থায় মাটিতে আর্সেনিক সাধারণত As (III) বা আর্সেনাইট অবস্থায় থাকে, মানে আর্সেনিক যোজ্যতা স্তর তিন (৩)-এ থাকে। এই আর্সেনাইট অপেক্ষাকৃত বেশি

বিষাক্ত, এবং অপেক্ষাকৃত সহজে মূলের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। যেহেতু আর্সেনিকের সাথে সিলিকনের রাসায়নিক প্রকৃতির মিল রয়েছে, তাই ধান গাছে অবস্থিত সিলিকন পরিবহণ চ্যানেলগুলোর (silicon transport channels) মাধ্যমে আর্সেনিক ধান গাছে প্রবেশ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে আর্সেনিক গাছের মূল দিয়ে উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে, এবং ক্রমান্বয়ে কান্ড, শাখা, পাতা ও বীজে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে আর্সেনিকের বিস্তারের এই প্রক্রিয়াকে ট্রানসলোকেশন (Translocation) বলা হয়। সাধারণত দেখা যায়, ধান গাছের মূল অঞ্চলে আর্সেনিকের সঞ্চয় সবচেয়ে বেশি, এবং গাছের উচ্চতার সঙ্গে আর্সেনিকের সঞ্চয় ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। অর্থাৎ মূল অংশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আর্সেনিক জমা হয় এবং ধানগাছের ডগার দিকে ও বীজে বা শীষে সবচেয়ে কম আর্সেনিক জমা হয়। চাষের জমিতে এবং উৎপাদিত ধানে আর্সেনিকের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মাটির প্রকৃতি, সেচের পদ্ধতি, জলে আর্সেনিকের পরিমাণ, জলের উৎসের গভীরতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, চাষের অঞ্চল, চাষের পদ্ধতি, ধানের প্রজাতি বা ভ্যারাইটি এবং চালের প্রক্রিয়াকরণ (processing)-এর উপর।

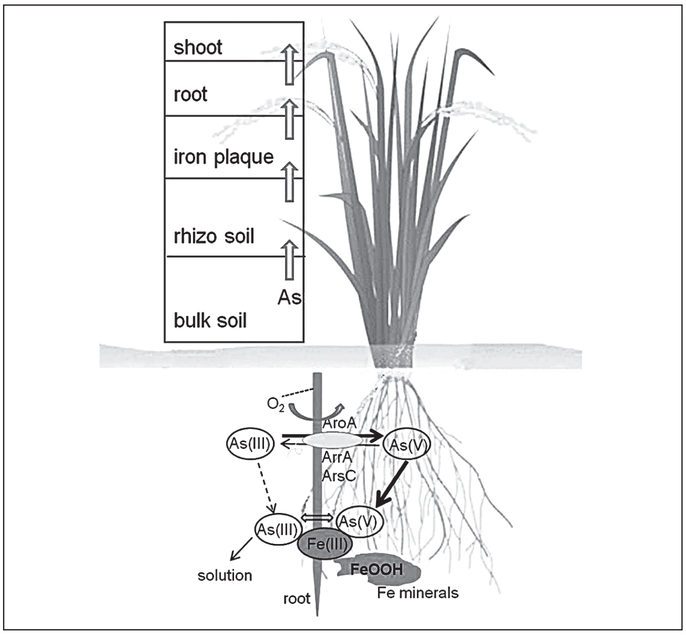


*কৃষিজমি থেকে ধানগাছের বিভিন্ন অংশে আর্সেনিকের সঞ্চয় (ছবির সূত্র : Jia et al., 2014)*

গাঙ্গেয় বদ্বীপ এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধান চাষ করা হয়, যা এখানকার মানুষদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। যেহেতু গাঙ্গেয় উপত্যকায় ধান চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়, তাই এই জলে উপস্থিত আর্সেনিক জমা হয় ধান গাছের মধ্যে। ধান গাছের মূল অঞ্চলে (Rhizosphere) আয়রন হাইড্রোক্সাইডের (iron hydroxide) বিভিন্ন যৌগ উপস্থিত থাকে, যা মূল অঞ্চলে লৌহগুটি (iron plaque) তৈরি করে। এই লৌহগুটি মাটির আর্সেনিকের সঙ্গে একত্রিত হয়, ফলে ধান গাছের মূল অঞ্চলে আর্সেনিকের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গাঙ্গেয় উপত্যকার বদ্বীপ অঞ্চলে পানীয় জলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে মোট আর্সেনিকের ১৩% প্রবেশ করতে পারে, যেখানে রান্না করা চালের মাধ্যমে মোট আর্সেনিকের ৫৬% মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। দেখা গেছে, কাঁচা চালের তুলনায় রান্না করা ভাতে আর্সেনিকের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। কারণ আর্সেনিক অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ভাত রান্নায় যে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা হয়, তাতে আর্সেনিক থাকে। উপরন্তু চালের মধ্যেও সঞ্চিত থাকে আর্সেনিক। ফলে রান্না করা ভাতে আর্সেনিকের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। যদি ভাত রান্নার পরে ভাতের ফ্যান ফেলে দেওয়া না হয়, তাহলে আর্সেনিকের পরিমাণ ফ্যান সমেত ভাতে অনেক বেশি থাকে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাত রান্নার পদ্ধতির উপর নির্ভর করেও রান্না করা ভাতে আর্সেনিকের পরিমাণের তারতম্য হয়।

আমন ধানের তুলনায় বোরো ধানের মধ্যে অনেক বেশি আর্সেনিক সঞ্চিত হতে পারে, কারণ বোরো ধান উৎপাদনে অনেক বেশি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, চালের উপরের স্তরে আর্সেনিক জমা হয়। ফলে ছাঁটাই করা ধানের উপরের আবরণ সরিয়ে দিলে আর্সেনিকের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

আর্সেনিকের সঞ্চয়ের ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আর্সেনিক ধান গাছে সালোকসংশ্লেষের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এবং ক্লোরোফিলের মাত্রা কমিয়ে দেয়, ফলে ধানের উৎপাদনের উপর প্রভাব পড়তে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে আমন ধানের বীজের উৎপাদন রীতিমত ব্যাহত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজের উপরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আর্সেনিক বীজের অঙ্কুরোদগমকে প্রভাবিত করে; সদ্য নির্গত মূল ও কাণ্ডের দৈর্ঘ্যের উপরেও আর্সেনিকের প্রভাব দেখা যায়। উদ্ভিদে উপস্থিত বিভিন্ন উৎসেচক, যেমন peroxidase, catalase প্রভৃতির পরিমাণও বাড়তে পারে আর্সেনিকের প্রভাবে। আর্সেনিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

মানব শরীরের পুষ্টির সঙ্গে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার সরাসরি যোগাযোগ আছে। যে সমস্ত মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, তাদের ওপর আর্সেনিকের বিষক্রিয়া আরো প্রকটভাবে দেখা যায়। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলে শরীরের ওজন কমে যেতে পারে এবং শিশুদের মস্তিষ্কের গঠন এবং বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। আর্সেনিক অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা সেই অঞ্চলে উৎপাদিত খাদ্যশস্য এবং শাকসবজির উপর নির্ভরশীল থাকে। ফলে শহরে বসবাসকারী মানুষদের তুলনায় তাদের শরীরে অনেক বেশিমাত্রায় আর্সেনিক প্রবেশ করতে পারে। ভারত ও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বহু মানুষ দারিদ্র্যের কবলে আক্রান্ত, ফলে তারা পর্যাপ্ত খাদ্য ও যথাযথ পুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে। এর ফলে এই মানুষদের আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

## ধান থেকে খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিকের বিস্তার ও সঞ্চয়

গাঙ্গেয় উপত্যকার মাটিতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের মধ্যে আর্সেনিক সঞ্চিত হওয়ার পর সেই আর্সেনিক ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে খাদ্যশৃঙ্খলে। ধান গাছের মূল ও কাণ্ডে আর্সেনিকের সঞ্চয় অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। আর্সেনিক যুক্ত শুকনো কান্ড বা খড় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে তা থেকে আর্সেনিকের যৌগ বেরিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খড় বা বিচুলি গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর্সেনিক অধ্যুষিত অঞ্চলে চাষ করা এই খড়ে আর্সেনিক সঞ্চিত থাকে, ফলে খড়ের মাধ্যমে গরুর দেহে আর্সেনিক প্রবেশ করতে পারে। এছাড়াও যেহেতু আর্সেনিক অধ্যুষিত অঞ্চলে গবাদি পশুরা

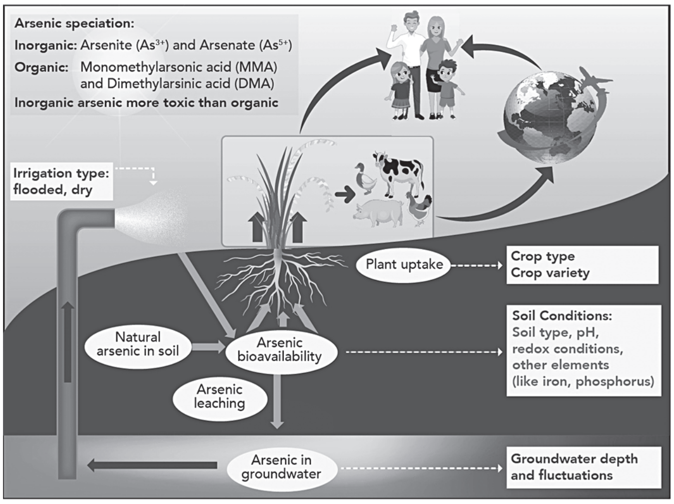


*ভূগর্ভস্থ জল থেকে চাষের জমি, ধানসহ উৎপাদিত ফসল ও খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিকের বিস্তার ও সঞ্চয় (ছবির সূত্র : Alam et al., 2021)*

আর্সেনিক যুক্ত জল পান করে, ফলে জল এবং খাদ্য উভয়ের মাধ্যমেই গরু এবং অন্যান্য গবাদি পশুর শরীরে আর্সেনিক জমা হতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশের কিছু স্থানে গরুর দুধে এবং মাংসে আর্সেনিক সঞ্চিত হচ্ছে। যেহেতু শিশুরা গরুর দুধ পান করে, তাই ছোটবেলা থেকেই গাঙ্গেয় উপত্যকায় বড় হয়ে উঠতে থাকা বাচ্চাদের শরীরে আর্সেনিকের সঞ্চয় এবং বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের গ্রামাঞ্চলে গরুর গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে বানিয়ে তা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঘুঁটে জ্বালানোর ফলেও আর্সেনিক নির্গত হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

চাল থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়। যদি সেই চাল আর্সেনিক অধ্যুষিত এলাকায় উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং সেই চালে আর্সেনিক সঞ্চিত থাকে, তাহলে চাল থেকে তৈরি করা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে (নুডুলস, বেবি ফুড, বিস্কিট প্রভৃতিতে) আর্সেনিক থাকতে পারে। এসব খাদ্যের যথাযথ পরীক্ষা না করে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসবাস করা মানুষের শরীরে খাদ্যের মাধ্যমে আর্সেনিক প্রবেশ করতে পারে। এভাবেই একটি আঞ্চলিক সমস্যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং বিশাল আকার নিতে পারে। ফলে আর্সেনিকের সমস্যা শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ জলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে তা ছড়িয়ে পড়ছে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে ধান গাছে ও খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় :

**১. বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও মাটির উপরের জলের ব্যবহার :** ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত উত্তোলন ও ব্যবহার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। মাটির তলার জলের বদলে মাটির উপরের জল ব্যবহার করলে আর্সেনিকের সমস্যা কমানো সম্ভব। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও ব্যবহার বাড়ানো দরকার, যাতে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমানো যায়। বৃষ্টির জলকে সঠিক পদ্ধতিতে সঞ্চয় করে সেচের কাজে ধান সহ অন্যান্য শস্যের ক্ষেতে ব্যবহার করলে ধানে আর্সেনিকের সঞ্চয় কমানো সম্ভব। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন নদনদী, নালা, খাল এবং জলাভূমি। এই জলের উৎসগুলো থেকে জলের যথাযথ ব্যবহারের দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করা প্রয়োজন। ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা (watershed management)-র মাধ্যমে জলসম্পদের সঙ্গে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রে সমন্বয় ও সুস্থিতি আনা প্রয়োজন, যাতে সামগ্রিকভাবে পরিবেশের প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

**২. ধান চাষের পদ্ধতির পরিবর্তন :** ধান গাছের চালে যখন আর্সেনিক জমা হয়, তা সহজে চাল থেকে অপসারণ করা যায় না। যদিও বেশি জলে ভাত ফোটানোর পর ফ্যান ফেলে দিলে আর্সেনিক অনেকটা বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি ভালো গুণাগুণসম্পন্ন ভিটামিনও বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ধানচাষের পদ্ধতির পরিবর্তন করেও ধানে আর্সেনিকের সঞ্চয় কমানো যেতে পারে। যেমন গাঙ্গেয় উপত্যকায় মূলত অবাত অবস্থায় (anaerobic condition) ধান চাষ হয়, এই পদ্ধতিতে গাছের গোড়ায় জল দাঁড়িয়ে থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পদ্ধতিতে গাছে আর্সেনিকের সঞ্চয় অপেক্ষাকৃত বেশি হতে পারে। এই পদ্ধতির পরিবর্তে যদি অপেক্ষাকৃত শুকনো মাটিতে (যে মাটিতে সারাক্ষণ জল দাঁড়িয়ে থাকে না) সবাত অবস্থায় (aerobic condition) ধান চাষ করা যায়, তাহলে ধানগাছে আর্সেনিকের সঞ্চয় কমানো সম্ভব। পাশাপাশি, সেচ ব্যবস্থায় ক্রমাগত জলের প্রবাহ বজায় না রেখে যদি স্প্রিঙ্কলার পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে সেচের জল উপর থেকে ছড়ানো যায়, তাহলেও ধান সহ অন্যান্য খাদ্যশস্যে আর্সেনিকের সঞ্চয় কিছুটা কমানো সম্ভব।

**৩. ধানের উপযুক্ত ভ্যারাইটির ব্যবহার :** ধান এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের সেইসব প্রজাতিগুলোর চাষ বাড়ানো দরকার, যেগুলোতে আর্সেনিকের সঞ্চয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। ভারতে সম্প্রতি CSIR এর লাখনৌ শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্র মিলিতভাবে তৈরি করেছে আর্সেনিকমুক্ত ধানের ভ্যারাইটি 'মুক্তশ্রী' (CN-1794-2-CSIR-NBRI)। গবেষকেরা জানিয়েছেন যে, আর্সেনিক যুক্ত মাটিতে বা জলে চাষ করলেও এই ধানে আর্সেনিক সঞ্চিত হয় না। জিনের প্রতিস্থাপন ঘটিয়ে এই নতুন ধান তৈরি করা হয়েছে। এই ধানের ক্ষেত্রে গাছের মূল অংশ থেকেই আর্সেনিকের প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বর্ধমানের বেশ কিছু স্থানে 'মুক্তশ্রী' ধান সফলভাবে উৎপাদন করা হয়েছে। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ধানের এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের এরকম আরো নতুন ভ্যারাইটি তৈরি করা প্রয়োজন, যার ফলে বিভিন্ন ফসলে আর্সেনিকের সঞ্চয় কমানো সম্ভব হবে।

**৪. জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ (বায়োরেমেডিয়েশন ও ফাইটোরেমিডিয়েশন):** আমাদের পরিবেশে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে, যারা আর্সেনিকের উপস্থিতিকে সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। এই অভিযোজনের ক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরে তৈরি হয়েছে এইসব ব্যাকটেরিয়ার জিনে। তারা আর্সেনিকের বিভিন্ন যোজ্যতা স্তরের পরিবর্তনও করতে পারে। যোজ্যতা স্তরের এই পরিবর্তনের ফলে পরিবেশে আর্সেনিকের গতিশীলতা এবং বিস্তারের পার্থক্য ঘটে। ব্যাকটেরিয়ার এই জিনগুলোকে আলাদা (isolate) করে ব্যবহার করলে আর্সেনিকের বিস্তার কমানো সম্ভব। জিন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই জিনগুলোকে অন্যান্য উদ্ভিদেও ঢোকানো যায়, যার ফলে সেই উদ্ভিদগুলোতে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পাবে এবং তারা আর্সেনিককে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে বা আর্সেনিকের গতিশীলতা কমাতে পারবে। ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের মাধ্যমে দূষক পদার্থের অপসারণের পদ্ধতিকে বলা হয় মাইক্রোবিয়াল রেমেডিয়েশন (microbial remediation)। পাশাপাশি ফাইটোরেমেডিয়েশন (Phytoremediation) এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে দূষক পদার্থ অপসারণের জন্য কিছু বিশেষ উদ্ভিদকে ব্যবহার করা হয়। যেসব উদ্ভিদ আর্সেনিককে

অতিরিক্ত হারে শোষণ করতে সক্ষম, সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং তাদের জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুসন্ধান করা ও প্রয়োগ করার মাধ্যমে আর্সেনিক দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। উদাহরস্বরূপ, কোনো একটি বিশেষ উদ্ভিদ, যেটা আর্সেনিককে শোষণ করতে সক্ষম, তা চাষের জমিতে রোপন করা হলে আর্সেনিক মাটি থেকে গাছে এসে সঞ্চিত হবে। ফলে মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ কমে যাবে। এরপর সেই উদ্ভিদকে সরিয়ে ফেলে সেই জমিতে ধান বা অন্য কোনো খাদ্যশস্য চাষ করা হলে জমি থেকে খাদ্যশস্যে আর্সেনিক কম সঞ্চিত হবে। Pteris vittata নামক ফার্ন গাছ নিজের দেহে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক সঞ্চয় করতে পারে; বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ, যেমন কচুরিপানা (Eichhornia sp), টোপাপোনা (Pistia sp) প্রভৃতি ও আর্সেনিক এবং অন্যান্য দূষক যেমন ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, লেড ইত্যাদিকে শোষণ ও সঞ্চয় করতে সক্ষম। এইসব উদ্ভিদ ব্যবহার করে আর্সেনিককে জল ও মাটি থেকে অপসারণ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা Pseudomonas নামক ব্যাকটেরিয়া আর Chorella নামক শৈবালের প্রয়োগে ধান গাছে আর্সেনিকের সঞ্চয় প্রায় ৮০% কমাতে পেরেছেন। আরেকটি গবেষণায় ধান গাছের rhizosphere-এ Ochrobactrum tritici As5 নামক ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে দেখা গেছে ধানগাছে আর্সেনিকের সঞ্চয় ও বিষক্রিয়া কমেছে। তবে Phytoremediation পদ্ধতিতে কোনো উদ্ভিদ ব্যবহার করলে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ উদ্ভিদগুলো আর্সেনিক শোষণ করার পর যদি কোনো প্রাণী (বিশেষত গবাদি পশু) সেই উদ্ভিদকে খেয়ে ফেলে, তাহলে প্রচুর পরিমাণ আর্সেনিক একসঙ্গে সেই প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

৫. **ন্যানোপ্রযুক্তির প্রয়োগ :** সাম্প্রতিক গবেষণায় ন্যানোপ্রযুক্তির প্রয়োগ পরিবেশের অনেক সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। ন্যানো-কণা প্রয়োগ করে ধান গাছে আর্সেনিকের সঞ্চয় কমানো সম্ভব। Nano-TiO2 জাতীয় টাইটানিয়াম ন্যানো-কণা প্রয়োগ করে ধান গাছে আর্সেনিকের সঞ্চয় ৪০% থেকে ৯০% অবধি কমানো সম্ভব হয়েছে। এই ন্যানো-কণাগুলো আর্সেনিককে অধিক পরিমাণে অধিশোষণ করে আবদ্ধ করতে সক্ষম, ফলে উদ্ভিদে আর্সেনিকের সঞ্চয় কম হয়। তবে এই বিষয়ে গবেষণা এখনো প্রাথমিক স্তরে রয়েছে।

## উপসংহার

আর্সেনিক দূষণের সমস্যা শুধু জল বা মাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ছড়িয়ে আছে খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন অংশে। ভারত এবং বাংলাদেশে আর্সেনিকের সমস্যাকে প্রতিহত করার জন্য এত উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও এখনো অবধি গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্সেনিক দূষণের কোনো দীর্ঘস্থায়ী সমাধান পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে ধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্যে আর্সেনিকের সঞ্চয় খুবই চিন্তার বিষয়। যেহেতু ভারত ও বাংলাদেশের আর্সেনিক অধ্যুষিত অঞ্চলে উৎপাদিত চাল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করা হয়, তাই আর্সেনিক দূষণের এলাকায় বসবাস না করেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আরো দৃঢ় নিয়ম প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং রপ্তানি করা খাদ্যদ্রব্যে আর্সেনিকের পরিমাণ পরীক্ষা করা উচিত। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মাধ্যমে জলের মূল উৎসকে বদলে দেওয়া সম্ভব, যার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার এবং আর্সেনিকের দূষণ ক্রমান্বয়ে কমানো সম্ভব হবে। জল এবং মাটিতে আর্সেনিক দূষণের পাশাপাশি খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিকের গতিপ্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা এবং বায়োটেকনোলজি ও নানোটেকনোলোজির গবেষণার মাধ্যমে আর্সেনিকের বিস্তারকে রোধ করা অত্যন্ত জরুরি। গাঙ্গেয় উপত্যকায় ধান ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে এবং খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিকের বিস্তার নিয়ে আরো বিশদে গবেষণা প্রয়োজন এবং খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিকের বিস্তার রোধ করতে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলোকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্সেনিকের সমস্যাকে প্রতিহত করার জন্য ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশকেই আরো উদ্যোগী হতে হবে এবং যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

## তথ্যসূত্র


1. Alam, M.F., Villholth, K.G., & Podgorski, J.E., 2021. Human arsenic exposure risk via crop consumption and global trade from groundwater-irrigated areas. Environ. Res. Lett., 16, 124013.
2. Bhattacharya, S., Gupta, K., Debnath, S., Ghosh, U.C., Chattopadhyay, D., Mukhopadhyay, A., 2012. Arsenic bioaccumulation in rice and edible plants and subsequent transmission through food chain in Bengal basin : a review of the perspectives for environmental health. Toxicol. Environ. Chem. 94, 429-441.
3. Bhattacharya, S., Sharma, P., Mitra, S., Mallick, I., Ghosh, A., 2021. Arsenic uptake and bioaccumulation in plants : a review on remediation and socio-economic perspective in Southeast Asia. Environ. Nanotechnol., Monit. Manag. 15, 100430.
4. Bhattacharya, S., Talukdar, A., Sengupta, S., Das, T., Dey, A., Gupta, K., Dutta, N., 2023. Arsenic contaminated water remediation: A state-of-the-art review in synchrony with sustainable development Goals. Groundw. Sustain Dev. 23, 101000.
5. Biswas, J.K., Warke, M., Datta, R., Sarkar, D., 2020. Is Arsenic in Rice a Major Human Health Concern? Curr. Pollution. Rep. 6, 37-42.
6. Chakraborty, M., Mukherjee, A., Ahmed, K.M., 2015. A review of groundwater arsenic in the Bengal Basin, Bangladesh and India: from source to sink. Curr. Pollut. Rep. 1, 220-247.
7. CSIR. Arsenic free rice - Muktashree. Retrieved from: https://www.csir.res.in/csirtechnologyshowcase/arsenic-free-rice-muktashree, retrieved on March 26, 2022.
8. Jia, Y., Huang, H., Chen, Z., Zhu, Y.G., 2014. Arsenic uptake by rice is influenced by microbe-mediated arsenic redox changes in the rhizosphere. Environ. Sci. Technol. 48, 1001-1007.
9. Mitra A., Chatterjee, S., Gupta, D.K., 2020. Environmental arsenic exposure and human health risks. In : Fares, A., Singh, S.K. (eds) Arsenic water resources contamination: Challenges and solutions. Springer Nature, Germany.
10. Singh, R., Singh, S., Parihar, P., Singh, V.P., Prasad, S.M., 2015. Arsenic contamination, consequences and remediation techniques : a review. Ecotoxicol. Environ. Saf. 112, 247-270.
11. Srivastava, S., Shukla, A., Rajput, V.D., Kumar, K., Minkina, T., Mandzhieva, S., Shmaraeva, A., Suprasanna, P., 2021. Arsenic Remediation through Sustainable Phytoremediation Approaches. Minerals. 11, 936.
12. Yadav, M.K., Saidulu, D., Gupta, A.K., Ghosal, P.S., Mukherjee, A., 2021. Status and management of arsenic pollution in groundwater : a comprehensive appraisal of recent global scenario, human health impacts, sustainable field-scale treatment technologies. J. Environ. Chem. Eng. 9, 105203.

তপন দাস

# সবুজ রসায়নে জলের ভূমিকা

*বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান দিয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু কিছু নতুন উৎপাদন মানেই তার সব ভালো, এমনটা নাও হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে রসায়নের পরীক্ষাগার বা শিল্প কারখানায় অজলজ দ্রাবকের ব্যবহার বিষিয়ে তুলেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিষের ছোবলে আক্রান্ত হচ্ছে কর্মরত ব্যক্তিও। সেখানে সবুজ দ্রাবক হিসেবে জলের ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা খুঁজছে জলকে কীভাবে আরও বেশী করে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সেই সঙ্গে দ্রাবক হিসেবে জলের উৎকর্ষতা কীভাবে বাড়ানো যায়, বিজ্ঞানীরা খুঁজছেন সেই সমস্ত দিক গুলো। বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন বেশ কিছু বিকল্প পথ। পরিবেশ বান্ধব শিল্প কারখানা গড়ে তোলার নতুন দিশা। সবুজ দ্রাবক হিসেবে সেখানে জল নিতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।*

সব কিছুতেই বিজ্ঞানকে খুঁজে বেড়ানো মানুষের অভাব নেই। কিন্তু বিজ্ঞানী যা বানিয়েছেন তার সবই ভালো এবং টেকসই এইরকম ধারণা থাকাও সব সময় ঠিক নয়। এর স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গেলে মনে পড়ে রেচেল কারসনের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই, মাঠেঘাটে যুদ্ধ করতে যাওয়া সৈনিকেরা টাইফাস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হতে লাগলো, অনেকের মৃত্যুও ঘটলো। টাইফাস, ম্যালেরিয়া বাহিত মশা বিনাশ করতে কীটনাশক হিসেবে কেমিক্যাল ডি ডি টি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তখন ডি ডি টি তারা মাঠেঘাটে স্প্রে করতে শুরু করে। এর ফলে তাদের আক্রান্তের সংখ্যা কমতে থাকে এবং মৃত্যুর হারও কমে যায়। এত জনপ্রিয় হল কীটনাশকটি যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো ডি ডি টি তৈরি করতে শুরু করল। কিন্তু যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল। পুঁজিপতিরা তখন এই টন-টন ডিডিটি কি ফেলে দেবে? শুরু হল কীটনাশক (ইনসেক্টিসাইড) হিসেবে কৃষিক্ষেত্রে এর ব্যবহার। ভালই চলছিল, ব্যাঘাত ঘটালেন কিন্তু রেচেল কারসন নামে এক মহিলা, মার্কিন বায়োলজিস্ট। তিনি লক্ষ্য করলেন বসন্তকালে তাঁর বাগানে অনেক ধরনের পাখির ডাক শোনা যেত। হঠাৎই সেই ডাক আর নেই এবং তিনি আবিষ্কার করলেন ডি ডি টি যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের ফলে তার ক্ষতিকর প্রভাবে পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে উনি একটি বই লিখলেন যার নাম 'সাইলেন্ট স্প্রিং'। রাতারাতি হইচই পড়ে যায় এবং প্রতিটা এডিশন মিলিয়ন কপি বিক্রি হয় বইটির। তৎকালীন মার্কিন প্রসিডেন্ট জন এফ কেনেডির নজরে এল বিষয়টা এবং তখন তারই তৈরি করা একটি সাব-কমিটি রেচেলকে ডেকে পাঠান। তখন সেনেটে গিয়ে লেখিকা প্রমাণ করলেন যে তার বইয়ের তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। উনি বললেন ডিডিটির যথেচ্ছ ব্যবহার ক্ষতি করছে জীব-জগতের। এমনকি মাতৃ দুগ্ধেও ডিডিটির সন্ধান পাওয়া গেল। এই সময় থেকেই মানুষ বুঝতে শিখল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অপরিহার্য হলেও সবকিছু তার ভাল নয়। সন্তানসম্ভবা মহিলাদের মর্নিং-সিকনেস রোধ করবে বলে ঔষধ বানালে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ বলার আগে কিন্তু দেখতে হবে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে কিনা। বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে গিয়ে ভাবতে হবে চেরনোবিল নিউক্লিয়ার ডিজস্টার যেন কোন ভাবেই না ঘটে।

বেশ কিছু ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরাও খুঁজছিলেন বিকল্প পথ। যে পথে বিপজ্জনক পদার্থের ব্যবহার এবং উৎপাদনকে হ্রাস বা নির্মূল করা সম্ভব। এই নতুন প্রযুক্তির নাম সবুজ রসায়ন। সবুজ রসায়ন, রসায়নের পরিবেশগত প্রভাবের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখে, যার মধ্যে রয়েছে অ-চিরাচরিত সম্পদের ব্যবহার কমানো এবং দূষণ প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্তিগত পদ্ধতি। কার্যত সবুজ রসায়ন এমন একটি গবেষণাদর্শন, যার উদ্দেশ্য এমন রাসায়নিক পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা যাতে শিল্পজাত বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং শক্তির অপচয় হ্রাস পায়। এই রসায়নের অঙ্কুরোদ্গম আরও কিছুটা পূর্বে ঘটলেও আনুষ্ঠানিক রূপ পায় ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী পল টি অ্যানাস্তাস এবং জন সি ওয়ারনার সবুজ রসায়নের ১২টি মূলমন্ত্র প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে। বর্জ্য প্রতিরোধ, অনুঘটকের ব্যবহার, দুর্ঘটনা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ-এর মত ১২টি প্রস্তাব। এর মধ্যে একটি ছিল নিরাপদ দ্রাবকের ব্যবহার।

দ্রাবক কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থ সমূহকে যে তরলে নিমজ্জিত করা হয়। জলকে সার্বজনীন দ্রাবক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ জলে কঠিন, তরল, গ্যাসীয় এবং অন্য বিচারে আয়নীয় বা তড়িৎযোজী যৌগ ও সমযোজী যৌগ প্রায় সকলেই জলে দ্রবীভূত হতে পারে। জল একটি ধ্রুবীয় অণু, জলের দ্বিমেরু ভ্রামকের মান এবং পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মান বেশি হওয়ায় মেরু অণু পৃথক করতে ব্যবহার করা হয়। সবুজ রসায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য সবুজ দ্রাবকের বিকাশ। পরীক্ষাগার কিংবা শিল্প কারখানায় কর্মরত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে হয় ঠিক তেমনি ভাবনায় থাকে বাহ্যিক পরিবেশ। অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আছে যেগুলো জল বাদে অন্য কোন দ্রাবকের উপস্থিতিতে করা হয়ে থাকে, ফলস্বরূপ ক্ষতিকারক প্রভাব গিয়ে পড়ে কর্মরত ব্যক্তি ও পরিবেশের উপর। সেক্ষেত্রে জল একটি উৎকৃষ্ট সবুজ দ্রাবক।

মিশ্রণের উপাদান সনাক্তকরণ এবং পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি হল রঙের চিত্রলেখা (ক্রোমাটোগ্রাফি)। এই পদ্ধতিতে দুটি দশা (ফেজ) থাকে একটি চলমান অপরটি স্থির। চলমান দশা সাধারণত তরল বা গ্যাসীয় হয়। ক্রোমাটোগ্রাফিতে, সবুজ দ্রাবকগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা রাসায়নিকগুলিকে পৃথক এবং বিশুদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয় এবং ঐতিহ্যগত দ্রাবকগুলি বিষাক্ত, ব্যয়বহুল এবং নিষ্পত্তি করা কঠিন হতে পারে। ক্রোমাটোগ্রাফির জন্য সবুজ রসায়ন দ্রাবকগুলি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত দ্রাবকগুলির তুলনায় আরও পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ হতে উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এগুলি সাধারণত পুনর্নবীকরণযোগ্য সংস্থান থেকে তৈরি করা হয়, কম বিষাক্ততা রয়েছে এবং জৈবভঙ্গুর (বায়োডিগ্রেডেবল)। ক্রোমাটোগ্রাফির জন্য সবুজ দ্রাবকের কিছু উদাহরণের মধ্যে রয়েছে জল, সুপারক্রিটিক্যাল কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং আয়নিক তরল। এই দ্রাবকগুলি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত দ্রাবকগুলির

তুলনায় অনেক সুবিধা প্রদান করে। যেমন জল সস্তা এবং প্রচুর, এবং মেরু অণু পৃথক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সুপারক্রিটিকাল কার্বন -ডাই-অক্সাইড বিষাক্ত নয় এবং সহজেই পুনর্ব্যবহারযোগ্য। আয়নিক তরল বহুমুখী এবং যৌগগুলির বিস্তৃত পরিসরকে আলাদা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ক্রোমাটোগ্রাফিতে হেক্সেন, টলুইনের মত ক্ষতিকারক দ্রাবকগুলোর পরিবর্তে জলের মত সবুজ দ্রাবক ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে।

যদি মনে করা হয় একটি ভেষজ উদ্ভিদের পাতা, বাকল অথবা শেকড় থেকে ভেষজ উপাদান গুলিকে নির্জাস রূপে বের করে আনতে হবে, তাহলে পাতা, বাকল বা শেকড় জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলেই সেসবে উপস্থিত সমস্ত উপাদান জলে চলে আসবে এরকমটা নিশ্চিতরূপে না ভাবাই ভালো। সাধারণত অজলজ দ্রাবকের উপস্থিতিতে দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতিতে বিশেষ ফ্লাস্কে বেশ কিছু সময় ধরে পাতন করা হয়ে থাকে। অজলজ দ্রাবক ব্যবহারই দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতিতে গুরুত্ব বেশি পেয়েছিল একসময়। কিন্তু জলের নিজস্ব গুণাবলী ছাড়াও এর দ্রাবক হিসেবে সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আজকাল পাতন প্রণালীতে দ্রাবক হিসেবে জল ব্যবহারে জোর দিয়েছেন রসায়নের গবেষকেরা। দ্রাবক হিসেবে জলের সক্ষমতা বাড়াতে কোন কৌশল প্রয়োগ করা হবে সেটা নির্ভর করে যে পদার্থকে নিষ্কাশন করা হবে তার উপর।

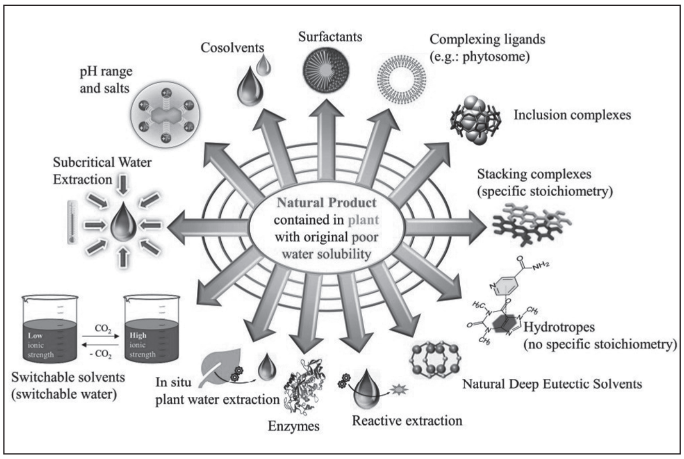


*সবুজ দ্রাবক হিসেবে জল*

জল একটি প্রশম দ্রাবক। অ্যাসিড-ক্ষার তীব্রতা পরিমাপের pH স্কেলে জলের ক্ষেত্রে এর মান ৭। পাতন প্রণালীতে দ্রাবক হিসেবে জল ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে কিছু পদার্থকে নিষ্কাশন করা যায় না। সেক্ষেত্রে দ্রাবকের pH এর পরিবর্তন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। অ্যান্থসায়ানিন ও ডেলফিডিন এর মত কিছু যৌগ প্রাকৃতিক উৎস থেকে নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আম্লিক মাধ্যমের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে জলের আম্লিকতা বাড়াতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশানো যেতে পারে। ঠিক তেমনি ক্ষারীয় মাধ্যম করতে গেলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মেশানো হয়। তবে বেশ কিছু লবন মিশিয়েও জলের pH এর পরিবর্তন করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সোডিয়াম কার্বনেট পিএইচ (pH) বাড়াতে এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পিএইচ (pH) কমাতে ব্যবহার করা হয়। উদ্ভিজ কোন উৎস থেকে বেশ কিছু উপাদান নিষ্কাশনে লবন মিশিয়ে জলকে উপযুক্ত দ্রাবকে পরিণত করা বা জলের দ্রাবক ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো সবুজ রসায়নের একটি নতুন দিশা। লবনের উপস্থিতি জলের pH এর পরিবর্তন করার পাশাপাশি জলের আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। লবন জলে বিশ্লেষিত হয়ে জলের পৃষ্ঠ তলের টান, আধান ঘনত্ব, স্থির তড়িৎ জনিত আকর্ষণ বল সহ বেশ কিছু ধর্মের পরিবর্তন করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিজ উৎসে উপস্থিত যৌগ সমুহের জৈবিক গঠনের বা পর্দার স্থায়িত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিষ্কাশনে সহযোগী হয়ে ওঠে। ফলে লবনের উপস্থিতিতে জল হয়ে যায় একটি একটি উত্তম সবুজ দ্রাবক।

দ্রবণ রসায়নে বহুল প্রচলিত একটি উক্তি 'like dissolves like' অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সেটি কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হতে সক্ষম। যেমন জল একটি ধ্রুবীয় দ্রাবক এবং জলের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মান (ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবক ~৭৮), তাই সেখানে অধ্রুবীয় পদার্থের দ্রবীভূত হওয়ার প্রবণতা কম। প্রাকৃতিক উৎসে উপস্থিত অনেকেই জলে দ্রবিভূত হয় না, সেক্ষেত্রে প্রয়োজন পরে জলের সাথে সহযোগী দ্রাবকের। যেমন ৪০ ডিগ্রি সেলিসিয়াস উষ্ণতায় জলের সাথে ৫০% ইথাইল অ্যালকোহল মেশালে দ্রবণের ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবক কমে ~৪৫ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রোজমেরি থেকে রোজমেরিনিক অ্যাসিড নিষ্কাশনে সুবিধাজনক ফলাফল পাওয়া যায়। প্রসঙ্গ ক্রমে মনে রাখতে হবে, এসব ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক দ্রাবকের অনুপাত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জামা কাপড় কাচতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি কাপড়ে লেগে থাকা তৈলাক্ত পদার্থ শুধু জলে পরিষ্কার হয় না কিন্তু সাবান জলে ঠিক পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে সাবান এখানে পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থের ভূমিকা গ্রহণ করে। সাবানের অনুর গঠনে দুটি অংশের একটি জলাকর্ষী আয়নীয় অংশ এবং অপর অংশে থাকে জল বিদ্বেশী অংশ। ময়লার উপর চলে সাড়াশি আক্রমণ আর দ্রবণের এরূপ গঠনকে বলে মিসেল। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে কাপড়ে লেগে থাকা ময়লা কাপড় থেকে বেরিয়ে আসে। তবে এক্ষেত্রে সাবানের ন্যূনতম পরিমাণ অবশ্যই প্রয়োজন। এই ধারণটিকে পাতন পদ্ধিতেও কাজে লাগানো যায়। অনেক দ্রাবক নিস্কাশন পদ্ধতিতে জলের পৃষ্ঠটান পরিবর্তন করার জন্য জলে পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থের উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক উপাদান নিস্কাশন সম্ভব হয়। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত এরূপ এজেন্ট হলো ট্রিটন এক্স- ১০০ (Triton X-100), টুইন ২০ ও টুইন ৮০ (Tween 20 or Tween 80), ডকুসেট (docusate), ট্রাই মিথাইল টেটরাডেসাইল অ্যামোনিয়াম ব্রোমাইড ও লেসিথিন (trimethyltetradecylammonium bromide or lecithin)।

## মিসেলের গঠন

মিসেল উৎপাদন না করেও কোন কোন উপাদানের ক্ষেত্রে জটিল যৌগ গঠনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক যৌগের দ্রবনীয়তা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন জটিল আকৃতির ফাইটোসোম (phytosomes) যা প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে ফসফোলিপিডের সংযোগে উৎপন্ন জটিল অবস্থা সহজেই জলে দ্রাব্য। এসব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান নিষ্কাশনে সহায়ক হয়ে উঠে জটিল যৌগ উৎপাদনকারী পদার্থগুলো। কয়েকটি এরূপ পদার্থের মধ্যে

ইথিলিনডাইঅ্যামিন টেটরাঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (ethylenediaminetetra-acetic acid or EDTA), ইথিলিনডাই অ্যামিন ডাইসাক্সিনেট (ethylenediamine disuccinate), সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid), ডাইহাইড্রোমিরিসেটিন (dihydromyricetin) উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র জল যেখানে কিছু প্রাকৃতিক পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারছিল না সেখানে জলের দ্রাবকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে সেইসব পদার্থ।

আবার অতিক্ষুদ্র অণুজীব থেকে প্রাপ্ত উৎসেচক প্রাকৃতিক কোন উৎস থেকে কিছু যৌগ পৃথকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এরূপ সবুজ নিষ্কাশন পদ্ধতিতে হাইড্রোলেজ বা লাইসেজ-এর মত এনজাইম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পলি অসম্পৃক্ত (আনস্যাচুরাটেড) ফ্যাটি অ্যাসিড কোন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পৃথকীকরণে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত জলে এনজাইম মেশানো হয়। ফলে শুধু জল ব্যবহারে যেখানে পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারছিল না সেখানে এনজাইম সহযোগী হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছে।

যেখানে জল নিজেই একটি উত্তম দ্রাবক, তার মধ্যে আবার বিভিন্ন রকমের পদার্থের সংযোগে এর দ্রাবকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, রসায়নের এক নতুন দিগন্ত মেলে ধরেছেন বিজ্ঞানীরা। রাসায়নিক বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ায় মূল উৎপাদনের সাথে উৎপন্ন উপজাত দ্রব্য, ব্যবহৃত দ্রাবকের প্রভাবে পরিবেশের জল মাটি বায়ু সবই দূষণের ভারে ঘাড় নুইয়ে দাড়িয়ে আছে। এই অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে কিছুটা হলেও এই সবুজ প্রযুক্তি কার্যকরী হবে। অন্যদিকে সবুজ দ্রাবক হিসেবে জলের ব্যবহারে রসায়নাগারে কর্মরত ব্যক্তিটিও স্বাচ্ছন্দে বাতাস টানতে সাহস পাবে। সবুজ রসায়ন কী দিল মানবজাতিকে? আইবুপ্রুফেন ব্যাথানাশক (অ্যানালজেসিক) ঔষধ সবুজ রসায়নের নীতি মেনে শিল্প উৎপাদন একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ওষুধটি পেয়েছে গ্রিন কেমিস্ট্রি অ্যাওয়ার্ড। আজকের ভিনিগার, ভিটামিন ডি-থ্রি এখন সবুজ রসায়নের নিয়ম মেনে তেরি হয়। প্লাস্টিক বায়োডিগ্রেডেবল নয়। মাটিতে মেশে এমন বেশ কিছু রাবার তৈরি হচ্ছে, যা বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক অর্থাৎ মাটিতে ফেলে দিলে আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন বেশ কিছু কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে যা গ্রিন কেমিস্ট্রির অবদানে পরোক্ষভাবে জীবজগতের ক্ষতি করে না। সবুজ রসায়ন বিপ্লব ঘটিয়েছে পৃথিবী জুড়েই আর সেখানে জলের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

### পাদটীকা

১ দ্বিমেরু ভ্রামক—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক আধানের মধ্যে বিভাজনের একটি পরিমাপ।

২ পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক—দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু আধান বায়ু বা শুণ্য মাধ্যমে নির্দিষ্ট দুরুত্বে থাকলে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল এবং একই দুরত্বে অন্য কোন মাধ্যমে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের অনুপাতকে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বলে।

৩ ক্রোমাটোগ্রাফি—জৈব যৌগের দুই বা ততোধিক উপাদানের কোনো মিশ্রণকে একটি স্থির মাধ্যমে রেখে এবং অপর একটি সচল মাধ্যমকে ঐ স্থির মাধ্যমে প্রবাহিত করে, মিশ্রণের উপাদানগুলোর অধিশোষণ মাত্রার উপর ভিত্তি করে উপাদানগুলোকে পৃথক করার একটি পদ্ধতি।

৪ মিসেল—জলের মধ্যে সাবান অণুর গোলাকার সমষ্টি যাতে হাইড্রোকার্বন প্রান্তগুলি কেন্দ্রের দিকে এবং আয়নীয় প্রান্তগুলি বাইরের দিকে নির্দেশিত হয়।

### তথ্যসুত্র


১. Léo Lajoie, Anne-Sylvie Fabiano-Tixier and Farid Chemat, Water as Green Solvent: Methods of Solubilisation and Extraction of Natural Products-Past, Present and future Solutions Pharmaceuticals 2022, 15, 1507. https://doi.org/10.3390/ph15121507.

২. Westall, F.; Brack, A. The Importance of Water for Life. Space Sci. Rev. 2018, 214, 50.



## বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা

যখন পৃথিবী বিপন্ন | রসনার রসায়ন | আমরা সবাই তারার অংশ | গাছের প্রাণ | আশ্চর্য আলো লেজার

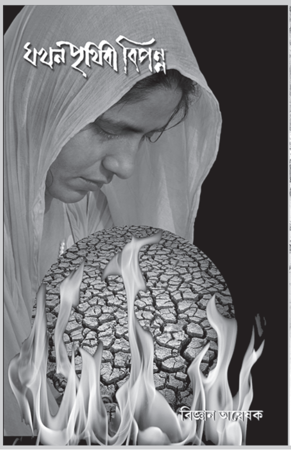

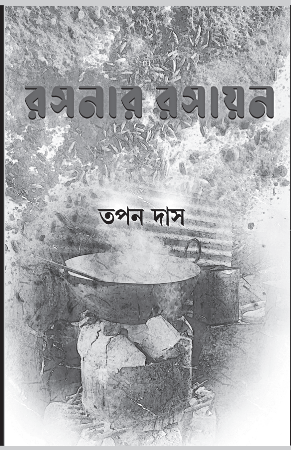

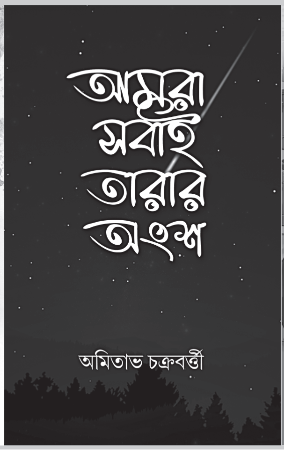

পা র মি তা  রা হা

# জল সংকট ও আমাদের ভবিষ্যৎ

*পানীয় জলের হাহাকার, জলের অভাবে কৃষি জমির ফাটল ধরা, দুই রাষ্ট্রের নদীর জল বন্টনের সমস্যা, এমনকি দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে জল বন্টনের সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে সারা বিশ্বের কোনায় কোনায়। অন্য দিকে জল দূষণের সমস্যাতো আছেই।*

*পৃথিবীর তিন ভাগ জলে পরিপূর্ণ থাকলেও একদিকে নোনাজলের পারে বসবাসকারি মানুষ খুঁজে বেড়ায় পানীয় জল, তপ্ত বালির পথ হেঁটে মরুভূমি চারিণী খুঁজছে জল অথবা পাহাড়ী মানুষটিও বোঝে কতটা জলে কতটা সময় কাটবে। বাবুদের ইঁদারায় সবাই কী আর যেতে পারে ? আসলে জল সঙ্কট একটি বিভীষিকা। যুগের পরিবর্তনে এবং সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে বদলেছে পটভূমি। প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে আজ আমরা পৌঁছেছি ন্যানো প্রযুক্তিতে। আধুনিকতা আমাদের ভোগবাদী করে তুলেছে। ঘটেছে নগরায়ন, এসেছে প্রযুক্তি। যার ফলে অতি নবীন সভ্যতাটিও পড়েছে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্কটে। তার মধ্যে জলসঙ্কট একটি অন্যতম সমস্যা। এই সমস্যার কারণগুলি কি কি ? সমস্যা সৃষ্টির কারণে আধুনিক প্রযুক্তি কতটা দায়ী? বিজ্ঞানের রকমারী আবিষ্কার সবই কী এর পরিপন্থী? সাধারণ মানুষ কতটা দায়ী? আমাদের কী করণীয়? এসবই উপজীব্য এই নিবন্ধের।*

'জল' শব্দটির মধ্যে যেমন একটি 'স্বচ্ছ ও অনায়াস' ভাবার্থ রয়েছে ঠিক তেমনই মানুষের মধ্যে একটি অতি মূল্যবান বস্তু, যাকে ইতিমধ্যে আমরা 'জীবন' বলে মানব সভ্যতার অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আখ্যা দিয়েছি, সেই জলসম্পদ সম্পর্কে আজও স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণার খামতি রয়েছে। পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। কিন্তু বিপুল জলরাশি মানুষের ব্যবহারযোগ্য নয়। পানীয় জল বা বিশুদ্ধ জল হিসেবে আমরা পাই মাত্র ২.৭% এবং তাঁর মধ্যে আবার ২% বরফ ও মেঘ হয়ে জমাট বেঁধে আছে। বাকী ০.৭% মিঠা জল মাটির নীচে নদীতে, পুকুরে জলাশয়ে আছে। ৯৭.৫% জল আছে সাগরে ও মহাসাগরে যা ব্যবহার অনুপযোগী নোনা জল। জলকে ঘিরে যে সংকট আগামীদিনে হতে চলেছে তার ভয়াবহতার নিরিখে আগামী প্রজন্ম নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে। তার প্রধান কারণগুলি হল — জলের জোগান কমে যাওয়া, চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ফারাক বৃদ্ধি, জল বন্টনে মারাত্মক বৈষম্য।

জলের যে সংকট আগামী দিনে তৈরী হতে চলেছে তা কেবল জোগান কমে যাওয়ার কারণে নয় চাহিদা বৃদ্ধির কারণেও। জলের চাহিদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণগুলি হল — জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলের যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপচয়, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, জলের উপর চাপ তত বৃদ্ধি পাবে এবং মাথাপিছু জলের জোগান ততই কমে যাবে। জীবন যাত্রার মানের উপর জলের চাহিদা নির্ভর করে। জল বন্টনের ভয়ঙ্কর বৈষম্য চোখে পড়ে, গ্রামের মানুষের সাথে শহরের মানুষের জল ব্যবহারের পরিমাণে, বৈষম্য রয়েছে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের মধ্যে। একজন সাধারণ মানুষ দৈনিক গড়ে যে পরিমাণ জল ব্যবহার করে তার থেকে ভোগবাদী একজন মানুষ অনেক বেশি ব্যবহার করে। জীবন যাত্রায় অনেকের পোশাক পরিচ্ছদ, বাড়ি গাড়িতে থাকে অফুরান জৌলুশ। আর এসব প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে জল, যার হিসেব কেউ করেনা। শুধু তাই নয় জলকে আমরা ব্যবহার করি খুবই অবহেলার সঙ্গে। আর একজনের অবেহেলো ভবিষ্যতে সঙ্কটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পৃথিবীতে জলের ভাণ্ডার অফুরন্ত কিন্তু ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ অতি সামান্য। তাই জল ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করা এবং তাকে দূষণ মুক্ত রাখার তাগিদে আমাদের সকলের ভাবনার সময় এসেছে।

জীবনে সাধারণত তিন রকমভাবে জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে, কলকারখানায় এবং মানুষের ব্যাবহারিক জীবনে।

অধিক ফসলের লোভে অতিরিক্ত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার জল সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন ফসল কোন ঋতুর জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। যেকোনো ফসল যেকোনো সময় ফলান সম্ভব। এটা হয়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দান। অন্যদিকে খাদ্য সঙ্কট কাটাতে অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার জলসংকটের সম্মুখে ফেলে দিয়েছে আমাদের। অধিক ফলনশীল ফসল ফলাতে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অপরিমিত জলের প্রয়োজন। অসময়ে ফসলের উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকেরা মাটির তলার জল তুলে নেয় পাম্পের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে জলের স্তর নেমে যাচ্ছে নীচে, এমনকি বাড়ছে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ। জিন তত্ত্বের আধুনিকীকরণ কৃষিতে এনেছে এক জোয়ার। কিন্তু পাশাপাশি এর প্রয়োগে যেমন বেড়েছে অধিক জলের ব্যবহার অন্যদিকে প্রয়োজন হয়েছে আরও বেশি সার ও কীটনাশকের। ফলে মাটি দূষণের পরিমাণ বাড়ছে, বাড়ছে জল দূষণের পরিমাণ। এখানেই প্রয়োজন স্থিতিশীল উন্নয়ন। প্রয়োজন আরও বিচার বিশ্লেষণ, আরও গবেষণা। প্রয়োজন খাদ্যের যোগানের সাথে সঙ্গতি রেখে কৃষিব্যবস্থার ধরন বদলানোর। সনাতন কৃষি পদ্ধতি একেবারে উপড়ে ফেলার আগে আরও একবার ভাবতে হবে আমাদের। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও কিছু জলের ভাণ্ডার অক্ষত রাখা প্রয়োজন।

প্রচুর পরিমাণে জলের ব্যবহার হয়ে থাকে কলকারখানায়। একদিকে যেমন কলকারখানায় প্রচুর জলের প্রয়োজন অন্যদিকে কারখানা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ মেশান হয় জলে। সুতো উৎপাদন থেকে শুরু করে ইস্পাত, অথবা কৃষিতে ব্যবহৃত সার কীটনাশক থেকে শুরু করে যন্ত্রাদি উৎপাদনের জন্য অথবা জীবনদায়ী ওষুধের কারখানায় প্রচুর জলের প্রয়োজন। যে কারণে বেশির ভাগ কারখানাই গড়ে উঠে কোন নদী, সমুদ্র বা জলাশয়কে কেন্দ্র করে। একদিকে জলের ব্যবহার অন্যদিকে জল দূষণের একটি অন্যতম কারণ কলকারখানা। আবার কারখানা নিঃসৃত কার্বন, সালফারের মত পদার্থ মিশে যাচ্ছে বাতাসে, মিশছে বিভিন্ন গ্রীন হাউস গ্যাস। এসবের প্রভাব গিয়ে পড়ছে আবহাওয়া ও জলবায়ুতে। তার পরোক্ষ ফল জল সঙ্কট শিল্পক্ষেত্রে জলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে আমেরিকা ও চিন। কিন্তু সংকটে ভুগতে হবে সকলকে। ভোগ করবে একদল মানুষ কিন্তু সংকটে ভুগবে সকলে। তাই সেখানে প্রয়োজন নীতি আরোপের, চালু হওয়া প্রয়োজন নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি। এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারের কৌশল খোঁজা। প্রয়োজন কুটির শিল্প, হস্তশিল্পের এবং পারম্পারিক পদ্ধতি গুলো জিইয়ে রেখে শিল্প নির্ভরের প্রয়োজনীয়তায় লাগাম টানার।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর জলের ব্যবহার হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের হাতেই আছে অনেকটা নিয়ন্ত্রনের রাশ। যেমন ধরা

যাক, স্নানের সময় এক ব্যাক্তি দুই বালতি জলে স্নান করবে নাকি ৪ বালতি। আবার জলের ধারায় জামা কাপড় কাচবে, নাকি জল বালতিতে ধরে তারপর ব্যবহার করবে। নোংরা জল পুনব্যবহারের কোন জায়গা আছে কিনা দেখে নিতে হবে। রাস্তার পাড়ের কলের ট্যাপ সঠিক ভাবে লাগানো আমার আপনার প্রত্যেকের প্রয়োজন। জলের ট্যাঙ্কের সাথে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগানো আবশ্যিক যাতে অতিরিক্ত জল গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারি। আবার বর্ষার জল ধরার সঠিক আঁধার নির্মাণ করা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বাধ্যতা মুলক করা প্রয়োজন। বালি সিমেন্টের কংক্রিটের প্রলেপ যখন ইটের গায়ে চাপানো হয় তখন কি পরিমাণে জল প্রয়োজন তার সঠিক হিসেব আমরা কখনো করিনি। এখন ভাবনার সময় এসেছে। হিসেব কষতে হবে সকলকে। বাড়ি বানাতে বর্ষার জল কাজে লাগানোর পূর্বপরিকল্পনা করতে হবে সকলকে।

এই বেহিসেবি জলের অপচয়ের ফলে পৃথিবী আজ গভীর জল সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট বড় নালা, নদী, পুকুর, ঝিল, বিল বা ভূগর্ভস্থ জল, যা প্রকৃতির অকৃপণ অবদান, ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। ভরে উঠছে লাগামছাড়া দূষণে। বর্তমানে জলের পরিমিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে না হলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর জীবকূলের অস্তিত্ব রক্ষা করা সঙ্কটজনক হয়ে দাঁড়াবে। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করেও জল দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত উৎসব, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে সামনে রেখে মানুষ মেতে উঠে বিভিন্ন ভাবে। বাজি পটকা থেকে শুরু করে আতসবাজি কোনকিছুতেই খামতি নেই মানুষের। তার থেকে সৃষ্টি হয় বায়ু দূষণ মাটি দূষণ এবং সর্বোপরি জল দূষণ। বাজি পটকা থেকে নিঃসৃত ভারী ধাতব পদার্থ গুলো মিশে যায় জলে, ফলে দূষিত করে তোলে জলাশয়। আবার যেকোনো কিছুই আমরা জলে ফেলতে ভালবাসি, মানে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। ফলে আগাছায় ভরে যাচ্ছে জলাশয়। এই ইউট্রিফিকেসানের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এবং কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডের।

১৯৯৯ সালে জাতীয় জলসম্পদ কমিশন (NCIWRDP) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০৫০ সাল পর্যন্ত জলের জোগান সঙ্কট জনক পরিস্থিতিতে পৌঁছাবে যা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আমাদের দেশের মোট ভৌগোলিক অবস্থান ৩২৮ মিলিয়ন হেক্টর, গৃহিত জলের পরিমাণ ৮০০০ ঘনকিমি (গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতকে ধরে) এই পরিমাণ জল থেকে বাস্পিভবন ও অন্যান্যভাবে নষ্ট হবার পর ব্যবহার যোগ্য জলের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০৮৬ ঘন কিমি আর সেই সময় জলের চাহিদা বেরে দাঁড়াবে ১০৭৬ ঘন কিমি। সুতরাং জলের চাহিদার ক্ষেত্রে একটু রাশ টেনে ধরা গেলে এবং অপচয় বন্ধ করতে পারলে সঙ্কট হবে না বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এর এক দশক পরে ২০০৯ সালে '২০৩০ ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপ' সংগঠনের তরফে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আমাদের চাহিদা ও যোগানের মধ্যেকার ফারাক বেড়ে দাঁড়াবে ৫০ু। জলের চাহিদা বাড়ছে অথচ তার জোগান কমছে অর্থাৎ জলের চাহিদা ও যোগানের ব্যবধানটি ক্রমশই বাড়বে।

জলসংকট যে আগামী দিনে সারাবিশ্বে ভয়াবহ আকার ধারন করতে পারে যে ব্যাপারে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বহু আগেই সতর্ক করেছিলেন। এবার ঘোর দুর্দিনের পূর্বাভাস মিলল একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই এমন পরিস্থিতি আসছে যখন এক ফোঁটা জলের জন্য কাঁদতে হবে বিশ্ববাসীকে। জলাভাবের প্রভাব পড়বে অর্থনীতি ও কৃষিতে। বিশ্বের জলসংকট নিয়ে সম্প্রতি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে — " ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইন্সটিটিউটের অ্যাকোয়াডাক্ট ওয়াটার রিস্ক এটলাস"। সেখান থেকে জানা গেছে, এই মুহূর্তে তীব্র জল সংকটে ভুগছে বিশ্বের অন্তত ২৫টি দেশ। এই তালিকায় ২৪ নম্বরে নাম রয়েছে আমাদের দেশের।

রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের ২৫টি দেশে সারা বছরই জল সংকট রয়েছে। ওই দেশ গুলিতে বসবাস বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের। অর্থাৎ অন্তত ২০০ কোটি মানুষ সারাবছর জলাভাবজনিত দুর্ভোগের শিকার। ২০৫০ সালের মধ্যে এই দুর্ভোগ আরও বাড়বে। এবং যার জেরে জলসংকটে হবেন ৬০ শতাংশ মানুষ। বিজ্ঞানীদের দাবী, জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে ২০১০ থেকে দুনিয়া জুড়ে জলসংকট শুরু হয়। ওই বছর জলের জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশ মিলিয়ে জিডিপির ২৪% খরচ করেছিল যা প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। ২০৫০ এ এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ৭০ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। শুধু সাধারণ মানুষের জীবনেই নয়, দেশের অর্থনীতিতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়তে চলেছে। ২৫টি দেশে প্রতি বছর জলসংকট বেড়েই চলবে। সবচেয়ে বেশী জলকষ্টে রয়েছে বাহরিন, সাইপ্রাস, কুয়েত, লেবানন ও ওমান। আশার কথা, পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতি মধ্যে উদ্যোগী হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও ভারতের মত বেশ কিছু দেশ।

জল নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর ২২ শে মার্চ রাষ্ট্র সঙ্ঘের তরফে বিশ্ব জল দিবস পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল মিষ্টি পানযোগ্য জলের সহনশীল ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই দিনটির কথা প্রথম প্রস্তাব আনা হয় ১৯৯২ সালে রিওডি জেনেরোতে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে অ্যাজেন্ডা ২১ এ। ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং এই বছর থেকে প্রতি বছর বিশ্ব জল দিবস পালিত হয়ে আসছে। অন্য দিকে বিজ্ঞানীরাও সর্বাধুনিক ন্যানোপ্রযুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করছে জল দূষণ নিয়ন্ত্রণে।

সর্বোপরি জলসংকট কমাতে মানুষকে তার পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করার সময় এসেছে। মানুষ যে যেখানে বাস করছে সেখানে তার জলসম্পদের পরিমাণ কত বা তার কতটা অংশ কীভাবে ব্যবহার করলে তা ক্ষতিকর হবে না সেটা সঠিক ভাবে তাকে জানতে হবে। জল সম্পদের ব্যবহার সীমিত করা ও সামাজিক ভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরী। যেভাবে আমরা বিশুদ্ধ জলের উৎসগুলিকে হারিয়ে ফেলছি এবং যেভাবে জলের দূষণের মাত্রা বেড়ে চলেছে তাতে মানুষের এখনই সচেতন হওয়া দরকার। জল ব্যবহারের প্রাচীন পদ্ধতি গুলিকে আমরা ভুলতে বসেছি। জলাভূমিকে গ্রাস করে নগর পত্তন করছি, অধিক ফসলের লোভে ভূগর্ভের জল অপরিকল্পিত ভাবে তুলে ফেলছি। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে, কীভাবে চললে আমরা জল সম্পদকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে পারব, আমাদের জীব বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রকে সজীব রাখতে পারব এবং জল দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব তার সঠিক পাঠ প্রত্যেকের গ্রহণ করা প্রয়োজন। মানুষই পারবে জল সংকট রোধ করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে।

একথা সত্য জল পুনঃনবীকরণযোগ্য কিন্তু শক্তি ব্যয় অপরিসীম। শক্তি সমস্যার কথা মাথায় রেখে, জল ব্যবহারের দিক গুলিও ভাবতে হবে।

অসীম বসাক

# রঙিন জলের বিপদ

*রঙিন জল বললেই চোখে ভাসে জলরঙের ছবি আকার দৃশ্য। তুলির ডগায় একের পর এক রঙ। আর আকা শেষে তুলি ধোওয়ার জলভরা পাত্রে। ঐ তুলির অবশেষ রঙের ছোওয়ায় নতুন রঙ জল। একটু বাঁকা চোখে ভেসে আসে একটু দুষ্টুমি! নেশায় মাতোয়ারা হাতে সুরা পাত্রে রঙিন পানীয়। তবে আমি এসব রঙিন গল্প লিখতে বসিনি। আমি বলছি রঙিন শরবতের কথা। যা হাটে বাজারে স্টেশনে তথা সর্বত ঘামঝরা গরমে সহজেই পাওয়া যায়। কাঁচের গ্লাসে একটুকরো বাজারি বরফে একটু স্যাকারিন গোলা খানিকটা রঙিন মিশ্রণ আর জল বা পানি মিশিয়ে বানানো শরবত। লাল-নীল-সবুজ-হলুদ শরবত। অনেকেই পান করেন ঐ রঙিন জল। তারা কি জানেন, তারা কি পান করছেন? হয়তো জানেন না। অথবা জানলেও হয়তো গ্রাহ্য করেন না। আর শরবতওয়ালা কি জানেন তারা কি বেচছেন? এই রঙিন জলের বিপদ নিয়েই আজকের এই প্রবন্ধ।*

এবারে অন্য রঙিন জলের কথা বলি। এ জল রাস্তার শরবতের মতো এত সস্তা নয়। তবে পয়সার বিনিময়ে সহজলভ্য, সিলড্ কাঁচ বা পলিবোতলে দোকানের ঠাণ্ডা আলমারিতে পাওয়া যায়। এই জল কি ফল ফুল বা পাতার নির্যাস থেকে সংগ্রহ করা রঙে রাঙ্গানো হয়? একদম না। সুদৃশ্য বোতলে ভরা এই রঙিন জলও পুরোপুরি অস্বাস্থ্যকর। কেন? বলছি।

আসলে এই অস্বাস্থ্যকর রঙ করা জল বহু মানুষই জেনে বুঝেই পান করেন। অনেকটা এই রকম: 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'। বহুজাতিক বানিজ্যিক প্রচার আর সেলিব্রিটিদের ঐ বিজ্ঞাপণে প্রায় সকলেই ঐ রঙিন জলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন।

এবার দেখা যাক এই রঙিন জলে কি কি রঙ মেশানো হয়।

সাধারণত হলুদ রঙ করার জন্য মেটানিল ইয়েলো, লাল রঙের জন্য কঙ্গোরেড এবং রোডামিন বি, সবুজ রঙের জন্য ম্যালাকাইট গ্রীন ব্যবহার করা হয়। আবার এগুলিকে মিশিয়ে বিভিন্ন রঙ বানানো হয়। যদিও সবগুলিই নিষিদ্ধ। খাদ্যে ব্যবহারের জন্য নয় অর্থাৎ এগুলি খাদ্য রঙ বা ফুড কালার নয়। কেন এগুলি নিষিদ্ধ? আগে এগুলির রাসায়নিক চরিত্র সম্মন্ধে একটু জেনে নেওয়া যাক। এদের রাসায়নিক নাম বেশ কঠিন। যেমন মেটানিল ইয়েলোর রাসায়নিক নাম **সোডিয়াম 3–[(4-অ্যানিলিনোফিনাইল) ডায়াজিনাইল] বেনজিন সালফোনেট**। এগুলির মধ্যে মেটানিল ইয়েলো ও কঙ্গো রেড হচ্ছে অ্যাজো রঞ্জক বা ডাই। ম্যালাকাইট গ্রীন হচ্ছে ট্রাইঅ্যারাইলমিথেন রঞ্জক আর রোডামিন বি হচ্ছে জ্যান্থিন ডাই।

মেটানিল ইয়েলোর জন্য হাইপারঅ্যাকটিভিটি বা অতিসক্রিয়তা মানে অত্যধিক নড়াচড়া, অস্থিরতা, খুব বেশি কথা বলা ও সহজেই বিভ্রান্ত হওয়া সহ বিভিন্ন ধরনের আচরণ হতে পারে। এটি নিউরোটক্সিক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে পঙ্গু করে। রক্তে লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইটের সংখ্যা বাড়াতে পারে। ক্রোমোজোমের পরিবর্তন তথা ক্যান্সার, কিডনির অসুখ, ব্রেস্ট টিউমার, পুরুষের বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে মেটানিল ইয়েলো একটি অত্যন্ত বিষাক্ত অ্যাজো ডাই এবং মিউটাজেনিক অর্থাৎ জিনের মিউটেশন করে। এটি জিনগত উপাদান যেমন, ডিএনএ'র পরিবর্তন করে। কি সাঙ্ঘাতিক! কঙ্গো রেড ক্যান্সার সৃষ্টিকারি, এতটাই বিষাক্ত যে টেক্সটাইল বা বয়ন শিল্পে কঙ্গো রেডের ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত হয়েছে। সেটি কিনা খাবার রঙিন করতে এখনোও ব্যবহার করা হচ্ছে! রোডামিন বি লিভারের ক্ষতি করে ও ক্যান্সারের দিকে নিয়ে যায়। ম্যালাকাইট গ্রিন কার্সিনোজেনিক এবং জিনোটক্সিক মানে ডিএনএর জন্য ক্ষতিকর।

এতো গেল নিষিদ্ধ রঙের কথা, এবারে বলবো বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও রসায়ন দপ্তর কতৃক অনুমোদিত কয়েকটি রঙের কথা। এগুলির গাল ভরা নাম হচ্ছে ফুড কালার এবং এগুলি বিভিন্ন নামী দামি পানীয়তে সবসময় ব্যবহার করা হয়।

পানীয় ও খাদ্য শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কৃত্রিম রঙের উপর ভিত্তি করে একচেটিয়া ব্যবসা করে যাচ্ছে। ঐ খাদ্যপণ্যকে বিশেষ করে শিশুদের জন্য আরও লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে একের পর এক ক্ষতিকারক কৃত্রিম রঙের ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বেশিরভাগ খাদ্যরঞ্জকই বিষাক্ত, মিউটাজেনিক ও কার্সিনোজেনিক। এগুলির প্রভাবে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের আচরণগত পরিবর্তন যেমন হাইপারঅ্যাকটিভিটি বা অতিসক্রিয়তা লক্ষ্যনীয়। গবেষণায় জানা যায় যে ঐ সব রঙ আমাদের শরীরে মনোযোগ ঘাটতি হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (ADHD), নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল আচরণগত ব্যাধি (NDBDs), জেনেটিক সমস্যা, আবেগপ্রবণতা, শ্বাসযন্ত্র এবং ত্বকের সমস্যা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, দুর্বলতা, স্থূলতা, হাঁপানি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি বিপদ ডেকে আনে।

এবারে তথাকথিত অনুমোদিত খাদ্য রঙগুলোর কথা একটু বিশদে বলছি।

১. **ইরাইথ্রোসিন (Erythrosine) বা ইরাইথ্রোসিন বি** [E127]। একটি ফ্লুরোন সঞ্জাত যৌগ। গোলাপী রঞ্জক। সাধারণত গরম পানীয়, জুস, ক্রীড়া পানীয়, ক্যান্ডি বা পপসিকল বা জমাটবাধা মিষ্টি ও কেক, ঔসধ, প্রসাধনী ইত্যাদি রঙ করতে ব্যবহার করা হয়। ইরাইথ্রোসিনের জন্য শিশুদের মধ্যে হাইপারঅ্যাকটিভিটির মাত্রা (ADHD) বেড়ে যায়। অ্যালার্জি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে বিরল অ্যানাফিল্যাকটিক শকের কারন হতে পারে। থাইরয়েড টিউমার সৃষ্টি করতে পারে ও সর্বোপরি ক্যান্সার হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, চীন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে নিষিদ্ধ।

২. **টারট্রাজিন (Tartrazine)** [E102]। টারট্রাজিন অ্যাসিডের ট্রাইসোডিয়াম লবণ ও অ্যাজোডাই। হলুদ রঞ্জক। বিভিন্ন ধরনের কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস, স্পোর্টস ড্রিংকস, গুঁড়ো পানীয় মিশ্রন, ফ্রুট কোর্ডিয়ালস এবং মিশ্র স্বাদযুক্ত অ্যালকোহল পানীয়, মিষ্টান্ন, কটন ক্যান্ডি, তাৎক্ষণিক পুডিং, চিপস, সিরিয়াল (কর্ন ফ্লেক্স, মুসেলি), কেকের মিশ্রণ, পেস্ট্রি, কাস্টার্ড পাউডার, স্যুপ, ঔষধ, প্রসাধনি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। টারট্রাজিন অ্যাজমা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এবং যাদের অ্যাসপিরিন সহ্য হয়না তাদের মধ্যে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে এবং অস্ট্রিয়ায় নিষিদ্ধ।

৩. **সানসেট হলুদ FCF (Sunset Yellow FCF)** [E110]। কমলা বর্ণের একটি অ্যাজো ডাই। পানীয় সহ অন্যান্য খাবারে, ঔষধ শিল্পে ও প্রসাধনীতে ব্যবহার করা হয়। এটি অ্যাজমা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এবং যাদের অ্যাসপিরিন সহ্য হয়না তাদের মধ্যে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এছাড়াও বমি বমি ভাব, আমবাত (ফুসকুড়ি), নাক বন্ধ হওয়া, রাইনাইটিস বা নাক দিয়ে জল পড়া, কিডনি ফুলে যাওয়া এবং ক্রোমোজোমাল ক্ষতি করতে পারে। ফিনল্যান্ড,নরওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ।

৪. **কুইনোলিন ইয়েলো (Quinoline Yellow)** [E104]। এটা দুই প্রকার: স্পিরিটে দ্রাব্য কুইনোলিন ইয়েলো এসএস ও জলে দ্রবণীয় কুইনোলিন ইয়েলো ডব্লিউএস। এগুলি কুইনোথ্যালোন রঞ্জক শ্রেণীর অন্তর্গত। বিভিন্ন ধরনের পানীয়, সস রঙ্গিন করতে ও খাবার সাজাতে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাজ্যের ফুড স্ট্যান্ডার্ড এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে কুইনোলিন ইয়েলোতে রঙ্গিন পানীয়ের জন্য শিশুদের মধ্যে হাইপারঅ্যাকটিভিটির মাত্রা (ADHD) বেড়ে যায়। ছত্রাক সংক্রমণ, রাইনাইটিস এবং ব্রঙ্কিয়াল হাঁপানি হয়। অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া এবং জাপানে নিষিদ্ধ।

৫. **ব্রিলিয়ান্ট নীল এফসিএফ (Brilliant Blue FCF)** [E133]। নীল রঞ্জক। একটি ট্রাইঅ্যারাইলমিথেন রঞ্জক। প্রধানত পানীয়, প্রক্রিয়াজাত খাবার, ঔষধ শিল্পে, খাদ্য পরিপূরক এবং প্রসাধনীতে নীল রঙ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ত্বকে ফুসকুড়ি, আমবাত, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, ত্বকের বিবর্ণতা, লিভার, কিডনির ক্ষতি, হাঁপানি, হাইপারঅ্যাকটিভিটি, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার ও ক্যান্সার করতে পারে। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রীস, ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং জার্মানিতে নিষিদ্ধ।

৬. **ইন্ডিগো কারমাইন (Indigo Carmine)** [E132] বা ইন্ডিগোটিনডিসালফোনেট সোডিয়াম। একটি নীল রঙ। অনেক ধরনের অ-অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়, কোলা, ফল-গন্ধযুক্ত পানীয় এবং সুগন্ধযুক্ত অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সূচক বা ইনডিকেটর হিসাবে এবং ক্লিনিকাল এন্ডোস্কোপিতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, হাইপোটেনশন, ত্বকের জ্বালা বা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ব্যাধি। ছত্রাক সংক্রমণ, রাইনাইটিস, ডায়রিয়া ও অ্যানাফিল্যাক্সিস মানে প্রাণঘাতী এলার্জি হতে পারে। নরওয়েতে নিষিদ্ধ।

৭. **পেটেন্ট ব্লু ভি (Patent Blue V) [E131] বা অ্যাসিড ব্লু ৩**। নীল রঞ্জক। একটি ট্রাইফিনাইলমিথেন রঞ্জক। পানীয় ও জেলি জাতীয় মিষ্টি এবং জিলেটিন ডেজার্টে খাদ্য সংযোজন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কিছু ক্ষেত্রে বিরল অ্যানাফিল্যাকটিক শকের কারণ হতে পারে। অ্যানাফিল্যাক্সিস একটি গুরুতর, প্রাণঘাতী এলার্জি প্রতিক্রিয়া। তাই অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে শিশুদের জন্য খাদ্যের রঙ হিসাবে এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৮. **আলুরা রেড এসি (Allura Red AC)** [E129] লাল অ্যাজো রঞ্জক। এটি অ্যামরান্থের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি তুলো ক্যান্ডি, নরম পানীয়, চেরি-স্বাদযুক্ত খাবার, শিশুদের ওষুধ, দুগ্ধজাত খাবার, প্রসাধনীতে লাল রঙ করতে ও ট্যাটু কালি রূপে ব্যবহার করা। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত লাল রঙ। আলুরা রেড এসি রঙের জন্য ADHD সহ হাইপারঅ্যাকটিভিটি, বিরক্তি এবং হতাশার মতো আচরণগত পরিবর্তন, এলার্জি, আমবাত, হাঁচি, চোখে জল, হাঁপানি, চামড়া জ্বালা, মাইগ্রেন এবং সর্বোপরি ক্যান্সার হতে পারে। যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন এবং অস্ট্রিয়ায় নিষিদ্ধ।

৯. **কারমোইসাইন (Carmoisine)** [E122]। অ্যাজো রঞ্জক। গেঁজে ওঠা বা ফারমেন্টেড খাবারে, পানীয়, শুকনো ফল এবং কিছু অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়তেও লাল ফুড রঞ্জক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে খাদ্য রঞ্জক হিসাবে অনুমোদিত কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় নিষিদ্ধ। এই রং সংবেদনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ত্বক ফোলা, শ্বাসকষ্ট এবং আমবাত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বলে জানা গেছে।এটি স্যালিসিলেট বা অ্যাসপিরিন এর প্রতি অসহিষ্ণু ব্যক্তিদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। এটি হাঁপানির উপসর্গ বাড়িয়ে তুলতে পারে। নরওয়ে, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানে নিষিদ্ধ।

১০. **পোনসেউ 4 আর (E124) (Ponceau 4R)** হল স্ট্রবেরি লাল রঙের অ্যাজো ডাই। অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়, কার্বনেটেড পানীয়, বেকড পণ্য, ক্যান্ডি, সিরাপ, সংরক্ষিত ফল, মিষ্টান্ন এবং বেকারি পণ্য, স্ন্যাকস, শুকনো মিশ্রণ, প্রসাধনী, ওষুধ ইত্যাদি লাল রং করতে ব্যবহার করা হয়। এটি যাদের অ্যাসপিরিনের প্রতি অ্যালার্জি আছে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে, হাঁপানির সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং অনেক দেশে একটি কার্সিনোজেনিক পদার্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। পোনসেউ ফুড কালার অল্পবয়সী এবং বাচ্চাদের হাইপারঅ্যাকটিভ করে। তাই খাওয়ার জন্য নিরাপদ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় নিষিদ্ধ।

১১. **ফাস্ট গ্রিন এফসিএফ (E143) [Fast Green FCF]** হল সবুজ (ফিরোজা) রঙের ট্রাইঅ্যারাইলমিথেন রঞ্জক। এটি পরিপূরক খাবার, বেকড খাবার যেমন কেক, কাপকেক, লাইম বা লেবু ও সবুজ আপেলের স্বাদের পানীয়, হিমায়িত খাবার, প্রসাধনী, ওষুধ ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। এটি অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া যেমন ত্বকে ফুসকুড়ি, চুলকানি ঠোঁট, মুখ বা জিহ্বা ফুলে যাওয়া, শ্বাস নিতে অসুবিধা এবং মাথা ঘোরার সৃষ্টি করতে পারে কিছু ক্ষেত্রে বিরল অ্যানাফিল্যাকটিক শকের কারণ হতে পারে। খাদ্য রঞ্জক হিসাবে এর ব্যবহার ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কিছু দেশে নিষিদ্ধ। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও জাপানে এর ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

১২. **গ্রিন এস (Green S)** (E142) উজ্জ্বল সবুজ রঙের ট্রাইঅ্যারাইলমিথেন রঞ্জক। নরম পানীয়, পুদিনা সস, ডেজার্ট, মিষ্টি, আইসক্রিম ও প্রক্রিয়াজাত মটরশুটি সহ বিভিন্ন খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। এটি অল্পবয়সী এবং বাচ্চাদের হাইপারঅ্যাকটিভ করে। কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং নরওয়েতে নিষিদ্ধ।

১৩. **ব্রিলিয়ান্ট ব্ল্যাক বিএন (Brilliant Black BN)** [E151] হচ্ছে কালো অ্যাজো ডাই। কোমল পানীয় এবং স্বাদযুক্ত জল, আইসক্রিম, মাছ-ভিত্তিক খাবার, ক্যান্ডি, বেকারি পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন সস, স্ন্যাকস, প্রসাধনী, ঔষধ, নির্দিষ্ট ধরনের কালি ইত্যাদি কালো রং করতে ব্যবহার করা হয়। অ্যালার্জিযুক্ত ব্যক্তিরা হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট বা আমবাতের মতো প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারে। শিশুদের মধ্যে হাইপারঅ্যাকটিভিটি হতে পারে, চোখ জ্বালা করতে পারে। বিচ্ছিন্ন কোষ পরীক্ষায় প্রমানিত যে ব্রিলিয়ান্ট ব্ল্যাক বিএন জিনোটক্সিক মানে জিনের ক্ষতি যেমন ডিএন এর ক্ষতি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যান্ড, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া,

ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, অস্ট্রিয়া এবং নরওয়েতে নিষিদ্ধ।

১৪. **ব্রাউন এফকে (Brown FK)** [E154] হচ্ছে ছয়টি অ্যাজো রঞ্জক ও সোডিয়াম ক্লোরাইড ও/বা সোডিয়াম সালফেটের মিশ্রণ। বাদামী রং। পানীয়,ধূমায়িত মাছ, রান্না করা মাংসকে রঙ করতে ব্যবহৃত হয়। এই রঞ্জকের লেবেলে উল্লেখ না করেও অ্যালুমিনিয়াম থাকতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম আলজেইমার, ডিমেনশিয়া তথা পারকিনসন্স রোগের কারন। পরীক্ষায় জানা গেছে এটা হৃৎপিণ্ডের পেশী, তন্তু ও কিডনির ক্ষতি করে। লিভারে চর্বি বৃদ্ধি তথা অভ্যন্তরীণ অঙ্গের ওজন বৃদ্ধি করে। হাঁপানির লক্ষণগুলিকে তীব্র করতে পারে। এটি শিশুদের হাইপারঅ্যাকটিভ করে। ক্রোয়েশিয়া, স্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, সুইডেন, রোমানিয়া, লাটভিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মাল্টা, ফিনল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সমস্ত EEC সদস্য রাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, কানাডা, জাপানে নিষিদ্ধ।

১৫. **ব্রাউন এইচটি (Brown HT)** [E155] বাদামী রঙের অ্যাজো ডাই। কোকো বা ক্যারামেলের রঙিন বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি চকোলেট পানীয়, চকোলেট কেক, ডেজার্ট, কুকিজ, ক্যান্ডি, পনির, চা, দই, জ্যাম, আইসক্রিম, ফল, মাছ, ওয়েফার ইত্যাদি রঙ করতে ব্যবহার করা হয়। এটির ক্ষেত্রেও ব্রাউন এফকের মতো প্রতিক্রিয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ।

বাজারে রঙিন বা বর্ণহীন শুকনো মিশ্রণ পাওয়া যায় যা জলে মেশালে রঙিন শরবত উৎপন্ন হয়। কি রঙ আছে ওতে? ঐ মিশ্রণে এক বা একাধিক রঙ মেশানো হয় আর ঐ সব রঙের সাথে মেশানো হয় টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড ($TiO_2$) [E171]। কেন মেশানো হয়?

টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড একটি গন্ধহীন পাউডার। এটি রংকে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতে সাহায্য করে, রঙকে উজ্জ্বল করে এবং সূর্যালোকের থেকে রঙ-এর ক্ষয় রোধ করে মানে রঙকে ফিকে হওয়া থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও এটি খাবার তথা পানীয়ের একটি মসৃণ সাদা চেহারা দেয় মানে নয়নলোভন তথা আকর্ষণীয় মানে পানীয়কে দর্শনধারী করে। ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার (আইএআরসি) টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডকে কার্সিনোজেনিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। অথচ ব্যবসায়ীরা এইসব বিষ খাবারে মিশিয়েই চলেছে। কোনও কৃত্রিম রঙই খাদ্য হিসাবে নিরাপদ নয়। প্রতিটি যৌগেই অ্যারাইল গ্রুপ বা বেঞ্জিন সঞ্জাত মূলক উপস্থিত; তাই ক্যান্সারের ঝুকি থেকে যায়। অ্যারোমেটিক যৌগগুলি প্রায়শই কার্সিনোজেনিক হয়। কিন্তু এতো কিছু জানার পরেও সব দেশ এগুলিকে নিষিদ্ধ বা বন্ধ করছে না। বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা তাদের পক্ষে নিরাপদ দেশে এগুলিকে পানীয়, খাবার ও অন্যান্য ভোগ্য পণ্যে নিজেদের ইচ্ছেমতো প্রয়োগ, ব্যবসা ও মুনাফা করছে আর আমরা অচেতন বা সচেতনভাবে রঙিন পানীয় মানে বিষপান করছি ও স্বাস্থ্য দূষণের শিকার হচ্ছি।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে সবথেকে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য রং হচ্ছে রেড ৪০ বা আলুরা রেড এসি (E129), হলুদ ৫ বা টারট্রাজিন (E102), হলুদ ৬ বা সানসেট হলুদ (E110) ও ব্লু ১ বা ব্রিলিয়ান্ট নীল এফসিএফ (E133)। এগুলির জন্য ক্যান্সার হতে পারে।

অত্যন্ত উদ্বেগ ও পরিতাপের বিষয় এই যে এই কৃত্রিম রঙগুলি ভারতে বৈধ।

ভারতে অনুমোদিত কৃত্রিম খাদ্য রঙগুলি হচ্ছে টারট্রাজিন (E102), সানসেট হলুদ (E110), কারমোইসাইন (E122),আলুরা রেড (E129), ইন্ডিগো কারমাইন (E132), ব্রিলিয়ান্ট ব্লু (E133), ফাস্ট গ্রিন (E143), ব্ল্যাক পিএন (E151)। ভারতে মেটানিল ইয়েলো, কঙ্গো রেড, রোডামিন বি ও ম্যালাকাইট গ্রীনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অথচ এগুলি খোলা বাজারে সহজলভ্য। এমনকি মুদিখানার দোকানেও পাওয়া যায়। তাই অসাধু ও অসচেতন ব্যবসায়ীরা খুব অল্প মুল্যে এগুলিকে কিনে খাবার ও পানীয়তে মেশাচ্ছেন ও বিক্রি করছেন। এদেশে ঐ রঙগুলির উৎপাদন তথা বিক্রি বন্ধ করতে হবে— এটাই আমাদের দাবী। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে।

**তাহলে উপায় কি?**

**উত্তর :** প্রাকৃতিক খাদ্য রঙ ব্যবহার করতে হবে। যেমন, উদ্ভিদ, ফল, বিশেষ করে গাজর ও অন্যান্য রঙিন শাকসবজি থেকে ক্যারোটিন বা বিটা-ক্যারোটিন পাওয়া যায়। এর রঙ হলুদ, কমলা, লাল ও বেগুনি হতে পারে। এল্ডারবেরি ফল থেকে গাঢ় নীল-বেগুনি রঙের অ্যান্থোসায়ানিন পাওয়া যায়। জল মেশালে লাল হয়ে যায়। বীট থেকেও অ্যান্থোসায়ানিন পাওয়া যায়। টমেটো থেকে লাল রঙ্গের লাইকোপেন পাওয়া যায়। এটাও এক ধরনের ক্যারোটিন। সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল থেকে সবুজ রঙ্গের ক্লোরোফিলিন পাওয়া যায়। লাল লঙ্কা থেকে লাল রঙ পাপরিকা পাওয়া যায়। বীট থেকে বেগুনি রঙ বিটালেইন পাওয়া যায়। হলুদ থেকে হলুদ রঙ কারকিউমিন পাওয়া যায়। অ্যাচিওট গাছের (বিক্সা ওরেলানা) বীজ থেকে কমলা-লাল রঙ্গের অ্যানাট্টো পাওয়া যায়।

মৃদু বেগুনি আভাযুক্ত লাল রঙ কারমাইন পাওয়া যায় কোচিনিয়াল (ড্যাকটাইলোপিয়াস কোকাস কোস্টা) পোকার দেহ থেকে। চিনিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত বা চারিং (charring) করলে চিনি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ফিকে হলুদ থেকে অ্যাম্বার এবং গাঢ় বাদামী পর্যন্ত হতে পারে। সংগে সুন্দর মিষ্টি সুবাস। একে ক্যারামেল বলে।

তবে পাতা ফুল ফল কাণ্ড মূল ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত এইসব রংগুলির স্থায়িত্ব খুবই কম এবং বায়ুতে নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রক্রিয়াজাত পানীয়তে এই প্রাকৃতিক রঙের সাথে একাধিক কৃত্রিম রাসায়নিক যেমন, সংরক্ষক বা প্রিজারভেটিভ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ইমালসিফায়ার, স্টেবিলাইজার ইত্যাদি মেশানো হয়। স্বভাবতই ঐ পানীয়টিও কৃত্রিম রাসায়নিক সমৃদ্ধ তথা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। এককথায় বোতল ভরতি রঙ্গিন জল আর বিষ একই জিনিস। প্রাকৃতিক রঙে রাঙ্গানো জল পেতে হলে সরাসরি ফল, ফুল, পাতা ব্যবহার করতে হবে ও সাথে সাথেই পান করতে হবে।

**তথ্যসূত্র**


1. Food Chemistry Advances, Volume 1, October 2022, 100019
2. A critical review of the food colourants effects on Human Health and Environment 254, R. Jananipriya, Usha Swaminathan
3. Biological Effects of Food Coloring in In Vivo and In Vitro Model Systems, Rocío Merinas-Amo, María Martínez-Jurado, Silvia Jurado-Güeto, Ángeles Alonso-Moraga and Tania Merinas-Amo Status of food colorants in India: conflicts and prospects, Springer, by R Varghese 2023
4. Trends in Food Science & Technology, Volume 52, June 2016, Pages 1-15

একটি কথোপকথন

সুদীপ্তি মিশ্র হালদার

# সাগর দ্বীপের জল সংকট

*প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে জল অন্যতম। প্রকৃতি ও মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জলের ভূমিকা সর্বাগ্রে। পৃথিবীতে তিনভাগ জল থাকা সত্বেও আজ 'জল সংকট' আমাদের বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের মাথাপিছু বন্টনকে 'ওয়াটার ফুট প্রিন্ট' বলা হয়। এই হিসাবে দেখা যায় আমাদের বরাদ্দ জলের অনেক বেশি আমরা খরচ করে ফেলছি। মাটির নীচে জলস্তর কমে যাওয়া, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রভাবে প্রকৃতির রুক্ষতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। উপকূলীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলির চারিদিকে সমুদ্রের অফুরন্ত জল। কিন্তু এই এলাকায় দৈনন্দিন জীবনের জন্য মাটির তলার জলের উপরেই নির্ভর করতে হয়। মূল ভূখন্ডে অবস্থিত জনজীবনে জলের চাহিদা নদীর জল পরিশুদ্ধ করে মেটানো সম্ভব। কিন্তু দ্বীপাঞ্চলে তা সহজে সম্ভব নয়। সাগরদ্বীপের জনসংখ্যা প্রায় দু-লক্ষ, এই দু-লক্ষ মানুষের জলের সমস্যা নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কথোপোকথনে অংশ নিয়েছে; ইরা-রাজনন্দিনী দাস, তৃষা-নন্দিতা মাইতি ও দিদির চরিত্রে সুদীপ্তি মিশ্র হালদার।*

দিদি : উঃ! দুপুরের রোদটা যেন সহ্য হয় না। আবার ভোর রাতে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা মনে হয়। একটু শীত কমতে না কমতেই এতো গরম পড়ে গেল..... দেখি টিউবওয়েলের দিকে যাই, এক জগ ঠান্ডা জল নিয়ে আসি। আরে ইরা, আজ স্কুল নেই বুঝি! তাই জল আনার দায়িত্ব তোমার!

ইরা : হ্যাঁ দিদি, ছুটির দিনে আমি আর তৃষা দুজনে জল নিতে আসি।

দিদি : বাঃ খুব ভালো, পড়াশুনোর সঙ্গে বাড়ির কাজকর্ম একটু আধটু অভ্যেস করা ভালো। তোমাদের বাড়ির ব্যবহৃত সব জল কি এই টিউবওয়েল থেকে নিয়ে যেতে হয়?

তৃষা : এই তিন বছর হল ব্যবহৃত সমস্ত জলই নলকূপ ও টাইম কল থেকে নেওয়া হচ্ছে। তার আগে তো পানীয় জল ছাড়া ব্যবহৃত সব জল আমাদের পুকুরের জলই ব্যবহার করা হতো।

দিদি : এখন কি পুকুর নেই?

ইরা : আছে, তবে ব্যবহার যোগ্য নয়। পাড়ায় টাইম কল হওয়ার পর পুকুর গুলোকে কেউ আর সংস্কার করছে না। তাই কচুরিপানা ও আবর্জনায় ভর্তি হয়ে গেছে।

দিদি : তাহলে মশার উপদ্রব বেড়েছে বলো। অব্যবহৃত জমা জলই তো মশাদের আঁতুড়ঘর।

তৃষা : হ্যাঁ, খুব মশার উপদ্রব।

দিদি : আচ্ছা, তোমরা তো উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করো। তার উপরে এই দ্বীপের চারিদিকে নদী ও সমুদ্র। তাহলে জলের অভাব নেই বলতে পারো।

ইরা : জলের অভাব নেই কিন্তু এই জল তো লবনাক্ত জল। ব্যবহার করা যায় না।

দিদি : সেটাই তো! ভেবে দেখেছো! ভূগর্ভস্থ এতো জল খরচ হলে ভবিষ্যতে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তৃষা : দাদু ঠাকুমার মুখে শুনেছিলাম, পূর্বে এই এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে চাষবাস নিষিদ্ধ ছিল। এখন তো বিভিন্ন জায়গায় চাষের জন্য স্যালো ব্যবহার করা হয়।

দিদি : তোমরা যেহেতু বিচ্ছিন্ন এলাকায় বাস করো, ভবিষ্যতে কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলের বিপুল পরিমানে ঘাটতি হতে পারে। এজন্য তোমাদের পূর্ব পরিকল্পনা থাকা চাই!

ইরা : হ্যাঁ দিদি, গত বছর আমরা জাতীয় শিশু বিজ্ঞান মঞ্চে একটা প্রোজেক্ট উপস্থাপন করেছিলাম।

তৃষা : প্রোজেক্ট টাইটেলটা কি যেন ছিল! ও ও ওয়াটার হার্ভেস্টিং।

ইরা : আমরা ২ লিটার জলের বোতল কেটে রেইন গজ বানিয়েছিলাম। বর্ষাকালে টানা তিনমাস ছাদে বসিয়ে বৃষ্টির জল মেপেছি। তারপর বোতলের পরিধি মেপে পাই টু স্কয়ার ফরমুলা দিয়ে বোতল থেকে প্রাপ্ত জল হিসেব করেছি এবং পুরো ছাদ থেকে বছরে সম্ভাব্য কতো পরিমাণ বৃষ্টির জল পাওয়া যেতে পারে তা নির্ণয় করেছিলাম।

দিদি : ও মা তাই নাকি! তারপর তারপর!

তৃষা : তারপর আমরা দৈনন্দিন জল খরচের হিসাব করে বার্ষিক জলের খরচ বের করেছি।

দিদি : সমীক্ষা করেছো? এটি প্রোজেক্টের একটি মূল বিষয়।

ইরা : হ্যাঁ, প্রতি পরিবারে কত পরিমান ভূগর্ভস্থ জল ও অন্যান্য ব্যবহার করে তা জানতে পঞ্চাশটি বাড়ি সমীক্ষা করেছি।

দিদি : বাঃ! খুব ভালো। এই প্রোজেক্ট থেকে কি সিদ্ধান্ত নিলে বলো তো!

তৃষা : এটি আমাদের কাছে সচেতনতামূলক প্রোজেক্ট ছিল। সারাবছর বাড়ির ছাদে যে পরিমান বৃষ্টির জল পড়ে তা ড্রেনেজের মাধ্যমে যদি একটি রিজর্ভারে রাখা হয় তাহলে ভূগর্ভস্থ জল কতটা পরিমান সাশ্রয় করতে পারি তা জানতে পারি।

দিদি : খুব ভালো চিন্তা, এটা আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ভূপ্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ভূগর্ভস্থ জল সাশ্রয় করতেই হবে।

আচ্ছা, তোমরা জল ভরবার জন্য বোতল এনেছো কেন?

টিউবওয়েল থেকে বোতলের ছোট মুখে জল ভরলে অনেক জল নষ্ট হয়, লক্ষ্য করেছো? বিভিন্ন সাইজের মুখওয়ালা বোতল নিয়ে একটা সমীক্ষা করে দেখো, বুঝতে পারবে এক লিটার জল ভরতে কত জল নষ্ট হয়।

ইরা : হ্যাঁ তাই তো! এই সমীক্ষা অবশ্যই করবো।

দিদি : তোমাদের এলাকায় জলের আরো একটি সমস্যা আছে। সেটা হল জলের স্যালিনিটি পরীক্ষা করা। কিছুদিন আগে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ দুজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে সাগরদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৬৫ টি নলকূপের জল পরীক্ষা করেছিলেন। তাতে জানতে পারি উত্তরের থেকে দক্ষিণ সাগরের নলকূপগুলিতে স্যালিনিটি বেশি। সাধারণত সমতলে উপকূলীয় অঞ্চলে লবনের মাত্রা বেশি। কয়েকটি নলকূপে লবন জলের মাত্রা এতোটাই বেশি যে অব্যবহৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আবার বেশ কয়টি নলকূপে কেবল মাত্র জোয়ারের সময় লবন জল উঠতে দেখা গেছে। এছাড়া কিছু কিছু নলকূপের জলের স্তর এতোটাই নেমে গেছে যে জল আর ওঠে না।

তৃষা : যত সমস্যা দেখছি এখানে। আমার মামাবাড়ি কোলকাতায়, ওখানে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে জল পরিশুদ্ধ যন্ত্র রয়েছে। আর যাদের নেই তাদের জার ভরে জল বাড়িতে আসে।

ইরা : আমাদের এখানেও কোনো কোনো বাড়িতে কেনা জল খায়। শুনেছি এই জল খেলে পেটের অসুখ হয় না।

দিদি : ঠিকই শুনেছো, আর্সেনিক যুক্ত এলাকার পরিশুদ্ধ জল খাওয়া খুব জরুরি। যে পদ্ধতিতে জল পরিশুদ্ধ করা হয় তাতে দ্বিগুণ জল অপচয় হয়। এই ব্যাপারে ঐ সব এলাকার মানুষজনের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যাই হোক জল আমাদের জীবন, সুস্থ জীবন যাপনের জন্য বিশুদ্ধ জল পান করা যেমন জরুরী তেমন জলের অপচয় রোধ করা আরো জরুরী, এটা আমাদের সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

***পরীক্ষিত ৬৫ নলকূপ এক নজরে :*** *নলকূপ গুলির pH 6.7-8 পর্যন্ত। 63টি নলকূপেই 0.30 থেকে 47 পিপিটির মধ্যে স্যালিনিটি পাওয়া গেছে। দুটির লবনের মাত্রা অনেকটাই বেশি 3.54 ppt-0.83ppt (যেখানে WHO এর নির্দেশনানুযায়ী 0.25 ppt) ppt-parts per million.*

ন য় ন মু খা র্জী

# পুরুলিয়ার ফুসফুস সাহেব বাঁধ আজ সংক্রমিত

*পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধ এবং পাড়*

১৮৩৮ সাল। পুরুলিয়া জেলা তখন মানভূম নামে পরিচিত। মানবাজার সদর শহর। এলেন কালেক্টর কর্নেল টিকলে সাহেব। তিনি জেলার এক প্রান্ত থেকে সদরকে সরিয়ে কাজের সুবিধার জন্য বর্তমান পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত করলেন। তিনি এসেই বুঝেছিলেন জেলার জলের সমস্যা। তাই তৎকালীন জেলবন্দী কয়েদিদের দিয়ে শহরের মধ্যস্থ জায়গায় ১৮৩৮ সালে ৮৬ একর জমির উপর সাহেব বাঁধ তথা বর্তমানে নিবারণ সায়েবের জন্ম হল (নিবারণ সায়েবের জাম স্বর্গীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্ত নিবারণ দাশগুপ্তের নাম অনুসারে)।

একটা সময় আবার পুকুরটি পুরো শহরে নাগরিকদের জলের চাহিদা পূরণ করত। শুধু শহরের অধিবাসীই নয় গ্রামের মানুষরা যারা রোজকার কাজের জন্য শহরে আসত তারাও এই পুকুরটির শোধিত জলে তৃষ্ণা মেটাত। পুরসভার পশ্চিমদিকের জল শোধনাগার থেকে ক্লোরিনেশনের জন্য রাঁচি রোডে PHE এর সাহায্যে জল শহরের বিভিন্ন জায়গায় মেটানো হত।

এই পুকুরটিকে বাঁচানোর জন্য ৫টি ক্যাচমেন্ট পুকুর ছিল যেগুলি সাহেব বাঁধের জলপূরণ করত যার দুটি বর্তমানে থাকলেও তার জল সাহেব বাঁধের কোন কাজে লাগে না। একটি নার্সিং হোস্টেলের পিছনে অন্যটি পূর্বে সাহেব হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পিছনে যেগুলি বর্তমানে মৃতপ্রায়। দক্ষিণদিকে একটি বড় জলের প্রবেশদ্বার (Inlet) থাকলেও তা বর্তমানে বন্ধ। অন্যদিকে নোংরা বা দূষিত জল বের হওয়ার জন্য উত্তর-পূর্ব কোণের নির্গতদ্বারের (Outlet) কার্যকারিতা কমে যাওয়ার ফলে জল প্রায়ই দূষিত হয়ে পড়ে।

বাঁধটিতে মাঝে মাঝে চোরাশিকারীরা মাছ ও মাইগ্রেটরি পাখি চুরি করে। বাঁধটি পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকজন Watchman থাকলেও তাদের দেখা যায় না।

বামফ্রন্ট শাসনকাল থেকেই বাঁধটির সংক্রমণ শুরু হয়েছিল। সংক্রমণের মূল কারণগুলি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ থেকে তুলে ধরে তা সমাধানের জন্য সাহেব বাঁধ বাচাও কমিটি তৈরি হয়। গণডেপুটেশন, স্বাক্ষর অভিযান, সেমিনার, পথসভারও আয়োজন করা হয়। নগরবাসীর উদাসীনতা ও অসচেতনতায় বাঁধটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ দেখা দেয়নি। সাহেব বাঁধের পাড়ে গাড়ির গ্যারেজ যার তৈল মিশ্রিত জল (Hydrocarbon) সরাসরি সাহেব বাঁধে মিশে জলকে দূষিত করছে। এই জল থেকে চামড়া সহ অন্যান্য ক্যান্সার জাতীয় রোগের কারণ হতে পারে। এছাড়া জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষতি হচ্ছে। একটা সময় পুজোর প্রতিমা বিসর্জন থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আবর্জনা (ফুল সহ বিসর্জনের পরিত্যক্ত জিনিস) ফেলে দেওয়া হত। বর্তমানেও রাতের অন্ধকারে প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্য ও অন্যান্য আবর্জনা যথেচ্ছহারে ফেলা হয়। উত্তর-পশ্চিম পাড়ের দিকে একটা বড় নর্দমা সরাসরি পুকুরে এসে পড়ছে।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে কচুরিপানার দাপট। মাঝে মাঝে পরিষ্কার হলেও সম্পূর্ণরূপে কখনও এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। অনেক সময় মাঠ না পুকুর বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে।

অথচ এই বাঁধটি পুরুলিয়াবাসীর গর্ব ছিল। বাইরের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের সাহেব বাঁধে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ একটি আনন্দদায়ক বিষয় হয়ে দাঁড়াত। ২০০৮-০৯ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের পরিযায়ী পাখি ও হাঁস এই সাহেব বাঁধের শোভা বর্ধন করত। আজ আর ডানা ঝাপটাতে দেখা যায় না পক্ষীকূল পারপেল হিরণ, গ্রিনসান, ওয়াটার কক, লিটিল গামবে, কমনটেলদের। এমনকি দেখা যাচ্ছে না স্থায়ীভাবে বাস করা পারপেল হিরণ (লাল কাঁক), পিনটেল ইন্ডিয়ান সামারদের।

সবচেয়ে মুশকিল হল ২০১০ সালের ১৫ এপ্রিল সাহেব বাঁধকে কেন্দ্র সরকার 'জাতীয় সরোবর' হিসাবে ঘোষণা করে এবং শোনা যায় কয়েক কোটি টাকা এর সৌন্দর্যায়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এমনকি তৎকালীন পুরমন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩ কোটি টাকা চেয়েছিলেন। বাস্তবে ঐ সমস্ত ফাইলগুলির কোন অস্তিত্ব বর্তমান পুরসভার কাছে নেই বলে জানা গেছে অর্থাৎ এটা জাতীয় সরোবর কি

না? এত টাকা এর জন্য বরাদ্দ হয়েছিল এবং কত টাকা খরচ হয়েছিল এসব কিছুই জানা যায় না। নগরবাসীও এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। আর এরই মধ্যে তৈরি হল উন্নয়নের নামে শিকারা পয়েন্ট, পুকুর সন্নিবর্তী রেস্টুরেন্ট। ফলতঃ সাহেব বাঁধ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন হারালো তার সাথে গত ৭-৮ বছর পরিযায়ী পক্ষীকুলের আগমন রুদ্ধ হল। এমনিতেই অনৈতিক ভূমি অধিকরণ (Encroachment) দরুন বর্তমানে ৮৬ একর থেকে ৭৫-৭৬ একরে পরিণত হয়েছে। তার সাথে পূর্ব পাড়ে ক্রমাগত হোটেল, বসতি, রেস্টুরেন্ট তৈরি হচ্ছে। যানবাহনের ক্রমাগত চলাচল, শব্দদূষণ সাহেব বাঁধকে ক্রমাগত সংক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। করুণ অবস্থা হল শহরবাসী ও প্রশাসনের বাঁধটিকে বাঁচানোর উদাসীনতা। গত বছর বিজ্ঞান মঞ্চের স্বাক্ষর অভিযানে কিছু সাড়া পাওয়া গেলেও মানুষের বাঁধটিকে রক্ষা করার তাগিদের যথেষ্ট খামতি রয়ে গেছে। সুভাষ পার্কের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা মধ্যস্থ দ্বীপটির সৌন্দর্যায়নের কোন চেষ্টা বাম, ডান কোনও পক্ষই সেভাবে করেনি। আজ হয়ত কাঁসাইয়ের দৌলতে জলের কষ্ট কমেছে কিন্তু সাহেব বাঁধ না থাকলে শহরের উষ্ণতা যেমন বৃদ্ধি পাবে কচুরপানার দৌলতে জলোস্থিত প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হবে প্লাস্টিক ও বর্জ্য পদার্থের দৌলতে সাহেব বাঁধের নাব্যতা যেমন কমতে শুরু করেছে, তেমনি মাঝে মাঝে মাছ চুরি চক্রের পান্ডারা জলে রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে মাছ চুরিতে হাত পাকা করছে। এর ফলে মাঝেমাঝেই জলের একটা অংশ দূষিত হয়ে পড়ছে। জলের Inlet ও Outlet কাজ না করায় জলকে পরিশোধিত করার সমস্যা দেখা যাচ্ছে। সাহেব বাঁধ নষ্ট হলে শহরটিরও পঞ্চপ্রাপ্তি ঘটবে।

এই ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ বাঁধটিকে বাঁচাতে নিয়মিত কচুরিপানা মুক্ত করতে হবে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সন্নিহিত ফ্ল্যাট ও বাড়িগুলির বর্জ্য পদার্থ ফেলা রোধ করার জন্য আইনকে কঠোরভাবে লাগু করতে হবে। Inlet ও Outletগুলিকে সংস্কার করে Catchment Areaগুলির জল বর্ষাকালে যেমন সাহেব বাঁধে প্রবেশ করাতে হবে ঠিক তেমনি Outlet দিয়ে দূষিত জল বাহির করার ব্যবস্থা করতে হবে। সাহেব বাঁধ-এর পাড়গুলিতে গাড়ির হর্ন বাজানোয় নিষিদ্ধতা আরোপ করতে হবে। সাহেব বাঁধের পর্যবেক্ষণকারীদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। গ্যারেজগুলির তৈল মিশ্রিত জল যাতে সাহেব বাঁধে না পড়ে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। সাথে জনগণের আবেগকে সাহেব বাঁধ রক্ষায় গণআন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

ছবি : অনির্বাণ চক্রবর্তী

## আমরা জল খাই কেন

জল নিয়ে এত কথা বলছি। কিন্তু আসল কথাটাই যে এখনও বলা হয়নি। খাটুয়াবাবু এসে সেটা মনে করিয়ে দিলেন। রোদে রোদে কোথায় যেন গেছিলেন। গলদঘর্ম হয়ে এসেই এক গ্লাস জল চাইলেন। গ্লাস হাতে নিয়ে কোথায় জল খাবেন, তা নয় তাঁর জন্যে চাই আমরা তেষ্টায় জল খাই কেন, তেষ্টাটাই বা কী? আমরা যে জল খাই তাতে নানারকম লবণ আছে এবং সেগুলো শরীরের পক্ষে ভালো। আমাদের দেহের ওজনের ১০০ ভাগের ৭০ ভাগই জল। শৈশবে কিছুটা বেশি থাকে। যাই হোক, সাধারণভাবে কারোর ওজন ৬০ কেজি হলে তার শরীরে জলের ওজন হবে ৪২ কেজি। আমরা জানি আমাদের শরীর এক একটা কোষ দিয়ে তৈরি, ঠিক যেমন একটা পাকা বাড়ি এক-একটা ইট দিয়ে গাঁথা। সেই কোষের মধ্যে আছে জল, দুটো কোষের মধ্যবর্তী জায়গাতেও জল, জল শরীরের সর্বত্র। জল যখন শরীরে এত তখন আবার জল খাওয়ার ইচ্ছেটা আসে কেন? দরকারই বা কী?

আমাদের শরীরে নানারকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার এমন কিছু জিনিস তৈরি হয় বা কলকারখানার বর্জ্য পদার্থের মতো। শরীর ভালো রাখার জন্যই সেগুলো বের করে দেওয়ার দরকার হয়। তাছাড়া, বাইরের কিছু ব্যাপারে শরীরের অসুবিধে হলে শরীর তাও সমালানোর চেষ্টা করে। মল-মূত্র, ঘাম, এমনকি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীর এই কাজগুলি করে। যেমন খুব গরমে যখন কপাল বেয়ে ঘাম টপটপ করে পড়ে তখন আমরা যে কষ্টই পাই শরীর তো চেষ্টা করে তার ভিতরের ও বাইরের তাপের সমতা আনতে। ঘামের গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসে ঘাম। ঘাম তো জলই। ঘাম শুকিয়ে বাষ্প হতে শরীর থেকে তাপ নেয়, আমরা ঠান্ডা বোধ করি—একথা আগেই বলেছি। প্রতিদিন এরকম নানা প্রক্রিয়ায় আমাদের শরীর থেকে আড়াই তিন লিটার জল বেরিয়ে যায়। পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টিই তো সমুদ্রের লোনা জলে। সেই থেকে সমস্ত জীবের মধ্যে লবণ-জলের একটা সমতা থাকে। সে সমতার কোন বিঘ্ন ঘটলেই শরীর চেষ্টা করে সমতা ফিরিয়ে আনতে। কাজেই ঐভাবে জল বেরিয়ে গেলে শরীর চেষ্টা করে সেই ঘাটতিটা পূরণ করতে। আমাদের শরীরের হেডঅফিস হল মস্তিষ্ক। সেখানে আছে স্নায়ুকেন্দ্র যে ঐ ঘাটতি পূরণ করার বার্তা শরীরে পাঠায়। তখনই আমাদের তেষ্টার অনুভূতি হয়। আমরা জল খাই। আবার অসুখ-বিসুখে নানা কারণে শরীরে লবণের ভাগ কমে গেলেও শরীরে অনেক গণ্ডগোল দেখা দেয়—তখন শরীরে লবণ জল দেওয়ার দরকার হয়—সাধারণভাবে এই সূত্রে আমরা প্রায় সকলেই 'স্যালাইন দেওয়া' কথাটার সঙ্গে পরিচিত।

যাই হোক, জল যে আমরা শুধু ঢকঢক করে গ্লাসের জল খেয়েই পূরণ করি তা নয়। জল আমরা শাকসব্জি, দুধ ও অন্যান্য খাবার থেকেও পাই। খাবার হজমের জন্যও জল খাওয়া দরকার। জল জীর্ণ খাদ্যকে রক্তের সঙ্গে মিশতে সাহায্য করে। *—যুগল কান্তি রায়*

# বিজ্ঞান দরবারের সমীক্ষা রিপোর্ট : জলে আর্সেনিক

*২০১৮ ও ২০১৯ সালে বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা নদীয়া জেলার জলে আর্সেনিকের নমুনা সংগ্রহ করে। শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, নদীয়া কৃষি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক স্বপন ভৌমিক, রঘুনাথ কর্মকার, অনুপ হালদার, জয়দেব দে, বিজয় সরকার, আসগার মণ্ডল, সুজয় বিশ্বাস, সুবিনয় পাল, নীলরতন চক্রবর্তী, অভিজিৎ চাকলাদার সহ আরও বিভিন স্তরের মানুষ এবং আরও কিছু সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সমীক্ষার কাজে সহযোগিতা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যাডিজ* (School of Environmental Studies SOES) এদের তত্ত্বাবধানে এই কাজটি প্রায় ২ বছরের বেশি সময় ধরে চলে। কিছু রিপোর্ট তুলে ধরা হল। বিজ্ঞান দরবার

## ১. হরিণঘাটা ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|
| ১) সরকারি টিউব অয়েল স্কুল পঞ্চায়েত পৌরসভা পি.এইচ.ই-এর জলের নমুনা (মোহনপুর, হাতিকান্দা, বড় জাগুলি, টালিখোলা, সুবর্ণপুর ফতেপুর, নোনাঘাটা, কাস্টডাঙা, নিমতলা, উত্তর রাজাপুর, নগর উখড়া, নারায়ণপুর, বিরোহী, মোল্লাবেলিয়া) | ৭৮টি | নেই<br>যমুনার জল নিরাপদ মাত্রা | ১৬টি | ৬২টি<br>কোনটিই নিরাপদ নয় |
| ২) হরিণঘাটা ব্লকের নোনাঘাটা উত্তরপাড়া এলাকা ২৪ জন আর্সেনিক রোগীর বাড়ির নমুনা জল | পরীক্ষিত নমুনা জল ১৪টি PERSONAL TUBEWEL | ব্যক্তিগত সবগুলিই বিপদজনক মাত্রা ৫ থেকে ২৫০ গুণ বেশি বিপদজনক প্রস্রাব পরীক্ষায় জানা যায় সকলেরই প্রস্রাবে | | |
| ৩) ফতেপুর ও মোল্লাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৪টি বাড়ির জল, চুল, নখ, প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করা হয় | | ২ থেকে ৬ গুণ বেশি বিপদজনক প্রায় প্রতিটি নমুনাতেই বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে | | |
| ৪) হরিণঘাটা ব্লকের লাউপালা কল্পতরু হাইস্কুলের ৬০ ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ির জল ও চাল, ছাত্রীদের চুল, নখ, প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করা হয় | | প্রায় প্রতিটি নমুনাতেই বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক | | |
| ৫) হরিণঘাটা ব্লকের লাউপালা কল্পতরু হাইস্কুলের ১২ জন শিক্ষকের বাড়ির জল ও চাল, ছাত্রীদের চুল, নখ, প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করা হয় | | প্রতিটি নমুনাতেই বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক | | |
| ৬) হরিণঘাটা ব্লকের লাউপালা কল্পতরু প্রাইমারি স্কুলের ৫৩ ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ির জল ও চাল, ছাত্রীদের চুল, নখ, প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করা হয় | | প্রায় প্রতিটি নমুনাতেই বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক | | |
| ৭) হরিণঘাটা ব্লকের লাউপালা কল্পতরু প্রাইমারি স্কুলের ৪ জন শিক্ষকের বাড়ির জল ও চাল, ছাত্রীদের চুল, নখ, প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করা হয় | | প্রতিটি নমুনাতেই বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক | | |

## ২. চাকদহ ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|
| ১) বিভিন্ন স্কুল, পঞ্চায়েত ও সরকারি জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়<br>সিলিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত-১, দরাপপুর বাজার, বলরামপুর, বালিয়া, বিষ্ণুপুর, এলাকার প্রাইমারী হাইস্কুলের জল, তাতলা, ঘেঁটুগাছি, জাগুলি ডিগড়া, কুগাছি, রাউতারি, দেউলি, চৌগাছা, চাঁদুরিয়া, শিমুরালি, শিকারপুর, ভাগীরথী শিল্পাশ্রম, আলাইপুর, কালিপুর, উমাপুর, সরাটি, জমাদার-পাড়া, উত্তরপাড়া | ৭২টি | নেই | ৬টি নিরাপদ | ৬৬টি বিপদজনক |
| ২) চাকদহ ব্লকের ঘেঁটুগাছি (জাগুলি) জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ৪০ ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ির জল ও চাল, ছাত্রীদের চুল নখ, প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করা হয় প্রায় | | | প্রায় প্রতিটি নমুনাতেই বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক | |
| ৩) চাকদহ ব্লকের ঘেঁটুগাছি (জাগুলি) জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাড়ির জল ও চাল, ছাত্রীদের চুল নখ, প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করা হয় প্রায় | | | প্রায় প্রতিটি নমুনাতেই বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪) কল্যাণী পুরসভা | সরকারি টিউবওয়েল ৯টি নমুনা | ২টি | ২টি বিপদজনক সীমার কাছাকাছি |
| ৫) গয়েশপুর পুরসভা | সরকারি টিউবওয়েল ১৮টি নমুনা | ১টি | ১৭টি বিপদজনক |

### ৩. কৃষ্ণনগর-১ ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|
| **পৌরসভা, পঞ্চায়েত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (P.H.D.)-এর সরকারি জলের নমুনা** | | | | |
| কৃষ্ণনগর-১ ব্লক সরকারি জলের নমুনা ভালুকা, দিগনগর, ভিমপুর, গোবরপোতা, আসাননগর | ৫+২৩টি = ২৮টি | নেই | নেই | ২৮টি |
| ঘূর্ণি কৃষ্ণনগর পুরসভা ১ নং ওয়ার্ড পূর্বতন ১ নং ব্লক পেয়াদাপাড়া মুসলিম লেন | ১টি জলের নমুনা | | বেশি মাত্রায় বিপদজনক | |

**বি.দ্র. :** দিগনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৩টি জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ২২টি টিউবওয়েল বাকি ১টি কুয়োর জল। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বাড়ি থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রায় প্রত্যেকের জলেই (দিগনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাস্টার গার্মেন্টস দোকানের কাছে), (দিগনগর বাজার) পঞ্চায়েতের কলের জলে বিপদজনক মাত্রায় নাইট্রেট পাওয়া গেছে।

### ৪. কৃষ্ণনগর-২ ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষ্ণনগর-২ (তাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত, বেলপুকুর, সাধনপাড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ধুবুলিয়া বাহাদুরপুর) | সরকারি জলের নমুনা | ৭টি | নেই | নেই | ৭টি |

### ৫. রানাঘাট-১ ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রীতিনগর, ঘোড়াগাছা পৌরসভা বিভিন্ন ওয়ার্ড, বারাসাত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায় মানিক সিনেমা হলের কাছে। কালিনারায়নপুর | সরকারি জলের নমুনা | ১২টি | নেই | ২টি | ১০টি |

### ৬. রানাঘাট-২ ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| আরংঘাটা, ধানতলা, দত্তপুলিয়া, আইসমালি, দেবগ্রাম মাঝের গ্রাম, গাংনাপুর | সরকারি জলের নমুনা | ১৬টি | নেই | ২টি | ১৪টি |

### ৭. তেহট্ট-১ ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| চাদের ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত, পাথরঘাটা ১ নং, টেহট্ট, নাটনা, শ্যামনগর | সরকারি জলের নমুনা | ৭টি | নেই | নেই | ৭টি |

### ৮. তেহট্ট-২ ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| গোপিনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পলাশীপাড়া, সাহেবনগর, পালসুন্দা নং ও ২ নং বর্ণিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত | সরকারি জলের নমুনা | ৬টি | নেই | নেই | ৬টি |

### ৯. করিমপুর-১ ব্লক

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| করিমপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জয়রামপুর বৈদ্যভবন হাইস্কুল, তারাপুর প্রাইমারি স্কুল, মানিকনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুল, শিকারপুর হাইস্কুল, পিপুলবেড়িয়া হাইস্কুল | সরকারি জলের নমুনা | ৮টি | নেই | নেই | ৮টি |

১০. **করিমপুর-২ ব্লক**

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| বালিডাঙ্গা এন পি এম বালিকা বিদ্যালয় , জয় মা তারা হোটেল, ধরদহ, নারায়নপুর, কিশোরপুর, মাঠপাড়া, থানাপাড়া | সরকারি জলের নমুনা | ১২টি | নেই | নেই | ১২টি |

১১. **কালিগঞ্জ**

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| দেবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, পলাশী গ্রাম পঞ্চায়েত, বড়চাঁদঘড়, পানিঘাটা, পালিতবেরিয়া | সরকারি জলের নমুনা | ৭টি | নেই | নেই | ৭টি |

**বি.দ্র. :** পানিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২২টি জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ২২টি টিউবওয়েল জল। ব্যক্তিগত স্তরে প্রত্যেক বাড়ি থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রায় প্রত্যেকের জলেই কম/বেশি মাত্রায় নাইট্রেড পাওয়া গেছে। পানিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পানিঘাটা বাড়োয়াড়িতলা, পাগলাচণ্ডি পঞ্চায়েতের কলের জলে বিপদজনক মাত্রায় নাইট্রেট পাওয়া গেছে।

১২. **চাপড়া**

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| কলিঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত, চাপড়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, বৃত্তিহোদা, হাতিশালা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত | সরকারি জলের নমুনা | ৮টি | নেই | ১টি | ৭টি |

১৩. **হাঁসখালী**

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| বাদকুল্লা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, ময়ুরহাট গাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত | সরকারি জলের নমুনা | ৭টি | ১টি | ১টি | ৫টি |

**বি.দ্র. :** চূর্ণি নদীর জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়, হাসখালী থানার কাছে পূর্বতান খেয়ারঘাট হাসখালী ব্রিজের কাছে। জলের নমুনাতে কোন আর্সেনিক পাওয়া যায়নি।

১৪. **নাকাশীপাড়া**

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| বিলকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত, বেথুয়াডরৌ ১ নং বিদ্যাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, মুরাগাছা, বিক্রমপুর | সরকারি জলের নমুনা | ১০টি | নেই | নেই | ১০টি |

১৫. **শান্তিপুর**

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| নাবলা গ্রাম পঞ্চায়েত, বেলঘরিয়া ১ নং, বাবলা, গয়েশপুর, আরবান্দি-১, আরবান্দি-২, বাগাছড়াগ্রাম পঞ্চায়েত | সরকারি জলের নমুনা | ১২টি | ৩টি | নেই | ৯টি |

১৬. **নবদ্বীপ**

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েত, বাবলারি গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা ১ নং ওয়ার্ড, মাহিশুড়া, চর মাঝদিয়া ভালুকা, বাবলারি, চর ব্রহ্মনগর | সরকারি জলের নমুনা | ২৬টি +২২টি = ৪৮টি | ৩টি | নেই | ৪৫টি |

বাবলারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাস স্ট্যান্ডের কাছে। স্টেট ব্যাংকের পাশে সজল ধাড়া প্রকল্পের জলে
বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে। পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েত, নবদ্বীপ পুরসভা

**বি.দ্র. :** পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভালুকায় বিভিন্ন বাড়ি থেকে ২২টি জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তিগত স্তরে প্রত্যেক বাড়ি থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রায় প্রত্যেকের জলেই বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে। পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভালুকায় (গ্রাম- পানশিলা, পো.- পানশিলা) শৈলেশ দাসের বাড়ির জলের নমুনাতে জলে বিপদজনক মাত্রায় নাইট্রেট পাওয়া গেছে। সমীক্ষায় জানা যায় এই অঞ্চলের জলে বিপদজনক মাত্রায় নাইট্রেট রয়েছে।

১৭. কৃষ্ণগঞ্জ

| ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা | | মোট পরীক্ষিত নমুনা | নিরাপদ মাত্রা | সাময়িক নিরাপদ | বিপদজনক মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| মাঝদিয়া, টুগি, বানপুর, গেদে বিএস.এফ ক্যাম্পের কাছে খাল বোয়ালিয়া শিবনিবাস তারকনগর, দুর্গাপুর | সরকারি জলের নমুনা | ১০টি | ৪টি | নেই | ৬টি |

**১. মাথাভাঙ্গা নদীর জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়**

গ্রাম : গোবিন্দপুর, প্রযত্নে : তেলি ঘোষ,
কল্পনা ঘোষ, দিলীপ হালদার, স্বপন ভৌমিক — জলের নমুনাতে কোন আর্সেনিক পাওয়া যায়নি
গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

**২. চূর্ণি নদীর জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়**

স্বর্ণখালি বাজার স্বর্ণখালি ঘাট
স্বপন ভৌমিক — জলের নমুনাতে কোন আর্সেনিক পাওয়া যায়নি
জয়ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত

# আর্সেনিক বিষের কিছু নমুনা

- 200 থেকে 100 মিলিগ্রাম আর্সেনাস অবসাইড একটা মানুষকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। মালদহের একটি গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প থেকে প্রতিবছর 148 কেজির মতো আর্সেনিক উঠছে। উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত 201 বর্গকিমি অঞ্চলে সেচের ভূগর্ভ জলে প্রতিবছর 3200 নলকূপ থেকে 6.4 টন আর্সেনিক উঠছে।
*—দীপঙ্কর চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা*
- সেচের জলে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা লবণে মাটির লবণাক্ততা বাড়ায় সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবছর দুই বাংলায় হাজার হাজার টন ভূগর্ভ জলবাহিত আর্সেনিক বিষ ক্ষেতে ছড়ানোতে বাংলা ও বাঙালি কি বাঁচবে?
- সম্রাট নেপোলিয়নকে কি আর্সেনিক খাইয়ে মারা হয়েছিল, না সেন্ট হেলেনার আর্দ্র উষ্ণ আবহাওয়ায় দেওয়ালচিত্রের আর্সেনিকঘটিত রঙে ছত্রাকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন আর্সাইন বিষণে মৃত্যু হয়েছিল? না অন্য কিছু?
- 1950-এর দশকে স্লোভাকিয়ার নোভাকি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্গত ফ্লাইঅ্যাশের আর্সেনিকে বায়ুর অনুকূলে 30 কিমি দূর পর্যন্ত মৌমাছিদের সর্বনাশ, শুয়োর, গবাদি পশু ও অন্তঃসত্ত্বা নারীদের অতিরিক্ত গর্ভপাত, কম ওজনের শিশুর জন্ম ও জন্মগত অসুখবৃদ্ধি দায়ী প্রমাণিত হয়।
- বাংলার পুকুর, জলাশয় ও নদীসমূহের জল সাধারণভাবে আর্সেনিকমুক্ত হওয়ায় তা শোধন করে পানীয়জল হিসেবে সরবরাহ করলে আর্সেনিক সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। চাষের জন্যও এইসব জল ব্যবহার্য। পুকুরে জল কমে গেলে ভূগর্ভ জলোত্তোলন করে পুকুরে দুদিন রেখে দিলেই জল আর্সেনিকমুক্ত হবে। তাতে কিছু লোহার জাল রেখে দিলে উৎপন্ন মরিচা আর্সেনিক শোষণ করে জলকে দ্রুত আর্সেনিক মুক্ত করবে।

## নিঃশব্দে মহামারির মেঘ ঘনাচ্ছে আর্সেনিক, মানছে স্বাস্থ্যদফতর

'পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক বিপর্যয় এবং তা প্রতিরোধের রূপরেখা' শীর্ষক এক রিপোর্ট প্রকাশ করে স্বাস্থ্য দফতর বলেছে, 'রাজ্যে প্রায় চার কোটি মানুষ আর্সেনিক-দূষণ সংক্রান্ত ঝুঁকির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কলকাতা সহ রাজ্যের মোট নটি জেলায় মূলত আর্সেনিক-দূষিত জলপানের কুপ্রভাবেই মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছে। কলকাতা বাদে আটটি জেলায় রোগাক্রান্তদের মধ্যে গ্রামের মানুষের সংখ্যাই বেশি। আর্থ-সামাজিক ভাবে যাদের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নীচে, তাঁরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এই দূষণে...।

আর্সেনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে এতদিন যে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা স্বীকার করে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'আর্সেনিকের মোকাবিলায় কয়েকটি ক্ষেত্রে বড় মাপের দুর্বলতা আছে। যেমন, রাজ্যের অনেক চিকিৎসকই ভালভাবে জানেন না, কীভাবে এই রোগের মোকাবিলা করা সম্ভব। মেডিক্যাল শিক্ষাক্রমে এই রোগটি সম্পর্কে তেমন কোনও বিস্তৃত তথ্যও নেই। সব মিলিয়ে আর্সেনিক দূষণজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ওই রোগ নিরাময়ে রাজ্য জুড়ে যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো দরকার, তার অভাব আছে পশ্চিমবঙ্গে।'

*—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ ডিসেম্বর ২০০২*

# নাটিকা : জল অপচয় বন্ধ করো, জল বাঁচাতে চেষ্টা করো

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তীব্র জল সংকট অনুভূত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই এখনো বেশিরভাগ মানুষ যথেচ্ছ পরিমাণে পানীয় জলের অপচয় করে থাকেন। ১১-১২ বছরের কিছু স্কুল পড়ুয়া তাদের পাঠ্য বই এবং দিদিমণির কাছ থেকে জানতে পারে যে এইভাবে মানুষ জলের অপচয় করতে থাকলে আগামী দিনে তাদের এলাকাতেও পানীয় জলের অভাব দেখা দিতে পারে। তারা ছোটো হলেও একথা বুঝতে পারে যে শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান হবে না। তাই তারা একটা কচিকাঁচাদের দল তৈরি করে এলাকায় মিছিল বার করে, দেওয়ালে পোস্টার লাগায় এবং সর্বোপরি স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে জলের অপচয় রুখতে জরিমানা করার প্রস্তাব দেয়। এই নিয়েই একটি ছোট নাটিকা।

সূত্রধর : বর্ষা বলে একটি মেয়ে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখল একটা কলের মুখ খোলা, সে দেখতে পেয়েই বুঝল যে কেউ ব্যবহার করার পর ওই কলটি খুলে রেখে চলে গেছে, ওই কল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ জল নষ্ট হচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার দেখল আরেকটি কলের মুখে প্যাচ নেই, সেটা থেকেও জল পড়ে যাচ্ছে।

বর্ষা (স্বগতোক্তি করে) : এই জল অপচয়টা আমাদেরকেই বন্ধ করতে হবে।

দৃশ্য : সে এবার থেকে জলের কল খোলা থাকলেই বন্ধ করে দিত আর! সবাইকে বলতো যাতে কখনোই কল খোলা রেখে চলে না যায়।

সূত্রধর : কিছুদিন পরেই সে বুঝতে পারলো যে তার একার পক্ষে এই জল অপচয়টা বন্ধ করা সম্ভব নয়। তারপর সে ভাবল, তার সমবয়সী আরো কিছু ছেলে মেয়েদের প্রয়োজন যারা এই জল অপচয়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে।

বর্ষা (বন্ধুদের উদ্দেশ্যে) : চল আমরা সবাই মিলে জলের অপচয় বন্ধ করি।

মেঘা : কিন্তু আমরা কি পারবো?

তৃষ্ণা : আমাদের মত ছোটদের কথা কে শুনবে?

বর্ষা : তাহলে চল আমরা সবাই মিলে দিদিমণির কাছে যাই।

দিদিমণি : তোমরা সবাইকে বুঝিয়ে বল কেন জলের অপচয় বন্ধ করা উচিত। আমাদের এখানে অধিকাংশ মানুষ মাটির তলার জল ব্যবহার করেন, এই জল যথেচ্ছ পরিমাণ ব্যবহার করলে অচিরেই এই জলের ভান্ডার শেষ হয়ে যাবে। কিছুদিন আগেই তোমরা খবরে জেনেছো, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহরকে জলশূন্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি আমাদের দেশের বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এই শহরগুলি তীব্র জল সংকটে ভুগছে।

মেঘা : আমাদের সবাইকেই দায়িত্ব নিতে হবে যাতে জলের অপচয় না হয়।

সবাই একসাথে : হ্যাঁ বর্ষা, আমরা সবাই তোর সাথে আছি।

সূত্রধর : এরপর বর্ষা তার বন্ধুদের সাথে এইসব কথা আলোচনা করতে করতে রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় দেখল রাস্তার পাশের একটি টিউবয়েল থেকে পাড়ার এক কাকিমা সরু মুখওয়ালা বোতলে করে জল নিচ্ছিল, আর বেশিরভাগ জল বোতলের বাইরে পড়ে যাচ্ছিল।

বর্ষা : কাকিমা, তোমরা এত জল নষ্ট করছো কেন?

কাকিমা : তোরা ছোট ছোট র মতো থাক, তোদের জল নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন?

বর্ষা : তোমরা যদি এই জল অপচয় বন্ধ না করো তাহলে পরের প্রজন্ম বা আমরা ভবিষ্যতে জল খাওয়া তো দূরের কথা দেখতেও পাব না।

সূত্রধর : বর্ষা একথা বলে সেখান থেকে চলে গেল। পরদিন স্কুলে গিয়ে দিদিমণির কাছে সব বলল।

দিদিমণি : তোমরা আরো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটি আন্দোলন করো এবং তার নাম দাও 'জল অপচয় বন্ধ করো, জল বাঁচাতে চেষ্টা করো'।

সূত্রধর : এ কথা শুনে বর্ষা খুব খুশি হল। দিদিমণির কথা মত সে আরও বন্ধুকে জড়ো করল।

বর্ষা : বন্ধুরা, আমরা ছোট হলেও আমরা অনেক কিছু করতে পারি। তোরা নিশ্চয়ই গ্রেটা থুনবার্গের কথা শুনেছিস, পনেরো বছরের এই মেয়েটি জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে সারা পৃথিবী জুড়ে এক অভিনব আন্দোলন শুরু করে। অনেক লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত সুইডেন সরকার বাধ্য হয় গ্রেটার কথা শুনতে। তাই আমরাও যদি এই আন্দোলন শুরু করি, একসময় বড়রা আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে।

শোন তোদের মধ্যে যারা জল বাঁচাতে ইচ্ছুক, তারা আগামী রবিবার সকাল দশটার মধ্যে বড় রাস্তার মোড়ে উপস্থিত হবি। আমরা একটা মিছিল করব। সবাই একটা করে পোস্টার তৈরি করে আনবি। কিছু পোস্টার আমরা রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় সেঁটে দেবো, আর কিছু পোস্টার ধরে তোরা হাঁটবি।

সুচেতনা দিদি : (বাজারে যাবার পথে) কী রে জল বাঁচানোর জন্য তোরা মিছিল করছিস? সত্যিই দিনে দিনে জল অপচয় বাড়ছে, দেখ কতদূর কি হয়।

সূত্রধর : বর্ষা তার স্কুলের সব বন্ধু এবং পাড়ার কিছু ছেলে মেয়েদের নিয়ে এই মিছিলটা করল আর কিছু পোস্টার পাড়ার দেওয়ালে মেরে দিল। বড়রা অবাক হয়ে দেখল ছোটদের এই কান্ড।

এর ফলে সেদিনের মতো জল অপচয় বন্ধ করল।

সুচেতনা দিদি : বর্ষা, তোরা এই আন্দোলনটা করছিস ভালো, কিন্তু এতে শুধুমাত্র সচেতন মানুষই জল অপচয় বন্ধ করবে। কিন্তু যারা এখনো সচেতন হতে পারেনি তারা তো জল অপচয় বন্ধ করবে না। তাই তোরা সমস্যাটার কথা স্থানীয় কাউন্সিলরকে জানা এবং জল অপচয়কারীদের জন্য একটা জরিমানার ব্যবস্থা কর।

বর্ষা : হ্যাঁ দিদি, তুমি ঠিক বলেছো। আমরা কাউন্সিলর কাকুর সাথে দেখা করে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো।

কাউন্সিলর কাকুকে বলবো যে পাড়ার সমস্ত কলের সামনে একটা করে সাইনবোর্ড লাগাতে যাতে লেখা থাকবে 'জল অপচয় করলে জরিমানা হবে'।

আর কারা জল অপচয় করছে সেটা লক্ষ্য করে আমরা কাউন্সিলার কাকুকে জানাবো।

---

* নিশা নস্কর, লাবনী সরদার, মুসকান মোল্লা, সৃজা মন্ডল, দিপায়নী সর্দার, ফারহিন পারভিন, আফ্রিনা খাতুন (বারুইপুর গার্লস হাই স্কুল, উ.মা., ষষ্ঠ শ্রেণি)

বি শ্ব জি ৎ মু খো পা ধ্যা য়

# জল ও জলাশয় সংরক্ষণে আইনের চালচিত্র

ভারতবর্ষ জুড়ে মিষ্টিজলের সম্ভার তার প্রয়োজনের নিরিখে পর্যাপ্ত। অতীতে রাজা-মহারাজারা এমনকি সুলতানি আমলেও জলাশয় খনন করা অত্যন্ত পবিত্র ও জনহিতকর কাজ হিসেবে পরিগণিত হত। তাছাড়া অতীতে বিশেষ করে বঙ্গভূমিতে পাথরের প্রতুলতার জন্য বাড়ি তৈরির সময় মাটি কেটে বাড়ি তৈরি করা হত এবং মাটি খননের ফলে যে পুকুর তৈরি হত, তাকে রক্ষা করা হত সযত্নে, কারণ অতীতে দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য পুকুরের জলই ছিল একমাত্র ভরসা। এমনকি বিভিন্ন দুর্গ, প্রাসাদ ও মন্দিরের আশেপাশে নদী না থাকলে পুকুর তৈরি করা হত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আগমনের সঙ্গে স্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় এবং জমিদাররা নিজেদের প্রয়োজনে ও তার প্রজাদের জন্য পুকুর বা জলাশয় বা দিঘি তৈরি করত, যা আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলেও জলাশয় সংরক্ষণের জন্য বিশেষ কোন আইন তৈরি হয়নি কিন্তু যখন ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন মহামারীতে জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হতে থাকে, তখন ১৮৬০ সালে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এ (ধারা ২৬৯, ২৭৭,২৯০) পুকুরের জল জনস্বার্থের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। এমনকি ১৮৬৭ সালে সরাই আইন অনুযায়ী জেলাশাসক বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে জলের দূষণ রোধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে জলাশয় সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসনের হাতেও বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

### জলাশয় সংরক্ষণে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা

ভারতীয় সংবিধানে মানুষের যেমন মৌলিক অধিকার উল্লিখিত আছে, তেমনই একইভাবে মানুষের কর্তব্যও উল্লিখিত আছে। সংবিধানের ধারা ৫১ক-তে সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করতে হবে এবং তার উন্নতি সাধন করতে হবে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জলসম্পদ অন্যতম বিষয়। তাছাড়া মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষাকর্তা রাষ্ট্র। সুপ্রিম কোর্টের এই ঘোষণাকে বর্তমানে ডক্ট্রিন অফ পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে গণ্য করা হয়।

### জল ও জলাশয় সংরক্ষণে আইনি রক্ষাকবচ

১৯৭২ সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোম-এ মানব পরিবেশ নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে সম্মেলন হয়, তার ঘোষণাপত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিল ভারতবর্ষ। এই সম্মেলনে পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে নানাবিধ আলোচনাতে মিষ্টিজল সংরক্ষণ অন্যতম বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়, যার ফলে ভারতবর্ষের আইনে নানা পরিবর্তন সূচিত হয় এবং বেশ কিছু নতুন আইন তৈরি করা হয়। এই আইনগুলি হল যথাক্রমে—

১) জল দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৭৪।
২) পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬।
৩) ইনল্যান্ড ফিশারিজ অ্যাক্ট, ১৯৮৪।
৪) পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণ ও পরিচালন আইন, ২০০৬।
৫) ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৫।

### পৌর আইন, ১৯৯৩-এ জলদূষণ সংক্রান্ত ধারা

ধারা ২৫৭ : পৌর নর্দমায় অবৈধ প্রবেশ।

ধারা ৩৩৩ : মশক বিস্তার নিরোধ।

ধারা ৩৩৯ : অনুমোদিত স্থানে ধোপা কর্তৃক ধৌতকরণের বিরুদ্ধে বিধান।

ধারা ৩৪০ : সরকারি বা ব্যক্তিগত পুকুরের জল ঘোলাটে করা নিষিদ্ধকরণ।

ধারা ৩৪৯ : পায়খানা ইত্যাদি মেরামত, পরিবর্তন, অপসারণ, পুনর্গঠন করবার ক্ষমতা।

ধারা ৩৫৪ : দালান, পুকুর, জলাশয় বা কূপ জীবাণুমুক্ত করতে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা।

ধারা ৩৫৮ : কূপ এবং পুকুর ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ।

ধারা ৩৬১ : সংক্রামিত ব্যাধি দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত বা বিক্রয় অথবা কাপড় ধৌতকরণ নিষিদ্ধ।

### পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এ পরিবেশ সংক্রান্ত কয়েকটি ধারা

ধারা ১৯ : গ্রাম পঞ্চায়েতের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহের উৎসগুলি বা জলাধারগুলি যাতে দূষিত না হয়, তার জন্য নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।

ধারা ২১ : গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেচনা প্রসূত কর্তব্যের মধ্যে পড়ে কূপ/পুকুর/জলাশয় খনন এবং অস্বাস্থ্যকর নিচু জমি ভরাট ও অস্বাস্থ্যকর স্থানকে স্বাস্থ্যকর করা।

ধারা ২৫ : জল সরবরাহের উৎসটি একটি সরকারি নোটিশ দিয়ে পৃথক করে রাখতে এবং স্নান, কাপড় কাচা বা অন্যান্য ব্যবহার দ্বারা উক্ত উৎসটি যাতে কলুষিত হতে না পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

ধারা ২৬ : দূষিত জলের সরবরাহ সম্পর্কে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা

যে সমস্ত বেসরকারি জলপ্রবাহ, প্রস্রবণ, পুষ্করিণী, কূপ বা অন্য কোনও জলাধারের জল পান বা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়, গ্রাম পঞ্চায়েত তার মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে দূষণ রোধে তার আর্থিক অবস্থা বিবেচনার পর, লিখিত নোটিশ দিয়ে ন্যায়সঙ্গত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। আদেশ পালনে অবহেলা হলে এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অনধিক ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন।

ধারা ২৮ : মহামারির প্রাদুর্ভাবে জরুরীকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ।

মহামারির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য বিনা নোটিশে যে-কোনও সময় পানীয় জল নেওয়া বা ব্যবহার করা যায় এমন কূপ, পুষ্করিণী বা অন্য স্থান পরিদর্শন করতে এবং তাকে সংক্রমণ-দোষমুক্ত করতে এবং ওইরূপ স্থান থেকে জল নেওয়া বা ব্যবহার বন্ধ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি আইনে জলাভূমি, দিঘি ও শহরের বা গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পুকুর কোন ব্যক্তি বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা করলে এই আইনগুলির মাধ্যমে প্রশাসন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। উক্ত আইনগুলি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, মৎস্য দপ্তর ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। কিন্তু আইনের কার্যকারিতাই আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। জলাশয় সংরক্ষণ আইনের বিস্তৃত চালচিত্র থাকলেও কার্যকরী প্রয়োগের অভাবে জলাভূমি হারিয়ে যাচ্ছে। তার অন্যতম উদাহরণ পূর্ব কলকাতার জলাভূমি, যে জলাভূমি আন্তর্জাতিক জলাভূমি হিসেবে স্বীকৃত। কলকাতার জলাভূমি সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কলকাতা হাইকোর্টে অসংখ্য মামলা হয়েছে এবং কলকাতা হাইকোর্ট প্রশাসনকে বুজিয়ে ফেলা জলাভূমিকে পুনরুদ্ধারের কথা বললেও তা কার্যকরী হয়নি। কলকাতার বুকে সাউথ সিটি মল থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য বহুতল পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে গড়ে উঠেছে প্রশাসনের চোখের সামনে। হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বেআইনি বহুতল স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। সম্প্রতি হুগলি জেলার ভাবাদিঘি ঘিরে নানা আন্দোলন হয়েছে কিন্তু উন্নয়নের নামে ভাবাদিঘি বোজানোর চেষ্টা চলছে। মৎস্যজীবীদের আন্দোলন সাময়িকভাবে এই বিস্তৃত ভাবাদিঘি বুজিয়ে ফেলার চক্রান্তকে প্রতিহত করতে পেরেছে।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন, বিভিন্ন পৌর ও পঞ্চায়েত এলাকাতে জলাভূমি বুজিয়ে বহুতল করার অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি জলাভূমি বুজিয়ে বহুতল হবার প্রচেষ্টাকে আটকানোর জন্য হাইকোর্টে মামলা থাকা সত্ত্বেও বহুতলের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

আইনের যথার্থ প্রয়োগ নির্ভর করে সুষ্ঠু প্রশাসন, সক্রিয় বিচার ব্যবস্থা ও সামাজিক চেতনার উপর। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় জল-মাফিয়াদের অত্যাচারে জলাভূমি ক্রমাগত লুপ্ত হতে থাকে এবং প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তবে এ কথা ঠিক যে সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জলাভূমি সংরক্ষণের আইন কার্যকরী করার জন্য মৎস্যজীবীরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যে উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন পরিবেশ কর্মীরা। এটিই আশার।

### জলের দোষগুণ দূষণমাত্রা

১) **pH** : জলের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের সূচককে পি.এইচ. বলে। বিশুদ্ধ জলে pH 7 অর্থাৎ প্রশম। 7-এর কম হলে অম্লত্ব এবং 7-এর বেশি হলে ক্ষারত্ব।

২) **কঠিন পদার্থ :** ভাসমান ধুলো-বালি কাদা জলের মধ্যে থাকলে জল ঘোলা দেখায়। কখনও অদ্রাব্য রাসায়নিক পদার্থ জলকে ঘোলা করতে পারে। নির্দিষ্ট পরিমাণ জলকে সূক্ষ্ম ছিদ্রের ছাঁকুনি কাগজে ছেঁকে শুকিয়ে ওজন মেপে নেওয়া হয়। (জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ 200 p.p.m. বলতে বোঝায় 1 লিটার জলে 200 মি.গ্রা. কঠিন পদার্থ।

৩) **দ্রবীভূত অক্সিজেন :** বায়ুর অক্সিজেন অল্প পরিমাণে জলে দ্রবীভূত থাকে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য $O_2$ বিশেষ প্রয়োজন। 25ºC গড় তাপমাত্রায় প্রতিলিটার জলে ৮ মি.গ্রা. অক্সিজেন থাকে।

৪) **পচনশীল জৈব পদার্থ :** বিশুদ্ধ জলে BOD (Biological Oxygen Demand)-র মান 30 p.p.m. অর্থাৎ ব্যবহার্য জলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থ শোধনের জন্য প্রতিলিটারে 5 দিনে 30 mg অক্সিজেন প্রয়োজন। BOD মাপতে সাধারণত 5 দিন লাগে।

৫) **রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা (Chemical Oxygen Demand) :** বিশুদ্ধ জলে BOD-র চেয়ে COD-র মান বেশি হয়। বিভিন্ন জৈব পদার্থকে জল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডে জারিত করার জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন তাকেই COD বলা হয়।

৬) **বিষাক্ত পদার্থ :** জৈব বা অজৈব নানা ধরনের বিষ জলে মিশে থাকতে পারে, যেমন— সায়ানাইড, সীসা, কপার, আর্সেনিক, সোনা, কখনও তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

৭) **কলিফর্ম সংখ্যা :** জলে ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া, ভাইরাস সহ নানারকম জীবাণু থাকে। এরা বিভিন্নরকম রোগ সৃষ্টি করে। আদর্শ পানীয় জলে মোট কলিফর্ম সংখ্যা প্রতি 100 মিলিমিটারে শূন্য (০) হওয়াই কাম্য। কখনও যদি সামান্য কলিফর্ম থাকে তাহলে সেই জল শোধন করে পান করা উচিত।

*—জয়দেব দে*


## বিজ্ঞান অন্বেষক বিশেষ সংখ্যা সংগ্রহ করুন

| নদী | পাখি | সমুদ্র | চন্দ্রযান ও নোবেল | প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য |
|---|---|---|---|---|
| 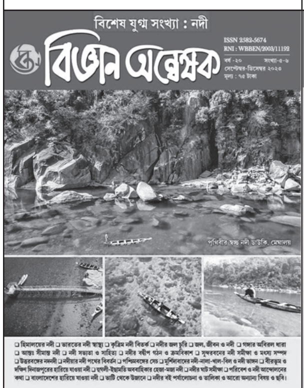 | | 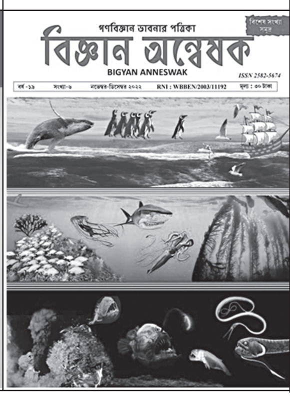 | | |

হিমবাহ সংবাদ

প্রবীর বসু

# উত্তপ্ত পৃথিবী এবং পার্বত্য হিমবাহ সঙ্কোচন

*পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চারিদিকে আলোড়ন উঠেছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং বিজ্ঞানীদের ভাষণে বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global Warming) মূল কারণ এবং তার ভবিষ্যৎ ফলাফল নিয়ে ঘোর তর্ক বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহ দ্রুত গলতে শুরু করেছে। সেই হিমবাহ নিঃসৃত জল নিম্ন সীমা সংলগ্ন উপত্যকায় অস্থায়ী সরোবর সৃষ্টি করেছে। আবার এই সরোবরের জল ক্রমাগত অতিরিক্ত চাপে ভেঙে গিয়ে নিম্নতর উপত্যকায় বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করছে। এই প্রবন্ধে আমরা পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, হিমবাহ সংকোচন নিয়ে নানা সংবাদ ও তথ্য তুলে ধরেছি।*

একথা আমরা সকলেই জানি আমাদের পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। পৃথিবীতে মোট জলের পরিমাণ ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার যার ৯৭ শতাংশ লবণাক্ত, ২.৩১ শতাংশ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে বরফ হিসেবে এবং অবশিষ্ট ০.৬৯ শতাংশ জল মাত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি।

আন্টারটিকায় বরফ গলছে

জলের সংকট দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং তার মূলে রয়েছে চাহিদা ও যোগানের পার্থক্য। জলের চাহিদা বৃদ্ধিতে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলের যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপচয়, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন।

বিশ্ব উষ্ণায়ন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে দিন দিন বিনষ্ট হতে চলেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য। এ যাবৎ কতরকম প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের অবলুপ্তি ঘটেছে তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও বিশেষজ্ঞদের মতে ৭০০ থেকে ১০০০ রকমের প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইতিমধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ একর কৃষিজমি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল পরিমাণ বনাঞ্চল নির্মূল হবার পথে। আর এই পরিবেশ দূষণের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। পৃথিবী জুড়ে কীটপতঙ্গ, মানুষ সকলকেই এর ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে

বর্তমান বৎসরে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বর্ষাঋতুর অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং সেইসঙ্গে মার্চের শেষ থেকে অভূতপূর্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি জেলাতে খরার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বিজ্ঞানীদের মতে প্রাকৃতিক ঝড়, ঝঞ্ঝা, এমনকি সুনামীর মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে কোনো মুহূর্তে নেমে আসতে পারে। বিশেষ করে হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল ক্রমশঃ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। হিমবাহের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিমবাহ প্রতি বৎসরে ১০ থেকে ১৫ মিটার পর্যন্ত সরে যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যেই হিমবাহের অবলুপ্তি ঘটবে। এর ফলে নেপাল ও ভুটানের নদীগুলিতে প্রবল বন্যা দেখা দেবে। আমেরিকা এবং জাপানের বিজ্ঞানীরা বহুদিন আগে সে কথা বলে আসছেন, কয়েক লক্ষ বছর ধরে ভারতীয় শিলাস্তরে গভীর বিচ্যুতি ঘটে চলেছে। প্রতি বছর ৪০ মিলিমিটার করে এই স্তর উপর দিকে সরে আসছে, যার ফলে ইউরোপীয় স্তরের উপর ভীষণ চাপ পড়ছে। বিজ্ঞানীরা সুমাত্রা, আন্দামান এবং পাকিস্তানে সংগঠিত ভূমিকম্পের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করছেন। তাদের আরও আশঙ্কা হিমালয়ের উত্তর-পূর্বাংশে দার্জিলিং, সিকিম প্রভৃতি অঞ্চলে ভবিষ্যতে প্রবলতর ভূমিকম্পের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

আজকের পৃথিবীতে ক্রমাগত ভুবন-উষ্ণায়নের ফলে মেরুপ্রদেশ এবং হিমালয়ের মত হিমবাহ অধ্যুষিত পার্বত্যভূমিতে তুষারক্ষেত্র এবং হিমবাহগুলির গলনমাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে জলধার সঙ্কীর্ণ খাতে যে অতিরিক্ত জলপ্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে নিম্নসীমার উপত্যকায় জল সঞ্চিত হয়ে অস্থায়ী সরোবরের জন্ম দিচ্ছে। এরপর ক্রমাগত জল এই সরোবরে জমতে থাকায় এর আকার এবং আয়তনে জলের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশেষে এক সময় জলের চাপে ভেঙ্গে গিয়ে আকস্মিক এক বিচ্ছুরণ বন্যার সৃষ্টি করছে। এই বন্যার আকস্মিকতা এবং জলপ্রবাহের তীব্রতা এত বেশি যে নিম্নতর উপত্যকায় মানুষের বসতি কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই প্লাবিত করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করছে। অতি সম্প্রতি উত্তর সিকিম অঞ্চলে এ ধরনের হড়পা বান পরিলক্ষিত হয়।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণতাবৃদ্ধি কাশ্মীর, হিমাচল, হুমায়ুন, গারোয়াল, নেপাল, ভুটান, অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত অনেক হিমবাহের সামনেই এই জাতীয় হিমসরোবর সৃষ্টি ও তার বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার বিপর্যয় প্রায়শই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পৃথিবীতে শতকরা হিসাবে নাইট্রোজেন ৭৮ ভাগ, অক্সিজেন ২১ ভাগ, আর বাকি ১ ভাগ ওজোন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন ইত্যাদি বর্তমান। এই শেষোক্ত গ্যাসগুলি একত্রে গ্রীনহাউস গ্যাস নামে পরিচিত। মনুষ্যজাত দূষণের ফলে গ্রীনহাউস গ্যাস ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং পৃথিবী ক্রমশঃই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিককালে শুধুমাত্র হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেই নয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলেও হিমবাহগুলির অব্যবহিত সামনে হিমসরোবর সৃষ্টি হয়ে অদূর ভবিষ্যতে এইসব পার্বত্য অঞ্চলে পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা ঘনিয়ে আসছে।

এসব থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে দিনে দিনে প্রকৃতি আমাদের উপর রুষ্ট হচ্ছে। WWF-এর আবহাওয়া বিভাগের বক্তব্য অনুযায়ী পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনে খরা, বন্যা, ঝড়, সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গাছের দৈর্ঘ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। গাছ বেঁটে হয়ে পড়বে। ফলে বহু পাখি থেকে কীটপতঙ্গের বাসস্থান সংকুচিত হয়ে পড়বে। প্রায় ৭০ লক্ষ প্রজাতির গাছপালা আগামী ৩০ বছরের মধ্যে অবলুপ্ত হতে পারে। পাখিদের তিন-চতুর্থাংশ অবলুপ্তির কোপে পড়বে। এছাড়াও পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হতে চলেছে বহু ধরনের খাদ্যশস্যও।

সু শী ল  বি শ্বা স

# জলবাহিত রোগ ও তার প্রতিকার

### ডায়ারিয়া (Diarrhoea), গ্যাসট্রো-এন্টারিটিস (Gastroenteretis)

**কারণ :** সাধারণতঃ জীবাণুমুক্ত জল ও খাবারের সঙ্গে এই রোগ ছড়ায়। মাছি এই রোগ ছড়াবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

**ভাইরাস :** রোটা ভাইরাস, এন্টারো ভাইরাস, অ্যাডিনো ভাইরাস।

**ব্যাকটিরিয়া :** ভিব্রিও কলেরা, ই. কোলাই, সালমোনেলা, সিগেলা।

**প্রোটোজোয়া :** এন্যামিবা হিস্টোলাটিকা, জিয়ারডিয়া (*Giardia lamblia)*। 5 বছরের কম শিশুরা বিশেষ করে (6 মাস থেকে 2 বছর) বেশি আক্রান্ত হয়।

**লক্ষণ :** 3 বা ততোধিক বার পাতলা পায়খানা, ডিহাইড্রেশন হতে পারে। পায়খানার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বমি হতে পারে।

**চিকিৎসা :** O.R.S.। এটা এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। ডিহাইড্রেশন না থাকলে এক গ্লাস জলে 2 চামচ চিনি এবং এক চিমটি নুন মিশাবে। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। ডিহাইড্রেশন বেশি হলে হাসপাআলে ভর্তি করে স্যালাইন দিতে হবে। ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হলে অ্যান্টিবায়োটিক (Ciprofloxacin, Amoxycilin, Ttracline) দরকার।

**প্রতিকার :** পরিশ্রুত জল পান করতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। খাবার ঢেকে রাখতে হবে। বাারের আঢাকা বা কাটা ফল না খাওয়া উচিত। মাছির উৎপাতও বন্ধ করা প্রয়োজন। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। ল্যাট্রিন ব্যবহার করা উচিত। শিশুদের মলমূত্র যথাস্থানে ফেলা দরকার। কাঁচা সবজি খাওয়া অনুচিত। কাঁচা সবজিতে Acetic Acid বা Vinigar (Full Strength) দিলে (Amoeba) নষ্ট হয়। মলত্যাগ করার পরে এবং খাবার আগে সবসময় সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। যারা খাবার তৈরি করেন, তাদের 15 দিন অন্তর পায়খানা পরীক্ষা করে প্রয়োজন বোধে ওযুধ ব্যবহার করা উচিত। তাদের নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া উচিত।

### ডিসান্ট্রি

**কারণ :** Shigella—ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ডিসান্ট্রি হয়ে থাকে। *Shigelia flexneri, S. sonnei, S. bodii, S. dysentery*—এই চার প্রকারের মধ্যে শেষেরটি সবচেয়ে বেশি মারাত্মক।

**লক্ষণ :** পেটে কামড় দিয়ে বারবার অল্প অল্প করে পায়খানা হওয়া এই রোগের লক্ষণ। পায়খানায় শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত থাকতে পারে। সঙ্গে রোগীর জ্বর হতে পারে।

**চিকিৎসা :** এন্টিবায়োটিক ব্যবহার, Dehydration থাকলে ORS বা স্যালাইন দিয়ে তার চিকিৎসা করা উচিত।

**প্রতিকার :** পরিশ্রুত জল পান, খাবার-দাবার পরিষ্কার রাখা। মাছি যাতে খাবারে না বসে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা।

### আমাশয় (Amoebiasis)

**কারণ :** জল ও খাবারের সঙ্গে এই রোগ ছড়িয়ে থাকে। প্রোটোজোয়া : এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা (*Entamoeba histolytica*) জীবাণু এই রোগের কারণ। এই জীবাণুর 'Cyst' জল ও খাবারের মধ্যে দিয়ে মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করে।

**লক্ষণ :** পেটে ব্যাথা, বারবার মলত্যাগ, সঙ্গে Mucus বা শ্লেষ্মা থাকতে পারে, একে Amoebic Dysenteryও বলা যায়। পায়খানা পরীক্ষার দ্বারা রোগ বোঝা যায়।

**চিকিৎসা :** ওযুধ হিসেবে মেট্রোনিডাজোল/টিনিডাজোল খেতে হবে।

**প্রতিকার :** Sanitary Latrine ব্যবহার করা। যত্রতত্র পায়খানা না করা। পরিশ্রুত জল পান করা। জলে যে পরিমাণ ক্লোরিন ব্যবহার কার হয়, তাতে Amoeba ধ্বংস হয় না। এর জন্য জল ফুটিয়ে খেতে হবে।

### কলেরা (Cholera)

**কারণ :** কলেরা Acute Diarrhoeal Disease (classical or ELTOR) নিয়ে প্রকাশিত হয়। *Vibrio cholerae-01* জীবাণুকেই এই রোগের জন্য দায়ী করা হয়। ELTOR BIO-TYPE জীবাণুই বেশি দায়ী।

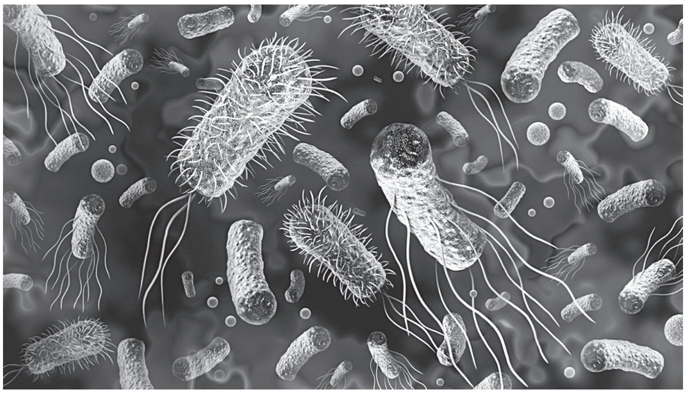

*কলেরার জীবাণু*

**লক্ষণ :** লক্ষণহীন থেকে শুরু করে সাংঘাতিক অসুখ হিসেবে দেখা দিতে পারে। পরে চাল ধোওয়া জলের মতো পায়খানা, সঙ্গে বমি হতে পারে। রোগী Dehydrated হয়ে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মাংস পেশীতে যন্ত্রণা হতে পারে। পেশীর সংকোচন হতে পারে। পেটে ব্যাথা হবে না।

**চিকিৎসা :** ORS (ORAL REHYDRATION SALT) দিতে হবে। অসুখ তীব্র হলে Intravenus Saline দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, যেমন---Doxycycline, Tetracycline, Trimethoprim, Sulfa methoxazole, Furazolidone, Chloramphenicol অথবা Erythromycin ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, দ্রুত Fluid এবং Electrolyte পরিপূরণ করতে হবে। নচেৎ পেশীর Dehydration-এর জন্য আরও জটিলতার সৃষ্টি হবে। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে Furazolidone ব্যবহার করা উচিত।

**প্রতিকার :** 4 থেকে 6 সপ্তাহের ব্যবধানে দুইমাত্রা কলেরা ভ্যাকসিন

নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে Community-তে কলেরা দেখা দিলে এই ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরী। পরিশ্রুত জলপান ও জীবাণুমুক্ত খাবারই এই রোগের প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। এর জন্য সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং রোগীর বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে ত্যাগ করা উচিত।

## এন্টারিক ফিভার (Enteric Fever)

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড রোগকে এন্টারিক ফিভার বলা হয়।

**কারণ :** *Solmonella typhi* ও *S. paratyphi* A এবং B ব্যাকটিরিয়া দ্বার এই রোগ ছড়ায়। জীবাণুযুক্ত খাবার ও মাছি এই রোগের বাহক। পায়খানা ও প্রস্রাবের সঙ্গে এই রোগ ছড়ায়।

**লক্ষণ :** জ্বর শুরু হবার কিছুদিন আগে এবং জ্বর সেরে যাবার পরেও মলমূত্রের সঙ্গে এই রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। লাগাতার 3-4 সপ্তাহ জ্বর এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। মাথা ব্যাথা ও হাতে-পায়ে ব্যাথা থাকে। দিন সাতেক পরে শরীরের বিভিন্ন অংশে Rash দেখা যায়। একে 'Roir's spot' বলে। রোগীর প্লীহা বড় হয়ে যায়।

**চিকিৎসা :** রক্ত ও পায়খানার মল পরীক্ষার দ্বারা এই রোগ ধরা যায়। টাইফয়েড জ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে Test Positive হয়। Anti-microbial Drug যথা— Ofloxacin cefpodonime।

**প্রতিকার :** যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীর চিকিৎসা করা দরকার। হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করে আলাদা ভাবে রাখা উচিত। রোগীর মলমূত্র বন্ধ পাত্রে রেখে 5 শতাংশ Cresol 2 ঘন্টা মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়। রোগীর জামা কাপড় 2% ক্লোরিন দিয়ে স্টীম স্টেরিলাইজড্ করা উচিত। 3-4 মাস পরে রোগীর মলমূত্র 1 বছর পরে আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে বাহক অবস্থায় রয়েছে কিনা। বাহক হলে Ampliicillin ciprofloxacin প্রয়োগ করতে হবে। মলমূত্র ত্যাগ করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া উচিত। Vulnerable group লোকদের টাইফয়েড ভ্যাকসিন দেওয়া উচিত।

## জিয়ারডিসাসিস (Giardiasis)

**কারণ :** *Giardia lamblia* নামক প্রোটোজোয়া সংক্রমণের দ্বারা এই রোগ দেখা দেয়। রোগীর মল পরীক্ষা করার পর সঠিকভাবে রোগটি নিরূপণ করা যায়।

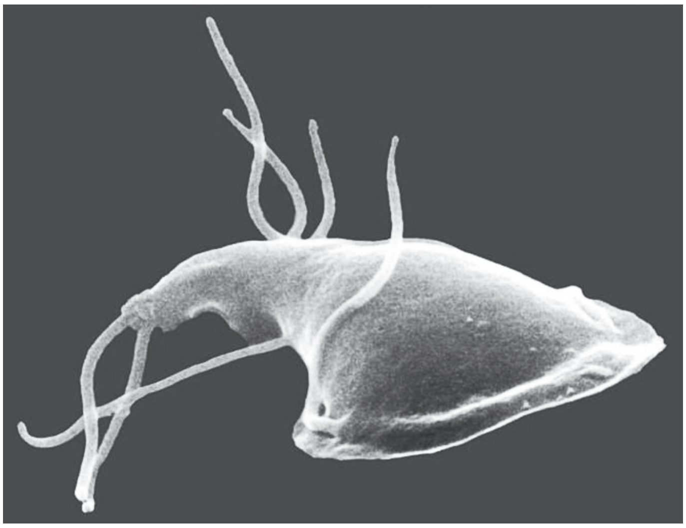

*জিয়ারডিয়াসিস জীবাণু*

**লক্ষণ :** পেটে ব্যাথ্যা, ডায়ারিয়া, বমি, মাথা ঘোরা, বদ হজম, খিদে কমে যাওয়া।

**চিকিৎসা :** এই রোগের ক্ষেত্রে Metronidazole বা Tinidazole ব্যবহার করা যেতে পারে।

**প্রতিকার :** পরিশ্রুত ও জীবাণুমুক্ত পানীয় জল।

## কৃমি সংক্রমণ (Worm Infestation)

বিভিন্ন রকম কৃমি সংক্রমণ (Helminth), যেমন Hook work, round worm (Ascariasis) প্রভৃতি দ্বারা এই রোগ হয়।

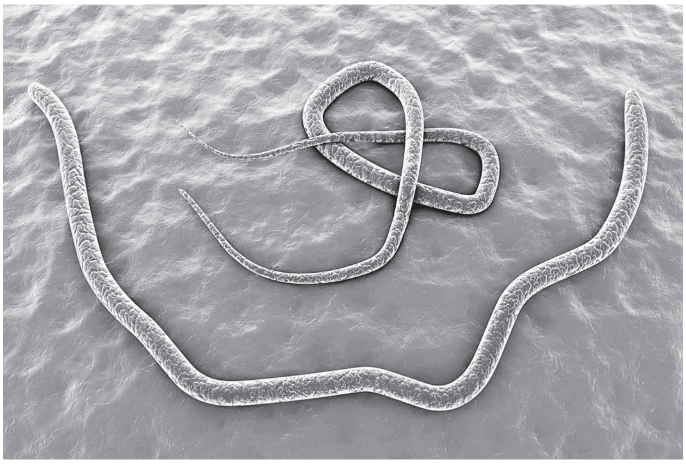

*অ্যাসকারিস জীবাণু*

**লক্ষণ :** পেটে ব্যাথা, বদ হজম, রক্তাল্পতা।

**চিকিৎসা :** Anti-helminthtic জাতীয় ওষুধ, যেমন— Albendazole, Mebendazole ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া Piparzine জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

**প্রতিকার :** পরিশ্রুত পানীয় জলের সংস্থান করা। জল ফুটিয়ে অথবা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে জল ছেঁকে নেওয়া উচিত। সংক্রামিত লোকদের পুকুর বা জলাশয়ে নামা উচিত নয়।

## (জনডিস) ভাইরাল হেপাটাইটিস—A, B, C, D, E

**কারণ :** Hepatitis 'A', Hepatitis B, Hepatitis C এবং Hepatitis D এবং E।

**লক্ষণ :** শরীরে জীবাণু ঢোকার কিছুদিন পর লক্ষণ দেখা দেয়।

**চোখ হলুদ হবার আগে :** খাবারে অরুচি, ক্ষিতে না পাওয়া, কোনো কারণ ছাড়াই বমি বমি ভাব বা বমি হতে থাকা, জিহ্বায় স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা, কোনো কাজকর্মে উৎসাহ না লাগা—সব মিলিয়ে অবসাদ, পেশীতে ব্যাথা, দৃষ্টি ঝাপসা, কখনও কখনও জ্বর থাকে। রোগীর প্রস্রাব হলুদ হয়।

**চোখ হলুদ হবার পর :** বিলিরুবিন চামড়ার কোষে এসে জমলে গা, হাত-পা হলুদ দেখায়। মুখের ভিতরের জিহ্বায় মিউকাস মেমব্রেন-এর উপর বিলিরুবিন জমতে থাকে। ফলে জিহ্বা হলুদ হয়ে যায়। পায়খানা সাদা, কাদা কাদা ভাব। যকৃৎ বড় হয়ে যায়। ফলে পেটের নিচের দিকে ব্যাথ্যা হয়। প্লীহাও বড় হয়ে যায়।

**রোগীর পায়খানা :** এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই রোগের ভাইরাস বেরিয়ে আসে। ফলে মাছি দ্বারা বাহিত হয়ে এই রোগ ছড়াতে পারে। রোগীর পায়খানা পানীয় জলের সঙ্গে মিশে গেলে জল দূষিত হতে পারে এবং লোকে ঐ জল খেলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

যেকোনো বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে এই রোগ হতে পারে। তার শিশু ও যুবকরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। Hepatitis A এবং Hepatitis E জলের সঙ্গে ছড়ায়, Faecal oral route এদের মানবদেহে ঢোকার রাস্তা। এছাড়া Hepatitis B, Hepatitis C এবং Hepatitis D রক্তের সঙ্গে মানবদেহে ঢুকে থাকে, যেমন Blood transfusion। এছাড়া Saliva ও শরীরের অন্যান্য রসের সঙ্গে এই অসুখ ছড়াতে পারে। Hepatitis D এককভাবে শরীরের ক্ষতি করতে পারে না। Hepatitis B থাকলে তার সঙ্গে সহযোগী হয়ে Hepatitis D মানবদেহ সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

**প্রতিরোধের উপায় :** ১) জল দূষণমুক্ত করার জন্য যে ক্লোরিনেশন পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে হেপাটাইটিসের ভাইরাস নষ্ট হয় না। একমাত্র জল $100^o$ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ ফোটালেই এই ভাইরাস সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। তাতে সাবান দিলে ভাইরাসটি পরিষ্কার হয়ে ধুয়ে যায়, তবে সামানে তা বিনষ্ট হয় না।

২) খাবার আগে হাত, থালাবাটি ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, খাবার ঢেকে রাখতে হবে এবং যাতে খাবারে মাছি, পোকা-মাকড় বসতে না পারে। জল ফুটিয়ে খেতে হবে, রাস্তায় ও বাইরের খাবার ও জল এড়িয়ে চলতে হবে। পায়খানার পর ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করা উচিত।

৩) হেপাটাইটিস 'এ' ভ্যাকসিন বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অনেক খরচ সাপেক্ষ। এছাড়া এটি দিলে পুরোপুরি সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব নাও হতে পারে।

**হেপাটাইটিস 'ই' রোগ :** হেপাটাইটিস 'এ'-এর মতো জলবাহিত এবং এই রোগের সংক্রমণ ও চিকিৎসা সবাই হেপাটাইটিস 'এ' রোগের মতোই। প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ হল হেপাটাইটিস 'ই'। গর্ভধারণের পরিণত অবস্থায় এই আক্রমণ ঘাতক হিসেবে দেখা দেয়। তাই গর্ভাবস্থায় জল ফুটিয়ে অর্থাৎ পরিশুদ্ধ জল পান করা অত্যন্ত জরুরী।

**প্রতিরোধের উপায় :** হেপাটাইটিস B, C এবং D রুখতে গেলে Blood transfusion-এর সময় সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ রোগীকে যে Blood দেওয়া হবে, তা যেন সবসময় উক্ত রক্ত ভাইরাস মুক্ত হয়। Hepatitis B vaccine পাওয়া যায়।

**পোলিওমাইলেটিস (Poliomylitis)**

**কারণ :** পোলিও ভাইরাস। ইহা DNA ভাইরাস। এটা তিন ধরনের টাইপ— 1, 2, 3। জল, দুধ, হাত ও মাছির সঙ্গে ছড়ায়। কফ, কাশি এবং পিকের সঙ্গেও ছড়াতে পারে।

**লক্ষণ :** লক্ষণহীনও হতে পারে, ঘাড়ের মাংসপেশী শক্ত হয়ে থাকা এবং ব্যথা হওয়া, হাত পায়ে অবশ হওয়া সঙ্গে গা ম্যাজম্যাজ, বমি, মাথা ধরা, জ্বর, গলা ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটের ব্যথা থাকতে পারে। হাত-পায়ের মাংস শুকিয়ে যেতে পারে।

**চিকিৎসা :** ফিজিও থেরাপি।

**প্রতিকার :** প্রতিষেধক টীকা। ইহা ছাড়া বিশুদ্ধ পানীয় জল ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে।

## গিনি ওয়ার্ম (Dracunculiasis)

**কারণ :** এই রোগটি প্যারাসাইট *Dracunculus medinensis* দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই রোগ পায়ে হয়ে থাকে। জলের সংস্পর্শে স্ত্রী জীবাণুগুলির অসংখ্যা লার্ভা ছড়িয়ে পড়ে এবং 15 দিনের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। মানুষ এই সংক্রামিত জল পান করলে খাদ্যনালীর ও রক্তের মধ্য দিয়ে শরীরের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে চামড়ার নীচে বাসা বাঁধে।

*গিনি ওয়ার্ম জীবাণু*

**লক্ষণ :** পায়ে ক্ষত এবং ফুস্কুরি তৈরি হয়। অনেক সময় ফুস্কুরি দিয়ে জীবাণুটি জলের সংস্পর্শে বেরিয়ে আসে।

**চিকিৎসা :** Niridazone, Mebendazole এবং Albendazole প্রভৃতি ওষুধ।

**প্রতিকার :** পরিশ্রুত পানীয় জলের সংস্থান করা। জল ফুটিয়ে অথবা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে ছেঁকে নেওয়া উচিত। সংক্রামিত লোকদের পুকুরে নামা উচিত নয়।

## রাসায়নিক পদার্থজনিত রোগ

১। **ক্রোমিয়াম :** চর্মরোগ, ক্যানসার। সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রা—0.05 মি.গ্রা./প্রতি লিঃ। এর কম মাত্রায় থাকলে স্বাস্থ্যহানি ঘটায় না।

২। **আর্সেনিক :** চর্মরোগ, রক্তশূন্যতা, অঙ্গহানী ও ক্যানসার প্রভৃতি।

৩। **লোহা :** কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল।

৪। **অভ্র (মাইকা) :** পাতলা পায়খানা।

৫। **ক্লোরাইড :** হাড় ও দাঁতের রোগ—ফ্লুরোসিস।

৬। **নাইট্রেট :** রক্তের রোগ—মিথহিমোগ্লোবিনিমিয়া যাতে হিমোগ্লোবিনের কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। তিন মাসের কমবয়সী শিশুরা যারা বোতলের খাবার খায়, তারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

৭। **ক্লোরিনেশন :** জলে বেশি মাত্রায় ক্লোরিন থাকলে জলের স্বাদ ও রঙ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে জলে ক্লোরিন প্রয়োগ করলে কিছু হ্যালোজেনেট যৌগ পদার্থ তৈরি হয়। ইহা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিছু কিছু হ্যালোজেনেট যৌগ পদার্থকে ক্যান্সারের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু হ্যালোজেনেট যৌগ পদার্থকে ভবিষ্যতে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে সন্দেহ করা হয়।

তা প স  স র কা র

# প্রাণীদের জল বাহিত রোগ ও তার প্রতিকার

*বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে জলের অস্তিত্বের কারণেই। প্রাণ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান হলো জল। পৃথিবীর মোট উপাদানের ৭০ ভাগ জল হওয়া সত্ত্বেও জীবকুলের ব্যবহারযোগ্য জল খুবই সীমিত। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নয়নের অভিঘাতে, এই সীমিত পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য জলও মানুষের যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহারের ফলে সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবহারযোগ্য জলের ভান্ডার যত কমছে ততই দূষিত হচ্ছে পানীয় জল, তা সে বিভিন্ন রাসায়নিক দূষণেই হোক বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র  জীবাণু সংক্রমণেই হোক। পানীয় জল দূষণের কারণে বর্তমানে মানুষসহ সমস্ত প্রাণীকুলকেই বিভিন্ন জলবাহিত রোগের শিকার হতে হচ্ছে। গৃহপালিত প্রাণীসহ বন্যপ্রাণের মধ্যেও কিভাবে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে তার একটা সংক্ষিপ্তসার এখানে আলোচিত হল।*

মানুষের মতো প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহেরও শতকরা সত্তর ভাগ পদার্থই হলো জল। প্রাণীদেহের নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজ সহ দেহের তাপমাত্রার সমতা বজায় রাখার জন্য জলের প্রয়োজন। গবাদি প্রাণীদের অধিক দুধ উৎপাদনের ক্ষমতাও নির্ভর করে সঠিক পরিমাণের পরিশ্রুত জল গ্রহণের উপর। কিন্তু সেই জল যদি পরিশ্রুত না হয়ে দূষিত হয়, তাহলেই একাধিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রধানতঃ বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু সংক্রামিত পানীয় জলের মাধ্যমেই দেহে জল বাহিত রোগের উপদ্রব ঘটে। এছাড়া স্নান বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সময়েও দূষিত জলের সংস্পর্শে প্রাণী দেহে জল বাহিত রোগ সংক্রামিত হয়। পান করার এই জল দূষিত হয় বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের মলমূত্র, দেহ নিঃসৃত অন্যান্য পদার্থ জলের উৎস স্থলে বা সরবরাহের নলবাহিত গতিপথে মিশে গিয়ে। রাসায়নিক দূষণ ঘটে যখন বিভিন্ন কলকারখানা নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক পানীয় জলে মিশ্রিত হয়। কৃষি কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক পাণীয় জলে মিশে গিয়ে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। প্রাণীদের জল বাহিত জীবাণু ঘটিত রোগসমূহের একটা বড় অংশ মানুষের দেহেও রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগ গুলিকে 'জুনোটিক' রোগ বলে যা মানুষ থেকে প্রাণীতে বা প্রাণী থেকে মানুষে সংক্রামিত হতে পারে। জল বাহিত জুনোটিক রোগের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এবার দেখে নেওয়া যাক জল বাহিত জীবাণু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি) ঘটিত কি কি রোগ প্রাণী দেহে সংক্রামিত হয় এবং কি তার প্রতিকার।

### প্রাণী দেহে জল বাহিত রোগ

উপরে উল্লেখিত রোগসমূহ ছাড়াও আরো অনেক জল বাহিত জীবাণুঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সেগুলো আমাদের দেশে খুব কম দেখা যায় বলে আলোচনার বাইরে রাখা হলো। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংক্রামিত জলবাহিত রোগের কবল থেকে প্রাণীকুলকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় পরিশ্রুত জীবাণু বিহীন জল প্রাণীদেরকে সরবরাহ করা শুধুমাত্র পানের জন্য নয়, স্নান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্য কাজে ব্যবহারের জন্যও। প্রাণীদের খাবার তৈরি বা খাবার ও জলের পাত্র পরিষ্কারের জন্যও পরিশ্রুত জলের প্রয়োজন।

জলের পাঁচটি বিশেষ গুণগত মান যদি বজায় রাখা যায় তা প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলে বিবেচিত হয়।

(১) গন্ধ এবং স্বাদ

(২) ভৌত রাসায়নিক ধর্ম (pH), মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ (T D S),  মোট দ্রবীভূত অক্সিজেন, ক্ষারত্ব

(৩) বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি (ভারী ধাতু, বিষাক্ত খনিজ আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ইত্যাদি)

৪) অতিরিক্ত পরিমাণে খনিজ পদার্থের উপস্থিতি(নাইট্রেট, সোডিয়াম সালফেট, লৌহ ইত্যাদি)

(৫) রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি) উপস্থিতি। সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জলের এই সব গুণগতমান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয় বলে সাধারণভাবে মানুষের পানের বা ব্যবহারের উপযোগী জল যদি প্রাণীদেরকে সরবরাহ করা হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান অনেকটাই করা যায়।  কিন্তু দেখা যায় যে, মানুষের ক্ষেত্রে পান বা ব্যবহারের জলের গুণগত মান নিয়ে আমরা যতটা সতর্ক থাকি প্রাণীদের ক্ষেত্রে ততটাই অবহেলা করি।  তারই ফলশ্রুতিতে প্রাণীদের দেহে নানাবিধ জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাই আসুন প্রাণীদেরকে আলাদা করে না দেখে, এই প্রবণতা থেকে বিরত থাকি এবং সার্বিকভাবে প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করি।

### পাদটিকা

#### জুনোটিক রোগ

যে সব রোগ প্রাণীদেহ থেকে মানুষের দেহে  বা মানুষ থেকে প্রাণীদেহে সংক্রামিত হতে পারে তাদেরকে জুনোটিক রোগ বলে। জুনোটিক রোগ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক বা পরজীবী গঠিত হতে পারে। যেমন, অ্যানথ্রাক্স, টি বি, জলাতঙ্ক, বার্ড ফ্লু, ক্যান্ডিডিয়াসিস ইত্যাদি।

#### ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ

ব্যাকটেরিয়া  নামক এক প্রকারের আদি  নিউক্লিয়াসযুক্ত,  এককোষী, আণুবীক্ষণিক জীব দ্বারা সৃষ্ট রোগ সমূহকেই ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ বলে। যেমন— অ্যানথ্রাক্স ব্রসেলোসিস টিউবারকিউলোসিস ইত্যাদি।

#### ভাইরাস ঘটিত রোগ

ভাইরাস নামক জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী, অতি ক্ষুদ্র, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দ্রষ্টব্য, অতি সংক্রামক জৈবিক সত্তা দ্বারা সৃষ্ট রোগ সমূহকে ভাইরাস ঘটিত রোগ বলে। যেমন— জলাতঙ্ক, বসন্ত, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি।

#### টিকা

যে জৈব রাসায়নিক যৌগ শরীরে  অনক্রমতা  তৈরীর প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে কোনো রোগের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাতে সাহায্য করে তাকে টিকা বা ভ্যাকসিন বলে। যেমন—  বসন্তের টিকা,  পোলিও টিকা, যক্ষার টিকা ইত্যাদি।

**টিডিএস (টোটাল ডিসলভ সলিড) :** টিডিএস মানে জলে দ্রবীভূত কঠিন (অজৈব ও জৈব) পদার্থের একটি পরিমাপ। এটি পার্ট প্রতি মিলিয়ান (পি পি এম)  হিসাবে প্রকাশ করা হয়।  অজৈব পদার্থ আণবিক, আয়নিত বা মাইক্রোগ্রানুলার অর্থাৎ কোলয়ডাল অবস্থায় জলে দ্রবীভূত থাকে। টি ডি এস জলের একটি অন্যতম প্রধান নান্দনিক বৈশিষ্ট্য এবং এই একই সাথে রাসায়নিক দূষণের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন মাধ্যম, পাথর, পাইপ লাইন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে এইসব পদার্থের কণাগুলি জলে মিশ্রিত হয়। পানীয় জলের গুণগত মান নির্ভর করে টি ডি এস-এর পরিমাপের উপর। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বি আই এস) নিয়ম অনুযায়ী পানীয় জলের টি ডি এস হতে হবে ৫০০ পি পি এম-এর মধ্যে। ওয়ার্ল হেলথ্ অর্গানাইজেশনের নিয়ম অনুযায়ী ৩০০ পি পি এম-এর নীচে। কিন্তু কোনভাবেই পানীয় জলের টি ডি এস ৫০ পি পি এম-এর নীচে হওয়া চলবে না। বৃষ্টির জলের টি ডি এস ২০ পি পি এমের আশেপাশে থাকার জন্য বৃষ্টির জল পানের অযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। শরীরের পুষ্টির জন্য কিছু অজৈব লবণ  জোগানের প্রয়োজনে পানীয় জলের টি ডি এস ৫০-১৫০ পি পি এম-এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

# প্রাণীদেহে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জলবাহিত রোগ

| ক্রমিক নং | রোগের নাম | কারণ/ জীবাণুর নাম | আক্রান্ত প্রাণী | রোগের উপসর্গ | প্রাণীদেহে কীভাবে সংক্রামিত হয় | চিকিৎসা ও প্রতিকার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | লেপ্টোস্পাইরোসিস (ব্যাকটেরিয়া ঘটিত জুনোটিক রোগ) | লেপ্টোস্পাইরা স্পিসিস | গরু, ছাগল, কুকুর, শূকর, বন্যপ্রাণী, ইঁদুর | জ্বর, বমি, পেটব্যথা, পাতলা পায়খানা, ক্ষুধামান্দ্য, মাংস-পেশীতে ব্যথা, কিডনি ও লিভারের ক্ষতি। | আক্রান্ত প্রাণীর মূত্র ও মল মিশ্রিত জল সুস্থ প্রাণীর সংস্পর্শে বা খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হলে। | অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য উপসর্গমাফিক চিকিৎসা, কুকুরের বাইসরিক টীকাকরণ। |
| ২ | সালমোনেল্লোসিস, টাইফয়েড (ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ) | সালমোনেল্লা স্পিসিস | গরু, ছাগল, শূকর, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, মুরগি | পাতলা পায়খানা, জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, শরীরে জল ও লবণের ভারসাম্য হারিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। | আক্রান্ত প্রাণীর পায়খানা মিশ্রিত জল পান বা ব্যবহার। | অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য উপসর্গ মাফিক চিকিৎসা। মুরগী খামারে নিয়মিত রক্তপরীক্ষা ও জৈব সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। |
| ৩ | কোলিব্যাসিলোসিস (ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ) | ইশ্চেরিশিয়া কোলাই | মুরগী, হাঁস, বাছুর, কুকুর, খরগোস | পাতলা পায়খানা, বমি, পেটব্যথা, জ্বর, সেপটিসেমিয়া। | আক্রান্ত প্রাণীর ও হাঁস, মুরগীর পায়খানা মিশ্রিত জল, সুস্থ প্রাণী দ্বারা পান বা ব্যবহৃত হলে। | অ্যান্টিবায়োটিক, ও-আর-এস, শিরায় স্যালাইন। |
| ৪ | রোটাভাইরাল ডায়রিয়া (ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ) | বোভাইন রোটাভাইরাস | গরু, মহিষের বাচ্চা | পাতলা পায়খানা, ক্ষুধামান্দ্য, জলশূন্য হয়ে মৃত্যু। | আক্রান্ত বাছুরে মল দ্বারা দূষিত জল সুস্থ বাছুরের পান বা ব্যবহারের মাধ্যমে। | প্রচুর পরিমাণে ও.আর.এস., অ্যান্টিবায়োটিক, প্রয়োজনে শিরায় ডেস্ট্রোজ স্যালাইন ইনজেকশন। |
| ৫ | পার্ভো | পার্ভো ভাইরাস | কুকুর, শিয়াল ও নেকড়ে জাতীয় প্রাণী | বমি, পাতলা ও রক্ত পায়খানা, ক্ষুধামান্দ্য। | আক্রান্ত প্রাণীর পায়খানা, বমি বা অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত পানীয় জলের মাধ্যমে। | উপসর্গ মাফিক চিকিৎসা, কুকুরের বাৎসরিক টীকাকরণ |
| ৬ | রানীক্ষেত রোগ | নিউ ক্যাসল ডিজিজ ভাইরাস | মুরগী, পায়রা | ঝিমুনি, সাদা পাতলা পায়খানা, মৃত্যু। | আক্রান্ত প্রাণীর মল ও দেহনিঃসৃত রস, সুস্থ প্রাণীর পানীয় জলের সংস্পর্শে এলে। | উপসর্গ মাফিক চিকিৎসা ও নিয়মিত টীকাকরণ। |
| ৭ | কক্সিডিয়োসিস (প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ) | আইসেরিয়া স্পিসিস | মুরগী, বাছুর, খরগোশ | রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা, ক্ষুধামান্দ্য, জলশূন্যতা। | আক্রান্ত প্রাণীর পায়খানা মিশ্রিত জলের মাধ্যমে। | অ্যান্টিপ্রোটোজোয়া ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক, প্রয়োজনে শিরায় স্যালাইন, ইনজেকশন। |
| ৮ | জিয়াডিয়াসিস (প্রোটোজোয়া ঘটিত জুনোটিক রোগ) | জিয়াডিয়া স্পিসিস | কুকুর, বেড়াল, গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর | দুর্গন্ধযুক্ত ও জলের মতো পাতলা পায়খানা, পেটব্যথা। | আক্রান্ত প্রাণীর পায়খানা, সুস্থ প্রাণীর খাওয়ার জলের সংস্পর্শে এলে। | অ্যান্টিপ্রোটোজোয়া ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক |
| ৯ | ফ্লুয়োরোসিস | ফ্লোরাইড দূষণ ঘটিত রোগ | গরু, মহিষ | দেহের ওজন হ্রাস, দাঁতের অস্বাভাবিক গঠন, খাদ্য ও জল গ্রহণে অসুবিধা, দুধের উৎপাদন হ্রাস। | ফ্লোরাইড দূষিত ভূগর্ভস্থ জল দীর্ঘদিন পান করলে। | ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, শিরাতে ইনজেকশন। ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড সেবন, ফ্লোরাইড মুক্ত জলপান। ভিটামিন ই এবং |
| ১০ | আর্সেনিকোসিস | আর্সেনিক দূষণ ঘটিত রোগ | গরু, মহিষ | পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানা, রক্ত-আমাশা, টলোমলো হাঁটাচলা। | আর্সেনাইট, আর্সিনেট যৌগ দ্বারা দূষিত ভূগর্ভস্থ জল দীর্ঘদিন পান করলে। | সেলেনিয়াসযুক্ত ওষুধ সেবন। অন্যান্য উপসর্গ মাফিক চিকিৎসা। আর্সেনিক যুক্ত জল পান করা। |

* উপরে সারণিতে বর্ণিত রোগগুলি মূলত জল দ্বারা বাহিত রোগ বলে চিহ্নিত হলেও বেশকিছু রোগ যারা মূলত অন্যভাবে প্রাণীকে আক্রমণ করে, তারাও জলের মাধ্যমে প্রাণীতে প্রবেশ করতে পারে। যেমন, অ্যানথ্রাস, ব্রুসেলোসিস, প্যারাটিউবারকুলোসিস, এফ.এম.ডি., কানাইন ডিসটেম্পার ইত্যাদি।

প্রদীপ কুমার দাস

# প্রাণী সম্পদ উৎপাাদনে পরিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা

দেহের ৬০-৭০ শতাংশ হল জল। জল ছাড়া শরীরের কোন রাসায়নিক বা বিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না। তাই জল ছাড়া কোন জীব বাঁচেও না। পানীয় জলে নানান রকম রোগ-জীবাণু সমেত বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব পদার্থের কম বেশি উপস্থিতি শরীরের স্বাভাবিক জীবন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। রোগ-ব্যাধি তৈরি হয়। ফলে অর্থকরী প্রাণীজ সম্পদ যেমন দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসের উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কমে যায়। এর ফলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিতে পারে। এই প্রবন্ধে প্রাণীজ সম্পদ উৎপাদনে পরিশুদ্ধ জলের গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

জলের অপর নাম জীবন। এক কোষী জীব থেকে বহু কোষী প্রাণী—সকলের কোষেই প্রায় ৭০ ভাগই জল। বহু কোষী জীবের সারা দেহে জলে পরিমাণ ৬০-৭০ শতাংশ। দেহের মধ্যে থাকা জলের বেশির ভাগ প্রায় ৫৫ শতাংশ) থাকে কোষের ভিতর। বাকি জল থাকে দুই কোষ মধ্যবর্তী ফাঁক, রক্ত, হাড় ইত্যাদি নানান অংশে। জলের তাপ ধারণ করার ক্ষমতা বেশি বলে দেহের ভিতরকার নানান রকম রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরি হওয়া তাপ জল গ্রহণ করে নেয়। ফলে প্রাণীর শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা বাড়ে না। কাজেই জল ছাড়া কোন প্রাণী শরীরের সাধারণ বিপাক ক্রিয়া করতে পারেনা। এই কারণে জলশূন্য পরিবেশে কোন প্রাণী বাঁচতে পারেনা। এই কথাটি প্রযোজ্য জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও। তাই, কোন ব্যবহারযোগ্য বস্তুকে শুকিয়ে অর্থাৎ জলশূন্য করে, ঐ বস্তুর গায়ে লেগে থাকা জীবাণুকে সহজেই মেরে ফেলা যায়।

এই আলোচনা কেবলমাত্র অর্থকরী প্রাণীর দেহে জলের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুস্থ জীবনের জন্য প্রাণীদের দেহে পরিমিত জলের ঘাটতি হলে ব্যাহত হবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি। ফলে কমে যাবে দুধ, মাংস, ডিমের উৎপাদন। কোন প্রাণীর বৃদ্ধির সময় কত কতটা পরিমান পানীয় জল লাগতে পারে তা নিচে সারণী ১ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণী ১ : অর্থকরী প্রাণীদের গড়ে দৈনিক পানীয় জলের পরিমাণ (লিটার)

| প্রাণী | কম বয়স | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|---|
| **গরু** | ১৫-২০ লি. | ৪০-৫৫ লি. | ৪০-৫০ লি. (দুধেল অবস্থায় প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত ৫ লি.) |
| **ছাগল ভেড়া** | ২-৪ লি. | ১১ লি. | ৮ লি.( দুধেল অবস্থায় ১১ লি.) |
| **শুকর** | ৬-৮ লি. | ১২-১৫ লি. | ১০-১২ লি. গর্ভবতী অবস্থায়<br>২০-৩০ লি. দুধেল অবস্থায় |
| **খরগোশ** | ২ মাসের নিচেঃ ৩০০ মি.লি.<br>২ মাসের উপরেঃ ৬০০মি.লি | | ৪০০মি.লি.<br>৩০০ মি.লি. (দুধেল অবস্থায় ৩৫০মি. লি.) |

**মুরগি—** ১ম মাসেঃ ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫০-২৫০ মি.লি.
(ব্রয়লার)—১ম মাসে ঃ ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫০-৪০০ মি.লি

---

মুরগি— ২য় মাসে ঃ ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩৫০-৫০০ মি.লি.
(ব্রয়লার)—২য় মাসে ঃ ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫৫০-৭৫০ মি.লি.

---

মুরগি ডিম পাড়ার আগে ১০০ মি.লি.
(ডিম পাড়া) ডিম পাড়ার সময় ২৫০ মি.লি.

সারণি ১ থেকে বোঝা যায় যে কম বয়সের প্রাণী বা পাখিরা পূর্ণবয়স্কদের থেকে দেহের ওজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে জল গ্রহণ করে। আবার যে কোন বয়সে আবহাওয়ার তাপমাত্রা বাড়লে, বিশেষত গরমের সময় সাধারণ প্রয়োজনের তুলনায় জল বেশি গ্রহণ করে। ফলে গত কয়েক বছরে আবহাওয়ার ব্যাপক তারতম্যে প্রতিদিনের জলের পরিমাণ অনেকটা পার্থক্য হচ্ছে। খামারি বা পাখি চর্চাকারীদের পক্ষে এই তারতম্য ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নাহলে প্রাণী ও পাখিদের শারীরিক বৃদ্ধি বেশি মাত্রায় ব্যাহত হবে। ফলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। সেই কারণেই প্রাণীদের জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। শর্করা, প্রোটিন, চর্বি জাতীয় পদার্থের মত জল হল একটি অন্যতম পুষ্টি পদার্থ। জলকে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে ধরা হয়, যাদের শরীরে বেশি পরিমাণে গ্রহণ না করলে বিপাক ক্রিয়া বিঘ্নিত হবে।

পানীয় জল হতে হবে বিশুদ্ধ। না হলে শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। জল অবিশুদ্ধ হতে পারে দুইভাবে। ১) যদি রোগ সৃষ্টিকারী জীব বা জীবাণু পানীয় জলে বেশি পরিমাণে থাকে তবে তা রোগ সৃষ্টি করে । ব্যাকটেরিয়ার ছাড়া নানান পরজীবী, শৈবাল বা শ্যাওলা (অ্যালগী) এমনকি জীবানু নাশক (পেস্টিসাইড) এর অবশেষ মাটির মধ্যে দিয়ে পানীয় জলের প্রবেশ করে এবং প্রাণীর শরীরে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। ২) পানীয় জলে নানান ধাতব ও অধাতব পদার্থের অতিরিক্ত উপস্থিতি।

সারণী ২ ঃ পানীয় জলে কিছু ধাতব মৌলের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুরক্ষিত উপস্থিতির পরিমাণ

| মৌল (একক/ যৌগের মাধ্যমে) | সর্বোচ্চ গ্রহণ যোগ্য উপস্থিতি (মি. গ্রা. প্রতি লিটারে) |
|---|---|
| ক্যাডমিয়াম Cd | 0.0005 |
| সীসা (লেড) Pb | 0.015 |
| পারদ (মার্কারি) Hg | 0.01 |
| আর্সেনিক As | 0.05 |
| সেলোনিয়াম Se | 0.05 |
| ক্রোমিয়াম Cr | 0.1 |
| অ্যালুমিনিয়াম Al | 0.5 |
| কোবাল্ট Co | 1.0 |
| তামা Cu | 1.0 |
| ফ্লোরিন F | 2.0 |
| জিংক Zn | 5.0 |

সারণি ২ তে ধাতব মৌলগুলির কতটা সর্বোচ্চ পরিমাণ উপস্থিতি স্বীকৃতিযোগ্য তা বর্ণনা করা হয়েছে। অতিরিক্ত লোহা, তামা, সিসা, আর্সেনিক, ম্যাঙ্গানিজ কোবাল্ট, আয়োডিন প্রাণী শরীরে টক্সিক বা বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। পানীয় জলে নাইট্রেট পরিমাণ ৪৪ পিপিএমের বেশি হলে খিদে কমে যাওয়া, বন্ধ্যাত্ব, দুধ কমে যাওয়া এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। প্রতি লিটার পানীয় জলে এক গ্রামের বেশি পরিমাণে সালফেট মস্তিষ্কে প্রদাহ জনিত 'পোলিওএন সেফালো ম্যালেসিয়া' নামক একধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এর ফলে আক্রান্ত প্রাণীরা অন্ধ ও দিকভ্রষ্ট হয়ে যায়।

পানীয় জলে নানান ধরনের ধাতবের সমষ্টির টিডিএস বা টোটাল ডিসবলড সলিড এর পরিমাণ প্রতি লিটারে এক গ্রামের নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়। মুরগিরা জলে টিডিএস এর সামান্য তারতম্যে বেশি আক্রান্ত হয়। প্রতি লিটারে ৫-৭গ্রাম Total disolve solid (টি.ডি.এস)-এ পাতলা পায়খানা হয়ে পাখির মৃত্যু হতে পারে। অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১০ শতাংশ হ্রাস পায়। পানীয় জলের pH ৬-৮ এর কম বেশি হলে হজম সমস্যা হতে পারে।

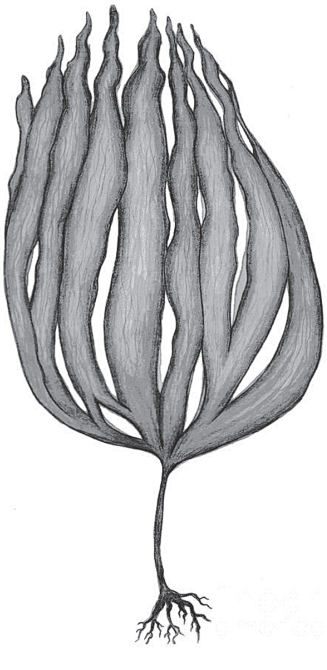

সবুজ শ্যাওলা

পানীয় জলে নীল সবুজ শ্যাওলার উপস্থিতিতে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেশিতে অস্বাভাবিক কম্পন হয়, মারাও যেতে পারে। প্রতি ১০০ লি. পানীয় জলে ৫.২৫% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের (NaClO) দ্রবণ ৩০-৪৫ মি. লি. মিশিয়ে জলে থাকা শ্যাওলা বিনষ্ট হতে পারে। জলের পাত্র সবসময় ধুয়ে ব্যবহার করা দরকার। মাঝে মাঝে পটাশ জল (প্রতি লিটারে ৩৩গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট $KMnO_4$) দিয়ে ধোয়া দরকার। পুকুর খাল বিল নদীর জলে নানান আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ থেকে জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে নানান রোগ জীবাণু। রোগগ্রস্ত প্রাণীর মল মূত্র ও মৃত দেহাবশেষ জলে মিশে গিয়ে সমস্যা তৈরি করে।

একই কথা প্রযোজ্য মাছ চাষের পুকুরে জলের ক্ষেত্রে। মাছের পুকুরে জলের বিশুদ্ধতার গুণমান পরীক্ষার জন্য কিছু নির্দিস্ট মাপকাঠি আছে। পুকুরের জলের pH 7.5-8.5, আর পুকুরের মাটির pH 6.5 থেকে 8.5, হলে ভালো। নানান জৈব পদার্থের পচনে pH কমে যেতে পারে। নিয়মিত চুন প্রয়োগ করে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জলের ক্ষরতা (Hardness) ১০০-১৫০ মি.গ্রা. প্রতি লিটার জলে থাকলে ভালো। পুকুরের জলে উপযুক্ত পরিমাণে উদ্ভিদণা (phytoplankton) থাকলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫-৮ মি.গ্রা. প্রতি লিটারে থাকবে। উদ্ভিদণার সাথে প্রাণীকণা (Zoo-plankton) ঠিক পরিমাণে থাকলে জলের স্বচ্ছতা ১৫-৩০ সে.মি. এর মধ্যে থাকে। নানান রকম দূষিত রাসায়নিকের প্রভাবে মাছ চাষের জলে এই গুণমানগুলির তারতম্য হলে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায়।

সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে শুধু পানীয় জল নয়, প্রাণীদের স্নানে ব্যবহৃত জল, থালা-বাসন ধোয়ার সময়ও বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করা উচিত, নতুবা রোগ জীবাণুর সংক্রমনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ফলে প্রাণীরা বিভিন্ন জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে নলকূপের জল ব্যবহার করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে জল অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে জলের গুণ মান ঠিক আছে কিনা। মাছের পুকুরে জল নিয়ম করে পরীক্ষা করা দরকার।

আলোচনায় বোঝা যায় পরিশুদ্ধ জল ছাড়া সুস্থ্য দেহ রক্ষা এবং উপযুক্ত প্রাণীজ সম্পদ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার বর্তমানে ভারতীয়রা প্রাপ্ত জলের মাত্র ৪ শতাংশ ব্যবহার করতে পারছে। প্রায় ১৬ কোটির বেশি দেশবাসী বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না। তার উপরে চরম প্রাকৃতিক কারণে এই পরিমাণ ক্রমশ আরো কমছে। বলাই বাহুল্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবহারযোগ্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিমাণ অনেক কম। ফলে প্রাণীরা আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। বিপদের সম্মুখীন খাদ্য নিরাপত্তা।

**তথ্যসূত্র**


1. LeChevallier M. W. and Au K-K. (2004). Water Treatment and Pathogen Control: Process Efficiency in Achieving Safe Drinking Water. WHO Drinking Water Quality Series. Published on behalf of the World Health Organization by IWA Publishing, London, UK.
2. Praveen P. K., Ganguly S., Wakchaure R., Para P. A., Mahajan T., Qadri K., Kamble S., Sharma R., Shekhar S. and Dalai N. (2016).Water-borne Diseases and its Effect on Domestic Animals and Human Health: A Review. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 6(1): 242-245.
3. Wakchaure R., Ganguly S. and Praveen P. K. (2015).Role of Water in Livestock. Rec. Adv. Acad. Sc. Jour. 1: 53-56.



## পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

**মুখ্য পরিবেশক : ২ নং ডেকার্স লেন, রবি সাহা, কলকাতা-৬৯ M. 8961066724**

**• স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/ 9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365, অজয় মজুমদার M. 8918824281 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 • দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 • বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231 • তাপস কুমার প্রামাণিক, নোভা, কলকাতা M. 9836133980 • সমীর নাগ, বহরমপুর M. 9434856154 • দিলীপ দাস, বিজ্ঞান ভাবনা, বহরমপুর M. 8926454316**

তু ষা র  কা ন্তি  না থ

# প্ল্যাঙ্কটন—জলের প্রাণ কণিকা

*প্ল্যাঙ্কটন বলতে আমরা যে কোন ছোট জলজ ভাসমান জীবদের বুঝি যারা জলস্রোতের মাধ্যমে ভেসে বেড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, প্ল্যাঙ্কটন হল বিভিন্ন শ্রেণির জীবের সমষ্টি, যার মধ্যে আছে ব্যাকটেরিয়া, আর্কিব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, শৈবাল, আণুবীক্ষণিক ছত্রাক ইত্যাদি। কোষের প্রকৃতি, পুষ্টি-পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে প্ল্যাঙ্কটনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং জু-প্ল্যাঙ্কটন। আয়তন অনুসারে প্ল্যাঙ্কটন পাঁচ প্রকার, যথা — মেগাপ্ল্যাঙ্কটন, ম্যাক্রোপ্ল্যাঙ্কটন, মেসোপ্ল্যাঙ্কটন, মাইক্রোপ্ল্যাঙ্কটন এবং ন্যানোপ্ল্যাঙ্কটন। প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে জলজ বিভিন্ন অজীবজাত উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্যশৃঙ্খলের একেবারে শুরুতে অবস্থান করে প্ল্যাঙ্কটন জলজ বাস্তুতন্ত্রের শক্তির ও খাদ্যের ভারসাম্য বজায় রাখে।*

চেক রিপাবলিকে অনুষ্ঠিত হল 'ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। সময়টা ছিল ২০২১ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর। সেখানে ডাচ চলচ্চিত্র নির্মাতা, জ্যান ভান ইজেনের একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ফিল্ম প্রদর্শিত হয়, নাম—'প্ল্যাঙ্কটোনিয়াম'। ফিল্মটিতে সুর সংযোজনা করেন নরওয়ের বিখ্যাত শিল্পী জানা উইন্ডারেন। 'প্ল্যাঙ্কটোনিয়াম'-এ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের উপস্থিতি থাকলেও, ছিল না কোন কথোপকথন। আদতে কোন মনুষ্য চরিত্রই ছিল না সেখানে। জলজ, ভাসমান হরেক রকম আণুবীক্ষণিক জীবসমূহই পালন করেছিল বিভিন্ন কুশীলবের ভূমিকা। জীবন্ত, আণুবীক্ষণিক প্ল্যাঙ্কটনের অদৃশ্য জগৎ ও জীবন কাহিনি নিয়ে এই অভূতপূর্ব ফিল্মটি তৈরি হয়েছিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্ল্যাঙ্কটনের বিস্তারিত গঠনও বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন দৃশ্যে। ২০২৩ সালে 'প্ল্যাঙ্কটোনিয়াম', 'Short Cutz Amsterdam Annual Award'-এ ভূষিত হয়ে সেরা ডকুমেন্টারি, সেরা সিনেমাটোগ্রাফি এবং সেরা সাউন্ড ট্র্যাক এর শিরোপা লাভ করে।

### প্ল্যাঙ্কটন কারা?

প্ল্যাঙ্কটন কী এমন বিষয়, যা নিয়ে তৈরি হতে পারে সারা বিশ্বে সাড়া জাগানো এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত তথ্যচিত্র? প্ল্যাঙ্কটন বলতে আমরা যে কোন ছোট (দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইক্রন থেকে কয়েক সেন্টিমিটার) জলজ ভাসমান জীবদের বুঝি যারা সাধারণত জলে সাঁতার কাটতে পারে না এবং জলস্রোতের মাধ্যমে ভেসে বেড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, প্ল্যাঙ্কটন হল বিভিন্ন শ্রেণির জীবের সমষ্টি, যার মধ্যে আছে ব্যাকটেরিয়া, আর্কিব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, শৈবাল, আণুবীক্ষণিক ছত্রাক ইত্যাদি। গ্রিক শব্দ 'drifter' বা 'wanderer' থেকেই প্ল্যাঙ্কটন কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে। প্ল্যাঙ্কটন কিন্তু নেকটন ও বেনথস শ্রেণীর জীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির জীব সমষ্টি। নেকটন জলে সাঁতার কাটতে পারে। অন্যদিকে, বেনথস হল জলাশয়ের তলদেশে বসবাসকারী গমনে অক্ষম জীবসমূহ। আবার, ভাসমান বৃহদাকার seaweeds (যেমন argassum) বা বহুকোষী অনেক শৈবালকেও প্ল্যাঙ্কটন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

*ভিক্টর হেনসেন*

জার্মান প্রাণীবিদ এবং সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী ভিক্টর হেনসেন ১৮৮৭ সালে প্রথম 'প্ল্যাঙ্কটন' শব্দটি প্রচলন করেন। তিনিই প্রথম প্ল্যাঙ্কটন হিসাবে বিভিন্ন জীবদের সনাক্তকরণ করেন এবং তাদের গঠন, উপস্থিতি, বিস্তৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলি নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করেন।

যেসব প্ল্যাঙ্কটন তাদের সমগ্র জীবনচক্রব্যাপী প্ল্যাঙ্কটন হিসাবেই অতিবাহিত করে তাদের বলা হয় হলোপ্ল্যাঙ্কটন। যেমন— কিছু শৈবাল, কোপেপডস কয়েক প্রকার জেলিফিশ ইত্যাদি। অন্যদিকে, কিছু জলজ জীব তাদের জীবনের কিছুটা অংশে (সাধারণত লার্ভা দশায়) প্ল্যাঙ্কটন হিসাবে উপস্থিত থাকলেও, তাদের বাকি জীবন অন্য জীবগোষ্ঠী যেমন, নেকটিক বা বেনথিক জীব হিসেবে উন্নীত করে, সেইসব জলজ জীবকে মেরোপ্ল্যাঙ্কটন বলে। সী অরচিন, তারা মাছ ইত্যাদি প্রাণীর লার্ভা দশা মেরোপ্ল্যাঙ্কটনের উদাহরণ।

প্ল্যাঙ্কটন সংক্রান্ত বিদ্যাকে প্ল্যাঙ্কটোলজি বা প্ল্যাঙ্কটনবিদ্যা বলে। প্রতিটি একক প্ল্যাঙ্কটনকে 'প্ল্যাঙ্কটার' বলা হয়।

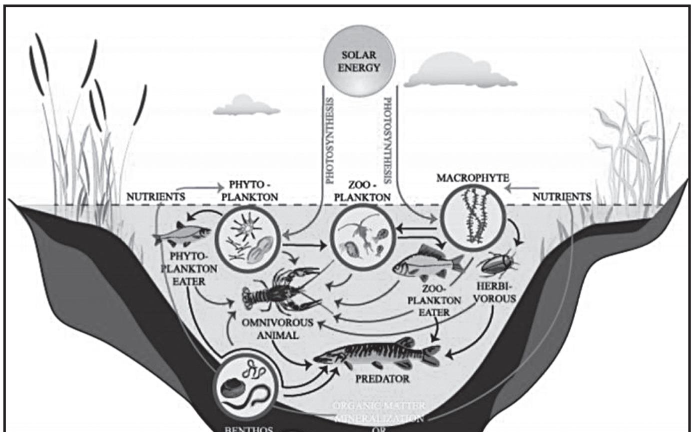


*পুকুরের বাস্তুতন্ত্র যেখানে ফাইটোপ্লাংটন ও জুপ্লাংটন উপস্থিত থাকে।*

### প্রকারভেদ

কোষের প্রকৃতি, পুষ্টি-পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে প্ল্যাঙ্কটনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং জু-প্ল্যাঙ্কটন। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সম্পন্নকারী প্ল্যাঙ্কটনকে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বলে। যেমন— কিছু শৈবাল (যেমন ডায়াটম), সায়ানো-ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো তারা খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে, প্রাণীর বৈশিষ্ট্য যুক্ত প্ল্যাঙ্কটনকে জু-প্ল্যাঙ্কটন বলে। জু-প্ল্যাঙ্কটন খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম অর্থাৎ পরভোজী। আণুবীক্ষণিক জীব থেকে জেলিফিশ-এর মত বৃহদাকার প্রজাতিও জু-প্ল্যাঙ্কটনের অন্তর্গত। তবে এমন কিছু প্ল্যাঙ্কটন আছে যারা উদ্ভিদ বা প্রাণী কারোর বৈশিষ্ট্যই বহন করে না। তারা সাধারণত প্রটিস্টা শ্রেণির অন্তর্গত হয়ে থাকে।

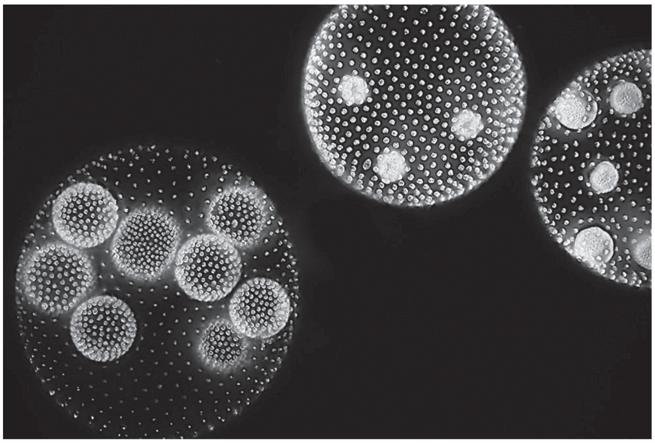

*স্বাদু জলের শৈবাল, ভলভক্স*

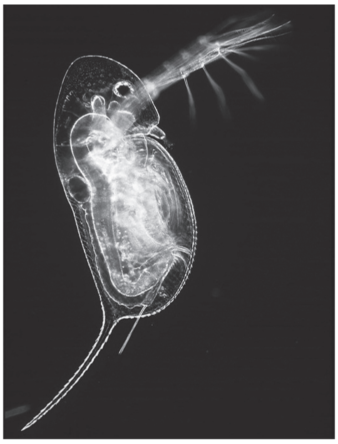

*অ্যালগাল ব্লুম*

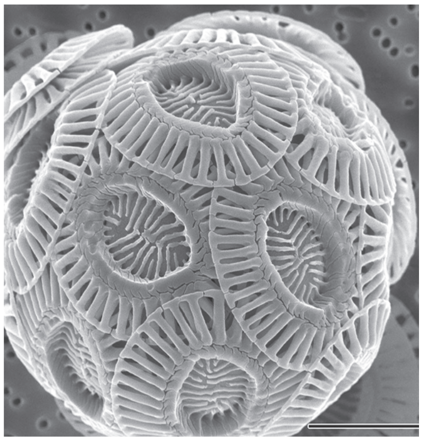

*জু প্ল্যাঙ্কটন, ড্যাফনিয়া*

আয়তন বা দৈর্ঘ্যের ওপর ভিত্তি করে প্ল্যাঙ্কটনকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন— মেগাপ্ল্যাঙ্কটন, ম্যাক্রোপ্ল্যাঙ্কটন, মেসোপ্ল্যাঙ্কটন, মাইক্রোপ্ল্যাঙ্কটন এবং ন্যানোপ্ল্যাঙ্কটন। নিচে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল—

| ক্রমিকনং | প্ল্যাঙ্কটন - গ্রুপ | দৈর্ঘ্য | বৈশিষ্ট্য | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | মেগাপ্ল্যাঙ্কটন (Maga plankton) | >20 cm | আকারে বড়, ভাসমান। | খুব বড় জেলিফিশ, সাল্পস এবং তাদের রিলেটিভস ইত্যাদি। |
| ২. | ম্যাক্রোপ্ল্যাঙ্কটন Macro plankton | 2-20cm | বৃহৎ, দৃশ্যমান। | ক্রীল, অ্যারো ওয়ার্ম, কম্ব জেলি জেলিফিশ ইত্যাদি। |
| ৩. | মেসোপ্ল্যাঙ্কটন Meso plankton | 0.2-20mm | বহুল পরিচিত, খালি চোখে দৃশ্যমান, বৈচিত্র্যময়। | কোপেপড, ক্লাডোসে-রণস, ছোটো সাল্পস ইত্যাদি। |
| ৪. | মাইক্রোপ্ল্যাঙ্কটন Micro plankton | 20-200 µm | বৃহৎ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, এককোষী বা শৃঙ্খল সৃষ্টিকারী। | ডায়াটমস, ডাইনো ফ্লাজেলেট ইত্যাদি। |
| ৫. | ন্যানোপ্ল্যাঙ্কটন Nano plankton | 2-20 µm | ছোটো ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন, সালোক সংশ্লেষকারী বা পরভোজী। | এককোষী ডায়াটমস, কক্কোলিথোফোরাডস ইত্যাদি। |
| ৬. | পিকোপ্ল্যাঙ্কটন Pico plankton | 0.2-2 µm | অতি ক্ষুদ্র, দেখতে হলে কমপক্ষে চারশো গুণ বড় করতে হবে। | ব্যাক্টেরিওপ্ল্যাঙ্কটন, সামুদ্রিক ভাইরাস। |

**স্বাদু জলের প্ল্যাঙ্কটন**

স্বাদু জলের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন প্রজাতির জু-প্ল্যাঙ্কটনের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। ছোট পুকুর থেকে বড় জলাশয়, সকল ক্ষেত্রেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। স্বাদু জলের জু-প্ল্যাঙ্কটন সাধারণত আকারে ছোট (<1 mm) এবং তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ প্রকৃতির হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু মাছ প্রজাতির লার্ভা, জেলিফিশ (2-3 cm ব্যাস) অস্ট্রেলিয়ান ড্যাফনিয়ার (5-6 cm) কথা উল্লেখ করা যায়। স্বাদু জলের জু-প্ল্যাঙ্কটনের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিগুলি হল—মাছের লার্ভা, কোপেপডস ক্ল্যাডোসেরান্স, রটিফারস এবং প্রোটোজোয়া।

স্বাদু জলের ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কমপক্ষে সাত প্রকার শৈবাল-শ্রেণির অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতিদের স্বাদু জলের প্ল্যাঙ্কটন হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি শ্রেণির শৈবালের পরানু গঠন, রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদির বিভিন্নতা লক্ষণীয়। এককোষী, ফিতাকৃতি, কলোনি সৃষ্টিকারী প্রজাতির উপস্থিতি বিভিন্ন শ্রেণির শৈবালের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। স্বাদু জলের বেশিরভাগ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনই আকারে ছোটো (<1 µm-500 µm) অর্থাৎ ন্যানোপ্ল্যাঙ্কটন ও মাইক্রোপ্ল্যাঙ্কটনের অন্তর্ভুক্ত। সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ক্লোরোফাইসি (সবুজ শৈবাল), ব্যাচেলারিওফাইসি (ডায়াটম), পাইরোফাইসি ইত্যাদি শ্রেণির বিভিন্ন শৈবাল প্রজাতি স্বাদু জলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

*সামুদ্রিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, Emiliania huxleyi*

**নোনা জলের প্ল্যাঙ্কটন**

সমুদ্রের নোনা জল হল প্ল্যাঙ্কটনের এক অফুরন্ত ভান্ডার। প্রাণীজগতের প্রায় সকল পর্বের প্রাণীর কোনো না কোনো প্রজাতির পরিণত বা লার্ভা দশা জু-প্ল্যাঙ্কটন হিসাবে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অবস্থান করে। যদিও তার মধ্যে সাধারণভাবে ক্রাস্টিসিয়ান জু-প্ল্যাঙ্কটনের (বেশিরভাগ কোপেপডস) আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সমুদ্রের জলে প্রাপ্ত জু-প্ল্যাঙ্কটনকে তাদের আকারের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় যথা- ছোট (<1mm), মাঝারি (1-3 mm), এবং বড় (>5mm)। কোপেপডস

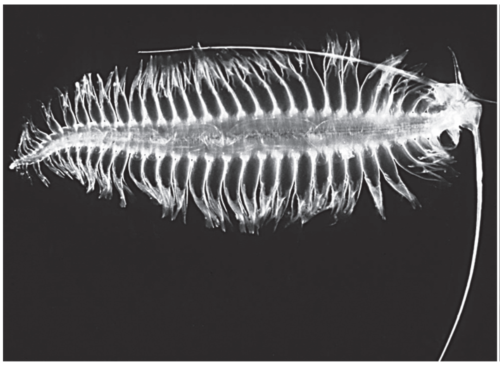

স্বাদু জলের জু প্ল্যাঙ্কটন, শ্রিম্প

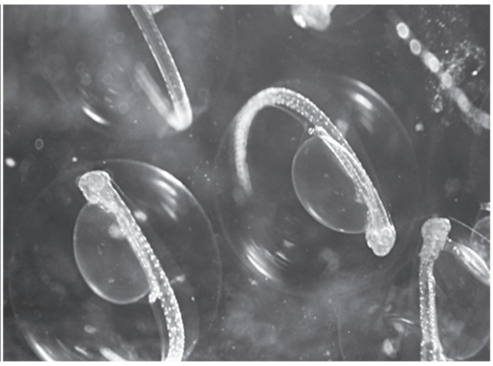

ক্রিমি, *Tomopteris*

জু-প্ল্যাঙ্কটন মাছের ডিমপোনা

ছাড়াও ক্রিল, মাইসিডস শ্রিম্প, ক্রিমি, শামুক, জেলিফিশ, মাছের লার্ভা ইত্যাদি লবণাক্ত জলে অবস্থান করে।

অন্যদিকে, লবণাক্ত জলের ফাইটোপ্লাঙ্কটনের অন্যতম উৎস হলো সামুদ্রিক শৈবাল। সমুদ্র ও উপকূলীয় নোনা জলে দশ হাজারেরও বেশি শৈবাল প্রজাতির অবস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, যাদের আকার 0.2 μm -200 μm-এর মধ্যে। ব্যাচিলারিওফাইসি, সায়ানোফাইসি, ক্রাইসোফাইসি, ডাইনোফ্ল্যাজেলেটস, সায়ানোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি শ্রেণির বিভিন্ন শৈবাল প্রজাতির উপস্থিতি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইউগ্লিনোফাইসি, ক্রিপটোফাইটা ইত্যাদি শ্রেণির অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতিকে সামুদ্রিক জু-প্ল্যাঙ্কটন হিসাবে দেখা যায়।

**জলাশয়ের অজীবজাত প্রভাবক এবং প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধির আন্তঃসম্পর্ক**

প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে জলজ বিভিন্ন অজীবজাত উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধির ওপর প্রভাববিস্তারকারী উল্লেখযোগ্য প্রভাবকগুলি হল—

তাপমাত্রা—প্ল্যাঙ্কটনের ঋতুভিত্তিক উৎপাদন হারের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জলাশয়ের উষ্ণতার তারতম্যের জন্য শৈবালসহ বিভিন্ন প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধি প্রভাবিত হয়।

আলো - আলো সরাসরি সালোকসংশ্লেষ হারকে প্রভাবিত করে। তাই ফাইটোপ্লাঙ্কটনের বৃদ্ধিও সালোকসংশ্লেষ হারের সাথে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে আলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

নাইট্রেট ও ফসফেট - জলাশয়ের নাইট্রেট ও ফসফেটের ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের উপস্থিতির হার ধনাত্মক আন্তঃসম্পর্কে পরিবর্তিত হয়।

DO, TDS, BOD, ক্ষারকত্ব, pH—জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen), TDS (Total Dissolved Solids), বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (Biological Oxygen Demand), ক্ষারকত্ব এবং pH এর উচ্চ মান, ক্লোরোফাইসি শ্রেণির শৈবাল বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। অনেক সময় জলাশয়ের অতিরিক্ত TDS কিছু প্রজাতির প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধিতে বাধা দান করে। জলের বর্ধিত ক্ষারকত্ব জু-প্ল্যাঙ্কটন বৃদ্ধির পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবগুলি ছাড়াও জলের প্রবাহমানতা, সিলিকেট, সালফাইডস লোহা, লবণাক্ততা, কোষীয় সংগঠন এবং পুষ্টি, জননগত অবস্থা, ইত্যাদি বিষয়গুলিও প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধির হার এবং স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

**বাস্তুতন্ত্র গঠনে প্ল্যাঙ্কটন**

পরিবেশে জীবজ ও জড় উপাদানের পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়ার ফলে, যে কোন বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। জলজ বাস্তুতন্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। জলজ বাস্তুতন্ত্রে প্ল্যাঙ্কটন হল গুরুত্বপূর্ণ একপ্রকার খাদ্যের উৎস। নদ-নদী, খাল-বিল, সমুদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন শ্রেণির প্ল্যাঙ্কটন অবস্থান করে। জলাশয়ে উপস্থিত বিভিন্ন ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন করে। তাই ফাইটোপ্লাঙ্কটন হল জলজ বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উৎপাদক। অনেক জলজ প্রাণী ফাইটোপ্লাঙ্কটনকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে, জু-প্ল্যাঙ্কটন পরভোজী এবং তারাও ফাইটোপ্লাঙ্কটনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। প্ল্যাঙ্কটন বিভিন্ন আকারের হওয়ায়, ছোট বড় মাঝারি ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের প্রাণীর খাদ্য হিসেবে প্ল্যাঙ্কটন ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন filter feeder প্রাণী যেমন মাছ, স্কুইড এমনকি হাঙ্গর, তিমি ইত্যাদি প্রাণীরাও তাদের মুখের সাহায্যে জল পরিশ্রুত করে বার করে দেয় এবং পরে থাকা অবশিষ্ট খাদ্য খায়। সেইসব খাদ্য কণার মধ্যে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনও থাকে।

খাদ্যশৃঙ্খলের একেবারে শুরুতে অবস্থান করে প্ল্যাঙ্কটন লবণাক্ত এবং স্বাদু জল উভয় ক্ষেত্রেই জলজ বাস্তুতন্ত্রের শক্তির ও খাদ্যের ভারসাম্য বজায় রাখে।

**জলাশয়ে অক্সিজেন উৎপাদনে প্ল্যাঙ্কটনের ভূমিকা**

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর সমগ্র অক্সিজেন উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকই আসে সমুদ্র থেকে। সমুদ্র থেকে উৎপাদিত অক্সিজেনের বেশির ভাগই তৈরি হয় সামুদ্রিক প্ল্যাঙ্কটন থেকে। এই সকল সামুদ্রিক প্ল্যাঙ্কটনের মধ্যে আছে শৈবাল, কিছু ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি যারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সংঘটিত করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে *Prochlorococcum* নামক সবুজ শৈবালের কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্ল্যাঙ্কটন প্রজাতিটি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় প্রাপ্ত সালোকসংশ্লেষকারী জীব। দেখা গেছে, সমগ্র বায়োস্ফিয়ারের ২০% পর্যন্ত অক্সিজেন উৎপাদিত হতে পারে *Prochlorococcum* থেকে। সামুদ্রিক অক্সিজেন উৎপাদনের ক্ষেত্রে *Synechococcus* নামক সায়ানো ব্যাকটেরিয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, নদী, নালা, খাল, বিল ইত্যাদি স্বাদু জলে উপস্থিত বিভিন্ন ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উপজাত পদার্থ হিসাবে অক্সিজেন উৎপাদন করে যা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ভান্ডার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

### প্ল্যাঙ্কটন ও জল দূষণ

মনুষ্যসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে বিভিন্ন জলাশয় বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে জলাশয়ে বসবাসকারী জীবকুলের ওপর। জল দূষণের ফলে জলের জৈব পদার্থের বৃদ্ধি ঘটে, ফলে শৈবালসহ বিভিন্ন প্ল্যাঙ্কটনের পুষ্টির আধিক্য দেখা দেয়। অতিরিক্ত পুষ্টি পদার্থের উপস্থিতির কারণে শৈবাল দ্রুত হারে বৃদ্ধি ঘটে এবং 'অ্যালগাল ব্লুম' তৈরি হয়, যার ফলে জলের গুণগত মানের অবনতি ঘটে। ফলত কিছু জলজ প্রাণীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

জু-প্ল্যাঙ্কটনের উপর জল দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন দূষক পদার্থ প্রভাব বিস্তার করে। তাই জলের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দূষণের ফলে ম্যাক্রোজুপ্ল্যাঙ্কটনের তুলনায় মাইক্রোজুপ্ল্যাঙ্কটনের বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কীটনাশক, আগাছানাশক রাসায়নিক সার ইত্যাদির মত দূষক পদার্থ, প্ল্যাঙ্কটনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট খাদ্য শৃঙ্খলে ঢুকে পরে এবং বিভিন্ন ট্রপিক লেভেলে জৈব সঞ্চয় ও জৈব বিবর্ধনএর মাধ্যমে এই সকল জৈব অভঙ্গুর পদার্থের সঞ্চয় হয় ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা জীবকুলের নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে।

নিম্নলিখিত ইন্ডেক্স-গুলির মাধ্যমে জলের দূষণ মাত্রা কিভাবে প্ল্যাঙ্কটনের বিভিন্ন প্রজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তা জানা যায়—ওডাম স্পিসিস ইন্ডেক্স, সিমিলারিটি অ্যান্ড ডি-সিমিলারিটি ইন্ডেক্স, নাগ্গার্ড অ্যালগাল ইন্ডেক্স, পামার অ্যালগাল পলিউশন ইনডেক্স, সিমসন ডাইভারসিটি ইন্ডেক্স ইত্যাদি।

জলজ বাস্তুতন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্ল্যাঙ্কটন। প্ল্যাঙ্কটন জলাশয়ের খাদ্যশৃঙ্খল এবং খাদ্যজালে উৎপাদক অথবা প্রাথমিক খাদকের ভূমিকা পালন করে। সৌরশক্তির আবদ্ধকরণ এবং বিভিন্ন ট্রপিক লেভেলে শক্তির সঞ্চারণে প্ল্যাঙ্কটনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যান্য শর্তের সাথে প্ল্যাঙ্কটনের যথাযথ এবং সঠিক বিন্যাসই পারে জলজ বাস্তুতন্ত্রকে সঠিকভাবে বজায় রাখতে।

### পাদটিকা

১. DO—কোন জলাশয়ের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণকে Dissolved Oxygen বা DO বা দ্রবীভূত অক্সিজেন বলে। বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন এবং জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন জলে দ্রবীভূত হয়।

২. TDS—মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ STDSV বা Total Dissolved Solids হল আণবিক, আয়নিত বা মাইক্রো-গ্রানুলার আকারে তরলে উপস্থিত সমস্ত অজৈব এবং জৈব পদার্থের দ্রবীভূত সামগ্রীর একটি পরিমাপ। TDS প্রতি মিলিয়ন (ppm) অংশে পরিমাপ করা হয়। ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করে জলে TDS পরিমাপ করা যেতে পারে।

৩. BOD---Biological Oxygen Demand বা জৈবিক অক্সিজেনের চাহিদা হল একটি স্থিতিমাপ যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জলের নমুনায় উপস্থিত জৈব উপাদানের উপর বর্ধিত বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ (DO) নির্দেশ করে।

৪. pH—pH হচ্ছে দ্রবীভূত হাইড্রোজেন আয়নের সক্রিয়তার পরিমাপ। pH দ্বারা মূলত হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব বোঝায়।

### তথ্যসুত্র


1. Richardson AJ and Kunz TJ (2006). Impacts of climate change on zooplankton. In : 'Impacts of climate change on Australian marine life : part C, literature review.' SEds AJ Hobday, TA Okey, ES Poloczanska, TJ Kunz and AJ Richardson, pp. 19-26. Report to the Australian Greenhouse Office, Canberra.
2. Newell GE and Newell RC (1977). Marine Plankton, A Practical Guide. Anchor Press, London.
3. Behrenfeld MJ, Bale AT, Kolber ZS, Aiken J and Falkowski PG (1996). Confirmation of iron limitation of phytoplankton photosynthesis in the equatorial Pacific Ocean. Nature 383, 508-511.
4. Ajani P, Lee RS, Pritchard TR and Krogh M (2001b). Phytoplankton dynamics at a long-term coastal station off Sydney, Australia. Journal of Coastal Research 34, 60-73.
5. Moore, SK, Baird ME and Suthers IM (2006). Relative effects of physical and biological processes on nutrient and phytoplankton dynamics in a shallow estuary after a storm event. Estuaries and Coasts 29, 81-95.


## ইউটিউব চ্যানেল

বাংলা নদী ও পরিবেশ বিষয়ক চ্যানেল

Bigyan Anneswak
@BigyanAnneswak
4,790 subscribers
Web : www.bigyananneswak.org.in
7980121478/9143264159
7602052155

বিজ্ঞান বিষয়ক চ্যানেল

ভ বা নী প্র সা দ সা হু

# জল : রোগে আর বিশ্বাসে

প্রচলিত বিশ্বাস : গঙ্গার জল দিয়ে স্নান

একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানুষের শরীরের শতকরা ষাট (৬০) ভাগই জল। শিশুদের ক্ষেত্রে এই অনুপাতটা একটু বেশি, মহিলাদের ক্ষেত্রে একটু কম। অর্থাৎ আসল ব্যাপারটা হল আমাদের শরীরের বেশিরভাগটাই একেবারে জোলো। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কমবেশি সত্যি, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তো বটেই। আর তার প্রধান কারণ শরীরকে জীবিত রাখতে যে অসংখ্য জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে তার জন্য অত্যাবশ্যক হল জল। আর এ কারণে একজন মানুষকে তার প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু দৈনিক ৩৫ থেকে ৪৫ মিলিলিটার জল শরীরে গ্রহণ করতেই হয়। প্রতিদিন কম করে ২ লিটার।

আর এর পেছনে রয়েছে আদিম পৃথিবীর ইতিহাস, পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টিই হয়েছিল জলে। এখন থেকে ১৩৮০ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সূচনা হওয়ার এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ ধরে তৈরি হল প্রাথমিক পারমাণবিক কণিকা—প্রোটন ও নিউট্রন। এদের সংযুক্তিতে সৃষ্টি হতে থাকে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু-অণু, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সূচনার তিন লক্ষ বছরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের শতকরা ৭৬ ভাগই হল হাইড্রোজেন আর বাকিটা হিলিয়াম। আর এখনো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হাইড্রোজেনই প্রধান—প্রায় শতকরা ৭৪ ভাগ। আর মাত্র এক ভাগ হল অক্সিজেন, ০.৫ ভাগ হল কার্বন, ০.১ ভাগ হল লোহা, ০.১ ভাগ হল নাইট্রোজেন ইত্যাদি। শেষেরগুলি এই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কোন একসময় হাইড্রোজেনের দুই পরমাণু আর অক্সিজেনের এক পরমাণু মিলে হল ডাইহাইড্রোজেন মনোক্সাইড বা জল। এখন থেকে প্রায় ৪৫৫ কোটি বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টির পর পার্থিব পরিমণ্ডলে জলের উপস্থিতি ঘটতে থাকে। তবে জমাটবাঁধা ঐ পৃথিবীতে জল মূলত আসে বহির্বিশ্ব থেকে, এক তুষারাবৃত বিশাল উল্কা পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার পর, যা সৃষ্টি করে গভীর সমুদ্র। ঐ জলে তথা পৃথিবীতে ১০০ কোটি বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা নানা পদার্থের ভাঙাগড়া, নতুন পদার্থের সৃষ্টি আবার তাদের অনেকের বিলুপ্তি তথা রাসায়নিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল এমন এক পদার্থের যার মধ্যে প্রাণের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়। এইভাবেই প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হল প্রথম জীবিত এককোষী প্রাণী। এরা তাদের বেঁচে থাকার জন্য পারিপার্শ্বিক জল থেকেই উপাদান গ্রহণ করত সরাসরি।

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া পৃথিবীর সব প্রাণবান উদ্ভিদ বা প্রাণীই বেঁচে থাকার জন্য জলের বিকল্পহীন ভূমিকার কথা জেনে এসেছে। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীরা বাঁচার জন্য শুধু জল খেয়েই গেছে। অন্যদিকের মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উন্নত মস্তিষ্ক তথা চিন্তাভাবনা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও বিশ্বাস করার ক্ষমতা অর্জন করার কারণে প্রকৃতির অন্য সব কিছুর মত জলকে ঘিরেও নানা কাল্পনিক, অলৌকিক কল্পনা ও বিশ্বাস করা শুরু করেছে। যাযাবর ও ফল সংগ্রাহক থেকে কৃষির আবিষ্কার করা ও কৃষিভিত্তিক সমাজ-অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পর তা আরো ব্যাপক হয়েছে। মিষ্টিজলের নদীকে কেন্দ্র করেই তার গড়ে ওঠা। আদিম মানুষ প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে কল্পিত এক অতিপ্রাকৃতিক সর্বশক্তিমান রহস্যময় সত্তার অস্তিত্বের ধারণার জন্ম দিয়েছে ও বিশ্বাস করেছে। অন্যদিকে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গাছগাছড়া মাটি ইত্যাদির মত জলকেও তার নানা রোগকষ্ট নিরাময়ের জন্য বাস্তবে প্রয়োগ করে। কখনো কখনো আরো অনেক ক্ষেত্রের মত জলকে ঘিরেও অবাস্তব অলৌকিক কল্পনার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞান মিলেমিশে গেছে।

**নানা রোগে ও কষ্ট লাঘবে জল :** আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা জানি জ্বরে ঠান্ডা জলের পটি কপালে দেওয়া। যদিও প্রবল জ্বরে শরীরের তাপ কমাতে আদর্শ জল ইষদুষ্ণ জলে কাপড় ভিজিয়ে গা মুছে দেওয়া, তবু জলপটি আরাম দেয়। এর জন্য নানা দেশীয় প্রযুক্তিও বানানো হয়, যেমন আমাদের ছোটবেলায় ছিল 'জলের ধারা'। প্রবল জ্বরে উঠোনের একদিকে মাথাটা রেখে রোগীকে শোয়ানো হত। তার কপাল-মাথার একটু ওপরে একটি মাটির হাড়ির নীচে ছোট্ট ফুটো করে ঝোলানো থাকত। হাঁড়ি ঠান্ডা জল ভর্তি করে দিলে বহুক্ষণ ধরে জ্বরতপ্ত কপালে ও মাথায় ঐ জল ঝরতে থাকত। তখন এত প্যারাসিটামল, অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। কিন্তু অন্তত জ্বরের লক্ষণগত চিকিৎসায় এটি বেশ কার্যকরী ছিল। ব্যথা কমাতেও গরম জল-ঠান্ডা জলের ব্যবহার সুপরিচিত।

মূত্রনালী সংক্রমণ প্রতিরোধে ও চিকিৎসায়, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট জল খাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পূর্ণবয়স্ক মেয়েদের মূত্রনালি (৪ সেমি) পুরুষদের মূত্রনালি (১৮ সেমি)-র তুলনায় অনেক ছোট বলে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি তাই স্থানীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের যথেষ্ট পরিমাণে জল খাওয়ার কোন বিকল্প নেই, যদিও বাইরে বেরোলে বাস্তব কারণে মেয়েরা জল কম খায়। তাই মূত্রনালীর সংক্রমণ থেকে 'অম্বল গ্যাস বদহজম' জাতীয় নানা অসুবিধায়ও ভোগে বেশি।

পরিষ্কার জলে নিয়মিত স্নান করা শুধু চর্মরোগ প্রতিরোধে ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে না, সামগ্রিক ভাবে শরীরকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে। এই স্নানের অভ্যাস কিন্তু একসময় ছিল শুধু প্রাচ্যের হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে। এক দেড়শ বছর আগেও পাশ্চাত্যে স্নান করাকে গুরুত্ব দেওয়া দেখা হত না ফলে নানা ধরনের চর্মরোগের আধিক্য ছিল। শোনা যায় ক্রুসেডাররা প্যালেস্টাইন আক্রমণ করার সময় মুসলিমদের মধ্যে নিয়মিত স্নান করা দেখে চমৎকৃত হন। ফিরে গিয়ে ইয়োরোপে তা চালু করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘদিন তা সফল হয়নি।

ডায়ারিয়া থেকে প্রচুর ঘাম ইত্যাদি নানা কারণে শরীরে জলশূন্যতা

(ও লবণের ঘাটতি) দেখা দিলে জল (ও সঙ্গে একটু নুন-চিনি) খাইয়েই প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। একসময় কলেরায় এ অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। তখন যদি কলেরায় জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার জল একটু নুন-চিনি দিয়ে খাওয়ানো যেত তবে এত অসংখ্য মৃত্যু আটকানো যেত। গত শতাব্দীর ৭০-এর দশকে বাংলাদেশ-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় হাজার হাজার উদ্বাস্তুর মৃত্যুও এইভাবে আটকানো গেছে।

অন্যদিকে কোন বিশেষ রোগের কারণে না হলে, সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধতাও শুধু নিয়মিত যথেষ্ট জল খেয়েই আটকানো ও সারানো যায়, সঙ্গে প্রয়োজন একটু শারীরিক শ্রম ও আঁশ যুক্ত খাবার (রুটি, সবজি ইত্যাদি)।

জীবাণুমুক্ত জল (ডিস্টিলড ওয়াটার) নাক, চোখ ও কানের ভেতর দিয়ে মৃদু প্রদাহ ঠিক করা সম্ভব। জল খেয়ে পাকস্থলীর প্রদাহও ঠিক করা যায়, যদি না পাকস্থলীতে কোন ক্ষত থাকে। এইভাবে জলের সুষ্ঠু ব্যবহার শুধু প্রাণটুকু টিকিয়ে রাখা নয়, শরীরকে রোগমুক্তও রাখে, নানা কষ্টেরও লাঘব করে।

**জল নিয়ে সংস্কার :** কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, জল দিয়ে, বিশেষত বিশেষ কোন জল দিয়ে সব রোগই সারানো যায়। যেমন খ্রিস্টানদের কাছে জর্ডন নদীর জল, মুসলিমদের কাছে কাবা-র পাথর ছোঁয়ানো জল, হিন্দুদের কাছে গঙ্গার জল অতি পবিত্র হিসেবে গণ্য হয় এবং এদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবেও গণ্য করেন অনেকে। এরই একটি চরম ও হাস্যকর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিগত কোভিড-১৯ অতিমারির সময়, তখন অনেকে দাবি করেছিলেন গঙ্গাজল দিয়ে (গোমূত্র, তুলসীতলার মাটি, করোনা মাদুলি ইত্যাদির মত) কোভিড সারানো সম্ভব। এমনকি এ নিয়ে এদেশে গবেষণারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যদিও শেষপর্যন্ত তা এতই আজগুবি ছিল যে, তা বৈজ্ঞানিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি, অবশ্য আমাদের দেশে এখন যে বীভৎস কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এমন অনুমোদন পেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। (যেমন কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে করোনা ভাইরাস মরেছে—এমন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও কিছুদিন পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। পাদোদককে নিয়েও বিপজ্জনক কুসংস্কার গড়ে উঠেছে। 'গুরুদেবের পায়ে যদি জীবাণু সংক্রমণ বা হাজা ইত্যাদি থাকে তবে ঐ নোংরা পাদোদক বা দূষিত জল ভক্তেরা খেলে তবে বিপদ হতে পারে। আর যদি গুরুদেবের পা পরিষ্কারও থাকে, তবু তার পায়ে জল ছুঁইয়ে দিলেই ঐ জল কোন অলৌকিক ক্ষমতা বা মাহাত্ম্য অর্জন করে না। গুরুদেবের তথাকথিত অলৌকিক মাহাত্ম্য যেমন পুরোটাই লোকঠকানো ফাঁকিবাজি, তেমনি ঐ জল বা অন্য কোন কিছুর অলৌকিক ক্ষমতা বলেও কিছু হয় না।'

অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনেও জলকে ঘিরে নানা সংস্কার-কুসংস্কার-লোককথা গড়ে উঠেছে। যেমন কেউ বাইরে গেলে ভাবা হয় পেছনে ছলের ছড়া (কোথাও আবার গোবর জলের ছড়া) দিলে তার যাত্রাপথ 'শুভ' হবে, যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হবে। ইংল্যান্ড সহ বহু দেশে এমন বিশ্বাস আছে যে, রাত্রে জানালার বাইরে জল ফেললে অশুভ শক্তির প্রভাব পড়তে পারে। পাশ্চাত্যের ঐসব দেশের প্রাচীন সংস্কার ছিল কাপড় কাচার সময় কোন মহিলা যদি চারপাশে জল ছড়ান বা তাঁর অ্যাপ্রন ভিজে যায়, তবে তাঁর স্বামী মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দেবে। আসলে এই ধরনের সংস্কারও জলের সংরক্ষণের তথা জল অপচয় বন্ধ করার জন্য তৈরি। আর এখন তো 'ওয়াশিং মেশিন' আসার পর ওসব দেশেই মহিলাদের অ্যাপ্রন আর ভেজে না, যদিও এসব মেশিনে জলের অপচয় ঘটে আরো বেশি।

**কুসংস্কারের কারণে জল অপচয় :** মানুষের তৈরি করা ব্যাপক দূষণের কারণে আগের মত পুকুর, নদীর মত পানীয় জলের প্রাকৃতিক উৎস প্রায় নেই। এগুলি বানাতে ভূগর্ভস্থ জলের অপচয়ও ঘটে অনেক বেশি। এইভাবে গাড়ি ধোওয়া বা খেলার মাঠ ধোওয়ার পর নানা কারণেও মানুষ ক্রমশ কমতে থাকা জলের উৎসকে ধ্বংস করছে।

সঙ্গে আছে নানা কুসংস্কারের কারণে জলের অপচয়, যেমন বহু মন্দিরে পাথরের দেবদেবীকে নিয়মিত স্নান করানো হয়, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তো বটেই, তারপর নতুন বস্ত্র পরানো হয়। কিন্তু কল্পিত দেবদেবীর প্রতীক ঐসব মূর্তির খোসপাঁচড়াও হয় না, কোন চর্মরোগও হয় না। তাদের স্নান করানোর মত অর্থহীন কাজে বিপুল পরিমাণ জলের অপচয় বেদনাদায়ক, যদিও অন্ধভক্তেরা এর জন্য সামান্য বেদনাও অনুভব করেন না।

আবার হয়তো স্নান করেই যাওয়া হয়েছে কোন মৃতব্যক্তিকে সম্মান জানাতে। তাঁর মৃতদেহ ছুঁয়ে প্রণাম করা হল। ফিরে শুধু ছোঁয়ার জন্যই আবার স্নান, পরিস্কার জামাকাপড় আবার কাচা—এসব করেন প্রায় সবাই। শ্মশানযাত্রী বা কবরস্থানে গেলে তো কথাই নেই। অথচ ঐটুকু ছোঁয়া বা শ্মশানে থাকার জন্য কোন জীবাণু শরীরে আসে না। কিন্তু মৃতদেহকে ছুঁলেই শরীর-জামাকাপড় অশুচি হয়ে গেল—এমন মিথ্যা বিশ্বাস থেকে অপ্রয়োজনে অনেক জল নষ্ট করা হয়। এরই একটি মাত্রা ছাড়া প্রকাশ ঘটেছিল কোভিড অতিমারির সময়। বাইরে থেকে ফিরেই সব জামাকাপড় কাচা, প্রয়োজনে দিনে একাধিকবার স্নান—এসব করতেন বহুজনই। প্রচারের জোরে সতর্কতার চেয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়ার কারণে এমন সব অর্বাচীন কুসংস্কারের সৃষ্টি। অথচ কোন ভাইরাসই শরীরের বাইরে ৪০-৪৮ ঘন্টার বেশি বেঁচেই থাকতে পারে না। এই ধরনের উদাহরণ আরো রয়েছে।

**সৌজন্যের জন্য জল অপচয় :** কেউ বাড়িতে এলেন, তাঁকে এক গ্লাস জল খেতে দেওয়া হল, তিনি হয়তো অর্ধেকটা খেলেন, বাকি জলটা কিন্তু আর কেউ খাবেন না, ফেলেই দেওয়া হয়। অথচ শুরুতে যদি তাঁকে গ্লাসের অর্ধেকটা জল দেওয়া হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় আর লাগবে কিনা—তাহলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ পরিবারে এইভাবে যে বিপুল পরিমাণ জল নষ্ট হয় তা আটকানো যায়। কিন্তু মুশকিল হল আধগ্লাস জল দিলে তিনি অপমানিত বোধ করবেন কারণ ঐ ধরনের মানসিকতাই তৈরি হয়নি। অথচ ব্যাপক প্রচারের জোরে এধরনের সচেতনতা গড়ে তোলাই যায়। আর গ্লাসের অবশিষ্ট জল তেমন ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায়ও দিয়ে কাজে লাগানো যায় সচেতনভাবে। এইভাবে নানা ক্ষেত্রে সৌজন্যের সংস্কারও জল অপচয়ে ভূমিকা রাখে।

জলের অপর নাম জীবন—তা অনেকে শুনেছেন কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করেননি। করলে সীমাহীন ও অপরিণামদর্শী ভোগবাদী চিন্তা আর অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার জন্য জল অপচয় করাতেন না। আর এ যদি চলতেই থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে জীবন টিকিয়ে রাখতে আর রোগব্যাধির জন্য জলের আর প্রাকৃতিক কোন উৎস থাকবে কিনা সন্দেহ।

নি র্মা ল্য দা শ গু প্ত

# একটি নিছক অবাস্তব গল্প

"রন্টু, রন্টু, এ্যাই রন্টু' বলে ডাকতে থাকে শিউলি। রন্টুর মা। 'দেখো তো, এই কাঠফাটা রোদ্দুরে আবার কোথায় গেল ছেলেটা। ওকে নিয়ে আর পারি না। কোনো কথা যদি শোনে!' শিউলি গজগজ করতে থাকে। সেই মুহূর্তেই হাঁপাতে হাঁপাতে ঘর্মাক্ত দেহে রন্টু ঘরে ঢোকে, মুখে বিজয়ীর হাসি। "জানো মা, রাস্তার মোড়ে একটা বাড়ির বারান্দা জলে ভেসে যাচ্ছিল। কলিং বেল বাজিয়ে বাজিয়ে তাদের ডেকে তুললাম। তারপর কল বন্ধ করিয়ে আসছি।"

গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে শিউলি বলল—'তোর কি দরকার বলত? এসব করে কি হবে?' রন্টু একটুও বিচলিত না হয়ে বলল—"কি বলছ মা! কি ভয়ানক কান্ড হতে চলেছে জানো! এভাবে অকারণ জল নষ্ট করলে আমরা সবাই তো একদিন জলের অভাবে মরেই যাবো। জলের অন্য নাম জীবন জানো না। রথীন স্যার বলেছেন সবাই যদি এখন থেকে নজর রাখে, তবে মনে হয় পৃথিবীর ভালো হবে। তোমরাও নজর রাখবে যেন একফোঁটা জলও নষ্ট না হয় বাড়িতে।"

শিউলি বলে—"সেই ভালো; বাড়িতেই লক্ষ্য রাখ। অন্য কোনও বাড়ির দিকে দেখার দরকার নেই।"

"আগে তো বাড়িতেই নজর রাখতাম। এখন তো তুমি আর জলের কল খুলে রেখে কাজ করো না। আর সবাইকেই তো বুঝতে হবে—তাই না। সবাই না বুঝলে কি হবে মা। আমরা সবাই-ই তো একদিন জলের অভাবে মরেই যাবো। তাই না?

শিউলি কি বলবে বুঝতে পারে না। কিশোর মনের অনেক জিজ্ঞাসা। অনেক আবেগ। জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে, তোর অন্য বন্ধুরাও কি এসব করে?"

রন্টুর মুখটা একটু ম্লান হয়ে যায়। ম্লান মুখে বলে—"শুধু সুনীল আর তপন মেনে চলে স্যারের কথা। অন্য বন্ধুরা হাসে, বলে, 'জলের আবার অভাব কিসের? নদী আছে, পুকুর আছে, লেক আছে, ঝরণা আছে। আসলে স্যার একটা আস্ত পাগল। বুদ্ধু।"

শিউলি রন্টুকে আলগোছে টেনে ধরে। তারপর বলে—"না রে, স্যার হয়ত ঠিকই বলেছেন। দেখনা এখন বৃষ্টি কত কমে গেছে। এখন কত গরম পড়ে। আগে চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রায়ই কালবৈশাখী ঝড় হত। এখন তো হয়ই না।"

রন্টুর মুখে হাসি ফোটে। বলে—"জানো মা। স্যার বলেন, যত বৃষ্টি কম হবে, ততই পৃথিবী গরম হবে আর পাহাড়ের মাথার বরফগুলো গলে যাবে। ফলে বন্যা হবে। অনেক নীচু জায়গা একেবারে ডুবে যাবে। অনেক মানুষ মারা যাবে। হ্যাঁ, মা আমাদের এখানেও এমন হবে?

শিউলি বলে—"স্যার যখন বলেছেন তখন ঠিকই বলেছেন।"

সন্ধ্যা ছটার সময় বাড়ি ফেরে রন্টুর বাবা। একটু গম্ভীর মুখ। এসেই রন্টুকে ডাকে। 'রন্টু'। রন্টু এসে কাছে দাঁড়ায়। "কি হয়েছে বাবা?" "তুমি কি বলাইবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলে দুপুরবেলায়! ওদের ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছিলে?"

"আমি তো বলাইবাবুদের চিনিনা বাবা।"

"ওই যে রাস্তার মোড়ের বাড়িটা।"

"হ্যাঁ বাবা।"

"কেন?"

ওদের বারান্দার কলটা খোলা ছিল, জলে ভেসে যাচ্ছিল রাস্তাঘাট। তাই জলের কলটা বন্ধ করার জন্য ডেকেছিলাম।

ইতিমধ্যে শিউলি এসে দাঁড়ায়। হাতে চায়ের কাপ। 'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করে।

নিখিল বলে—'আমি ফিরছি। এমন সময় বলাইবাবুর বড় ছেলেটা এসে আমাকে ডাক দেয়। "শুনুন আপনার ছেলেটা বড্ড ত্যাঁদড়। আমরা ঘুমাচ্ছি। আর সেই সময় বারবার কলিং বেল বাজিয়ে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তোলে। প্রথমদিন কিছু বলিনি। এরপর ঘটলে বিপদ হবে। মনে রাখবেন কথাটা।" বলেই চলে যায়। ওরা লোক বিশেষ সুবিধার নয়।

এই সময় বাড়ির কলিং বেলটা বেজে ওঠে। সন্ত্রস্ত হয়ে দরজা খোলে নিখিল। চার-পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে।

"কি ব্যাপার?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠ নিখিলের। এদের চেনে নিখিল। ক্লাবের ছেলে কাউন্সিলরের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে। অনেক ভালো কাজও করে সারা বছর। বৃক্ষরোপণ, রক্তদান শিবির, এরকম অনেক কিছু।

"আপনার একটা ছোট ছেলে আছে না। ওকি বাড়িতে আছে? ওর সাথে একটু কথা বলতাম। ছেলে রন্টু আবৃত্তি করে। পাড়ার অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছিল। তবুও সন্দিগ্ধ নিখিল বলে—'হ্যাঁ আছে। কিন্তু কেন বলুন তো?"

"আমরা এই পাড়ারই ছেলে। গলির মোড়ের বাড়িটার কাছেই থাকি। সন্ধ্যার সময় দেখলাম বলাইবাবুর ছেলেটা যেন আপনাকে ধমকাচ্ছিল আপনার ছেলের ব্যাপারে। তাই আমরা একটু জানতে এসেছিলাম ব্যাপারটা আসলে কি?"

এবার শিউলি এগিয়ে এসে বলে—'এসো, এসো, তোমরা ভেতরে এসো।' নিখিল দরজা ছেড়ে দাঁড়ায়। ছেলেগুলি ভিতরে ঢোকে।

রন্টুকে ডাক দেয় শিউলি। 'এ্যাই রন্টু, দাদাদের বলতো কি হয়েছিল?' রন্টু বলে সব কথা। একটি ছেলে বলল—হ্যাঁ আমি জানি; ওদের কলিং বেল আর আমাদের কলিং বেলের আওয়াজ একই রকমের। প্রায়ই ওদের কলিং বেল বাজলে ওরা আমরা দুজনেই দরজা খুলি। আজও তাই হয়েছে। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে আমি দরজা খুলে দেখি এই ছেলেটা ওদের বাড়ির কলিং বেল বাজাচ্ছে। ওরা দরজা খুললে ও কলটা বন্ধ করতে বলে। এর মধ্যে তো কোনো দোষ নেই। ঠিক আছে, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। দেখা যাক, কি হয়।'

শিউলি এবার একটু ভয় পায়। 'থাক না।'

'না কাকিমা। ভয় পেলে হবে না। টাকার গরমে ওরা এখন ধরাকে সরা ভাবছে। আমাদের পাড়ায় এসব চলবে না। চলুন আগে আমরা থানায় একটা জি.ডি. করে তবে ওদের বাড়ি যাব। কোনো ভয় নেই আপনার। ওদের ভুল, আবার চোখ রাঙায় অন্যকে।'

থানার বড়বাবু ছেলেগুলোকে ভালোই চেনেন। যেতেই বড়বাবু বললেন—'আরে মিলনী সংঘ আমার দরজায় যে! ব্যাপার কি! কোনো সভা-টভা হবে না কি, না কোনও উৎসব?'

ক্লাবের আশিষ সব ব্যাপারটা বলল। বড়বাবু খুশি হয়ে নিখিলকে বললেন—'বা! আপনার ছেলে তো এই বয়সেই ভালো কাজ করতে শিখে গেছে। আচ্ছা দাঁড়ান। বিমল এদের জি.ডি.-টা নিয়ে নাও তো। ভালোই হল। একটু বাদেই আমি ওদিকেই একটা কাজে যেতাম। চলো, আমিও না হয় তোমাদের সঙ্গেই যাই। কি বলো, ব্যাপারটা সামনাসামনি মিলিয়ে নেওয়া যাবে।'

ওরা বলল—'স্যার, তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

জি.ডি. করে বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওরা বলাইবাবুর বাড়িতে গেল। বলাইবাবু বাড়িই ছিলেন। বললেন—'কি ব্যাপার?' বড়বাবু বললেন—'চলুন—ভিতরে চলুন। একটু কথা আছে।'

অগত্যা ভিতরে গেলেন বলাইবাবু সবাইকে নিয়ে। বড়বাবু বললেন—'তা আপনার বড়ছেলে কোথায়? কি নাম তার?'

বলাইবাবু—'তার নাম প্রতাপ। কিন্তু কেন?'

বড়বাবু—কি হয়েছিল আজ দুপুরে? সে কোথায়?

বলতে বলতেই খোলা দরজা দিয়ে একটি ছেলে ঢুকল। একসঙ্গে এত লোক দেখে বলল—'কি হয়েছে বাবা?'

বলাইবাবু বললেন—'আয় প্রতাপ। এই যে আমার বড় ছেলে।'

বড়বাবু—'আজ দুপুরে কি এমন হয়েছিল যে তার জন্য তুমি ওনাকে সাবধান করে দিয়েছ?

প্রতাপ নিখিলের দিকে তাকিয়ে বলল—'এর জন্য পুলিশ নিয়ে এসেছেন।'

আশিষ বলল—'ইনি আনেননি। আমরাও আনিনি। সব ব্যাপারটা শুনে বড়বাবু নিজেই এসেছেন।'

বড়বাবু—'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না এদের সঙ্গে বলবে?'

প্রতাপ—'না, না, সামান্য ব্যাপার। আমি শুধু ওর ছেলেকে সামলে রাখতে বলেছিলাম।'

বড়বাবু একটু ধমকের সুরে বলেন—'শোনো ঐ ছেলেটি যা করেছে সবার ভালোর জন্যই করেছে। কল তোমাদের, জল সবার। তার অপচয় বন্ধ করা সবার কাজ। ছেলেটি তোমাদের অকারণে বিরক্ত করেনি। জল যাতে অপচয় না হয় তা দেখার দায়িত্ব প্রত্যেকের। তোমারও। এবার থেকে সামলে চলো নিজেকে। ঘুম থেকে যাতে ডেকে তুলতে না হয়, সেজন্য জলের কলগুলো ঠিকমত বন্ধ আছে কি না তা দেখে রাখবে। কেমন।'

এই বলে বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'সঙ্গে অন্য সবাইও।'

বাইরে এসে বড়বাবু নিখিলকে বললেন—'একদিন ছেলেকে নিয়ে আসবেন। আমি বলে দেবো কিভাবে কি করতে হবে। ঠিক আছে, আজ চলি।' বলে বড়বাবু জিপে উঠে বসলেন।

## জল নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি (অংকন)

*চিত্র ১*
*শ্রাবন্তী দাস, সপ্তম শ্রেণি,*
*হুগলি বালিকা বঙ্গ বিদ্যালয়, হুগলি*

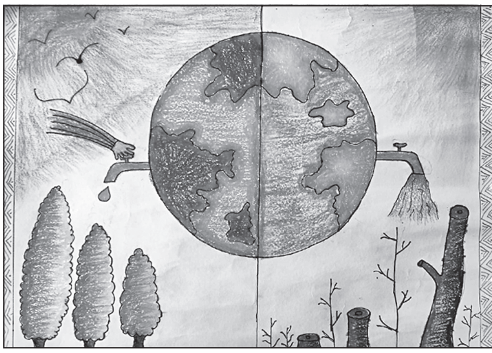

*চিত্র ২*
*ইনিশা তাবা স্সুম,*
*৪র্থ শ্রেণি,*
*অ্যামারানথাস*
*অ্যাকাডেমি,*
*ডোমকল, মুর্শিদাবাদ*

*চিত্র ৩*
*অনন্যা মন্ডল, অষ্টম শ্রেণি,*
*বারুইপুর গার্লস হাইস্কুল,*
*দক্ষিণ ২৪ পরগণা*

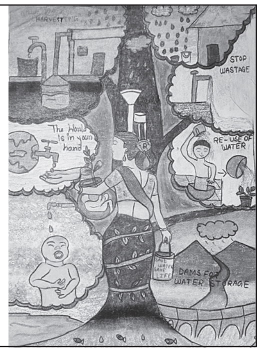


*চিত্র ৪*
*মুসকান মোল্লা, ষষ্ঠ শ্রেণি,*
*বারুইপুর গার্লস হাইস্কুল,*
*দক্ষিণ ২৪ পরগণা*

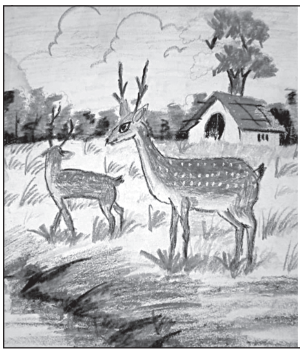

*চিত্র ৫*
*নার্গিস সুলতানা, অষ্টম শ্রেণি,*
*গোপালপুর হাইস্কুল,*
*কোচবিহার*

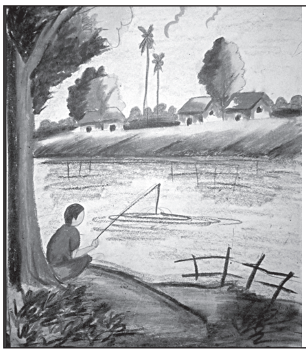

*চিত্র ৬*
*খুসবু পারভিন, অষ্টম শ্রেণি,*
*গোপালপুর হাইস্কুল,*
*কোচবিহার*

সতীনাথ ভট্টাচার্য

# পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জন—বিজ্ঞান বনাম শাস্ত্র

১৯৮৫ সাল। মুক্তি পেলো রাজ কাপুরের বিখ্যাত হিন্দি ছবি 'রাম তেরি গঙ্গা ময়লি'। ছবির একটি দৃশ্যে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নরেন (রাজীব কাপুর)-এর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী গঙ্গা (মন্দাকিনী) মিনতি জানান, 'আপনি গঙ্গা কো ময়লি মত হোনে দে না।' তখন নারী ও নদীর কথা মিলেমিশে একাকার হয়ে প্রকৃতিতে বেজে ওঠে এক করুণ রাগিণী। রাজের ছবির এই সংলাপ আমরা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। গঙ্গাসহ প্রতিটি নদীকে আমরা প্রতিনিয়ত 'ময়লি' করে দিচ্ছি। তাই, এখন 'গঙ্গা হমারি কহে বাত ইয়ে রোতে রোতে/ রাম তেরি গঙ্গা ময়লি হো গয়ি....'। ছবিতে 'এক দুখিয়ারি কহে' গানের দৃশ্যায়নে রাজ সুচারুভাবে দেখিয়েছেন আমরা গঙ্গাকে দেবীজ্ঞানে আরতি করি, বন্দনা করি, আবার একই সাথে কলুষিতও করি।

এই একই দৃশ্য চাক্ষুষ করলো গোটা কৃষ্ণনগর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি 'রূপসী বাংলা'র কবি জীবনানন্দ দাশের ১২৫ তম জন্মদিবসে। বিগত চার বছর ধরে নদীয়ার জীবনরেখা মুমূর্ষু জলঙ্গি নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে উঠে পড়ে লাগা নদীপ্রেমী সংগঠন 'সেভ জলঙ্গি' জীবনানন্দের জন্মদিবসে 'জলঙ্গি দিবস' পালন করে আসছে। এই বছর 'জলঙ্গি দিবস'-এ সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগরে জলঙ্গি নদীর বিসর্জন ঘাটে মাননীয় শ্রী উৎপল মাহাতোসহ 'দিশারী'র সদস্য-সদস্যাগণ টুসু গানের সুরে, নৃত্যের ছন্দে, ধামসা-মাদলের তালে তালে নদীকে আরতি করে। উৎপলদের গলায় যখন বাজছে 'জল জল করো টুসু জলে তোমার কি আছে?/মনেতে ভাবিয়া দেখো জলে শ্বশুর ঘর আছে', ঠিক তখনই ঝপঝপ করে নদীর বুকে পতিত হচ্ছে একের পর এক সরস্বতী প্রতিমা। প্রতিমার কাঠামো এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা পুজোসামগ্রী জলে ভাসছে। নদী দূষিত হচ্ছে। অনেক প্রতিমাই এদিন নদীবক্ষে নিমজ্জিত হয়েছে। কিন্তু পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের নামগন্ধও ছিল না। প্রথম দুদিন অবশ্য এই নদীতে পরিবেশবান্ধব ভাবেই সরস্বতী প্রতিমা নিমজ্জিত হয়েছে।

জলঙ্গির সারা শরীরে আজ দগদগে ঘা। এবছর 'জলঙ্গি দিবস'-এ নদীর পাড়ে 'কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় উদ্যান'-এ প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মধুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিহেলনে 'ময়ূরা ড্যান্স একাডেমি'র ছাত্রীরা 'অচিন মাঝি কোন সে পারের বন্ধু' গানের সাথে অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু মাঝিদের খেয়া পারাপারের দিন এখন শেষ হয়ে আসছে। প্রায় নির্জলা নদীতে জেলে, মাঝিরা আজ পেটে গামছা বেঁধে আছে। নদী দূষণের বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ নদীতে প্রতিমা নিমজ্জন।

২০২২ সালে ১২৫ বছরে পদার্পণ করা রামকৃষ্ণ মিশন ভগিনী নিবেদিতার ১৫৬ তম জন্মদিবসের (২৮ অক্টোবর) প্রাক্কালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে এক বড়সড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ঐ বছর ২৫ অক্টোবর কালীপুজোর পরদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ মিশনে পূজিতা শ্রীশ্রী মহাকালী প্রতিমা মিশনের ভেতরে থাকা একটি বড় চৌবাচ্চায় নিমজ্জিত করা হয়। মাননীয় সম্পাদক পরম পূজনীয় স্বামী আনন্দময়ানন্দজি মহারাজের কানে পৌঁছেছে অসুস্থ জলঙ্গি নদীর কান্না। তাই তিনি এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিতে কালবিলম্ব করেননি। এ কাজ তো প্রকৃতপক্ষে মানবসেবা তথা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'রই নামান্তর।

এদিকে ২০২২ সালে কৃষ্ণনগরের গর্ব প্রখ্যাত সুরসাধক ও ঔপন্যাসিক দিলীপকুমার রায়ের ১২৫ বছর পূর্তি বর্ষে কৃষ্ণনগর পৌর প্রশাসন জলঙ্গিবক্ষে পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের বন্দোবস্ত করে এক অনন্য নজির স্থাপন করল। এই প্রথমবার এই শহরে পৌরসভার চেয়ারপার্সনের আসন অলংকৃত করেছেন এক নারী—শ্রীমতী রীতা দাস। দায়িত্বভার কাঁধে নিয়েই তিনি এই শহরকে সুন্দর করে সাজাতে মাঠে নেমে পড়েছেন। দেবীপক্ষে জগন্মাতার মৃন্ময়ী প্রতিমা নিমজ্জনের ফলে জলঙ্গি মাতাকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করতে চান নি মাননীয়া পৌরমাতা। এছাড়া 'সেভ জলঙ্গি' তাঁর দুয়ারে নিত্য হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেছে যাতে ওই বছর থেকেই জলঙ্গি নদীতে বিকল্প পদ্ধতিতে প্রতিমা নিমজ্জন শুরু হয়। অবশেষে 'সেভ জলঙ্গি'-এর হাত ধরে ২০২২ সালেই দুর্গাপুজো থেকে পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের ব্যবস্থা করে ফেললেন পরিবেশপ্রেমী রীতা।

২০২২ সালে দুর্গাপুজোয় প্রথম হাইড্রা এনে পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের ট্রায়াল দিলো কৃষ্ণনগর পৌরসভা। এরপর কালী প্রতিমা নিমজ্জনের সময় আরও ভালো ব্যবস্থা চোখে পড়ল। সব শেষে শহরের প্রধান উৎসব জগদ্ধাত্রীপুজোয় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে নদীবক্ষে বিকল্প পদ্ধতিতে প্রতিমা নিমজ্জন করে তাক লাগিয়ে দিলেন কৃষ্ণনগর পৌর কর্তৃপক্ষ। দুটি হাইড্রলিক ও দুটি পোক্লেইন জেসিবির সাথে পৌরসভার নিজস্ব একটি জেসিবি প্রস্তুত রাখা ছিল। জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বিসর্জন ঘাটে আসামাত্র পৌরকর্মীরা কাঁধে করে তা নিয়ে আসেন জলের কাছে। তারপর প্রতিমার কাঠামো নদীতে ফেলার সাথে সাথে এগিয়ে আসে প্রথম পোক্লেইন জেসিবি। সবার আগে তিনবার জল দেয় দেবীর পাদপদ্মে। কৈলাশ যাত্রার আগে যেন মায়ের শ্রীচরণ ধুয়ে দেওয়া হল। এরপর কাঠামো ঠেলে ঠেলে নদীপাড়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসে। সেখান থেকে কাঠামো তুলে নেয় দ্বিতীয় পোক্লেইন জেসিবি আর তা সযত্নে রেখে আসে পার্শবর্তী একটি স্থানে। এখানেই জমা হতে থাকে সমস্ত কাঠামো যা পরবর্তীতে মিশে যাবে মাটির সঙ্গে। হাসি ফুটল রুগ্ন জলঙ্গি নদীর মুখে।

কৃষ্ণনগরে জলঙ্গি ও অঞ্জনা কঠিন অসুখে ভুগছে। অন্যান্য জলাশয় যেমন, রাজার দীঘি প্রভৃতির অবস্থাও তথৈবচ। দূষণে দূষণে নদী বা

বিভিন্ন জলাশয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত। পুজো বা উৎসবে বায়ুদূষণ বা শব্দদূষণের থেকেও বেশি হয় জলদূষণ। প্রতিমা নিমজ্জনের পরে জলে ভেসে থাকা প্রতিমার কাঠামো মাত্রাতিরিক্ত জলদূষণ ও দৃশ্যদূষণ ঘটায়। প্রতিমা তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক ও থার্মোকল জলে মিশে জল ও জলজ জীবের জীবন বিপন্ন করে তোলে। প্রতিমা তৈরিতে যে রঙ ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে থাকে বিষাক্ত সীসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি। প্রতিমা নিমজ্জনের পর এইসব রাসায়নিক পদার্থ দ্রুত জলে মিশে জলকে দূষিত করে। এর ফলে জলজ উদ্ভিদ ও মাছকে হাতছানি দেয় মৃত্যু। জলজ প্রাণ বিপন্ন হলে, তার প্রভাব পড়ে বাস্তুতন্ত্রে। নদী দূষিত হলে, সেই জল ব্যবহারে মানবদেহে চর্মরোগসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যা, এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া সীসা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি নদীতে মিশে মাছের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিমার মাটি, বাঁশ ইত্যাদি নদীর তলদেশ ভরাট করে তোলে। পুজোর ফুল, বেলপাতা, মালা পচে গিয়ে নদীদূষণের দোসর হয়। এছাড়া প্রতিমা নিমজ্জনের সময় একগাদা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নদীর বুকে চেপে বসে। দমবন্ধ হয়ে ছটফট করতে থাকে নদী। প্রতিমা নিমজ্জনের ফলে নদী হারিয়ে ফেলে তার স্বচ্ছতা। মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবীদের আয়ের উৎস নদী। নদীমাতৃক দেশে নদী না বাঁচলে আমরা বাঁচব না। তাই জলজ জীবসহ নদী ও জলাশয় বাঁচানো অত্যন্ত জরুরি। 'ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা'র একটি নির্দেশিকায় গঙ্গায় প্রতিমা নিমজ্জনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এলাহাবাদে গঙ্গায় এখন আর প্রতিমা নিমজ্জিত করা হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। এই রাজ্যে আজও বেশিরভাগ জায়গায় পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের বন্দোবস্ত করা হয়নি।

কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ মিশনের চৌবাচ্চায় মহাকালীর প্রতিমা নিমজ্জন আর 'সেভ জলঙ্গি'-র ডাকে এগিয়ে এসে কৃষ্ণনগর পৌরসভার জলঙ্গির বিসর্জন ঘাটে পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের বন্দোবস্ত করা যেমন নদী বাঁচানোর শুভ বার্তা দিয়েছে, তেমনই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এ কাজ মোটেও শাস্ত্রবহির্ভূত নয়। প্রয়োজনের নিরিখে সনাতন ধর্মের শাস্ত্র যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে। বৈদিকযুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আজ আর স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এখন কেউ অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলে বিরল ও সংরক্ষণযোগ্য প্রাণী হত্যার দায়ে পুলিশ তাঁকে সোজা গারদে ভরে দেবে। শাস্ত্রের বিধান যুগোপযোগী না হলে জীবনযাত্রা যে অচল হয়ে পড়ে, তা ভালমতোই বুঝতেন প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা। সেজন্য তাঁরা বারেবারে মানুষকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বলে গেছেন। পরাশর স্মৃতিতে স্পষ্ট করে লেখা আছে, 'নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ'। ধর্মীয় সংস্কারের সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে কুপ্রথাকে আঁকড়ে ধরার কথা কখনই কোনও শাস্ত্র বলেনি।

প্রতিটি বেদেই জলকে মাতৃস্বরূপা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ বলছেন, জল সুখের আধার। আমাদের জন্য অন্নকে ধারণ করে জল। তাই, ভারতীয় সমাজে প্রথম থেকেই জলকে বিশুদ্ধ রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখা হয়েছে। মনু সংহিতায় স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, জলে কখনও মল-মূত্র বা কফ-কাশি ফেলা যাবে না। মল-মূত্র লিপ্ত জামাকাপড়ও জলাশয়ে ধোওয়া নিষিদ্ধ। রক্ত বা বিষ ফেলে জলাশয়কে দূষিত ও অপবিত্র করাও বারণ আছে— 'নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা

সমুৎসৃজেত।/অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষানি বা।।' পদ্মপুরাণে বলা আছে, যে পুকুরের জল দূষিত করে, সে নরকে যায়— 'সুকূপানাং তড়াগানাং প্রগানাং চ পরংতপ।/সরসাং চৈব ভৈত্তারো নরা নিরয়গামিন:।।'

নদীর বেগকে অব্যাহত রাখার ওপরও জোর দিয়েছেন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ। মনু বলেছেন, নদী বেগেন শুধ্যতি। মনু সংহিতার নির্দেশ, নদী, পুকুর ইত্যাদির শুদ্ধতা রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ঘাটেই স্নান করা উচিত। পুকুর, কূপ বা অন্যান্য জলাশয়ের জল চুরিকেও অপরাধ হিসেবে ধরা হতো তখন। প্রাচীন ভারতে কূপ-পুকুর খননের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলা আছে, এসব কাজ করার ফলে কিছু লোকের যদি ক্ষতিও হয়, তবু গরিষ্ঠের কল্যাণের কথা ভেবে তা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। প্রাচীন ভারতের যাবতীয় চিন্তাই ছিল জলকেন্দ্রিক। জলকে দূষণমুক্ত রাখাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। শুক্লযজুর্বেদে বলা রয়েছে, জল বিশ্বকল্যাণকারী এবং এই কারণেই জলকে কোনমতেই দূষিত করা চলবে না। জল সংরক্ষণে হতে হবে যত্নবান।

এবার চোখ রাখি রামায়ণের পাতায়। মারীচ বধের পর কুটিরে ফিরে সীতাকে দেখতে না পেয়ে পাগলপারা রাম, সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে গোদাবরী নদীর তীরে উপস্থিত হন। তিনি গোদাবরীর আছে সীতার খোঁজ করেন। কিন্তু গোদাবরী সব কিছু জানা সত্ত্বেও রাবণের ভয়ে মুখ খুললেন না। শোকাতুর রাম তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি বাণ নিক্ষেপ করে গোদাবরীকে শুষ্ক করে দিতে চাইলেন। বাধা দিলেন লক্ষ্মণ। বললেন— একস্য নাপরাধেন লোকান হন্তুং ত্বমহসি—একের অপরাধে আপনি ত্রিভুবনকে ধ্বংস করতে পারেন না। সেটা উচিতও নয়। লক্ষ্মণের এই কথার মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার বার্তা। নদী শুকিয়ে গেলে বিপন্ন হবে প্রকৃতি ও পরিবেশ।

তাই সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, আজ জলদূষণের হাত থেকে নদী ও জলাশয়কে রক্ষা করার যে বার্তা দিয়ে চলেছে বিজ্ঞান, সেই একই কথা বলে গেছেন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ। আমাদের এই নদীমাতৃক দেশ থেকে যখন একের পর এক নদী, খাল, বিল, পুকুর কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে, পরিবেশ অসুস্থ হচ্ছে, তখন পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের বন্দোবস্ত করা ছাড়া আর উপায় কি! আর প্রতিমা নিমজ্জনের এই বিকল্প পদ্ধতি তো পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মত। তাছাড়া, হিন্দুধর্মে কিছু কিছু দেব-দেবীর প্রতিমা জলে না দিয়ে বৃষ্টির জলে গলিয়ে দেওয়ার জন্য গাছতলায় রাখার বিধান তো আছেই। যিনি সকল প্রাণীকে অভয় দান করেন, তাঁর পুজোতে কিসে শুভ, কিসে অশুভ, তা মাথায় রাখতে হবে বই কি।

রা জ দী প ভ ট্টা চা র্য

# পৃথিবীর জলসম্পদ ও তার বন্টন

*পৃথিবী সর্বার্থেই এক জলগ্রহ। এর ৭১% এলাকা জলে ঢাকা। এখানে মানুষ এবং প্রায় সকল জীবের অস্তিত্ব জলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। এমনকি একটি সদ্যজাত শিশুর শরীরের ৭৮% জল। পরিণত মানুষের দেহে তা ৬০%। কাজেই এহেন জলকেই যে 'জীবন' বলা হবে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অথচ সৌরমণ্ডলের অন্তর্গ্রহগুলির (Inner Planets) স্বাভাবিক চরিত্র এমন নয়। আমরা জানি সূর্যের নিকটবর্তী ৪টি গ্রহ অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল—এরা অন্তর্গ্রহ নামে পরিচিত। অপর দিকে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন হল বহির্গ্রহ (Outer Planets)। পৃথিবী বাদে অপর অন্তর্গ্রহগুলি মূলত শুষ্ক, বালি-পাথর-ধূলিকণায় ভরা। তাহলে ব্যতিক্রমী ভাবেই কী পৃথিবী এমন জলগ্রহ রূপে অবস্থান করছে? এই কারণেই মনে প্রশ্ন জাগে যে পৃথিবীর এত জলের উৎস কী?*

**পৃথিবীর জলের উৎস :**

প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জলের উৎস সন্ধানে বিশেষ উৎসুক। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উৎস চিহ্নিত করা বোধহয় সম্ভব নয়।

ক) **পৃথিবীর নিজের জল :**

প্রায় ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর আগে ঘন মেঘপুঞ্জ থেকে সূর্যের উৎপত্তি ঘটে। বাড়তি উপাদানসমূহ ধীরে ধীরে সৌরমণ্ডলের অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করে। এভাবে যখন পৃথিবীর উদ্ভব ঘটেছিল তখন ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা এতটাই বেশি ছিল যে কঠিন বা তরল অবস্থায় জল থাকা সম্ভব ছিল না। আর বাষ্পীভূত জল সহজেই পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে চলে যেত মহাকাশে। তাই সেই সময় থেকে যেটুকু জল আছে তা মূলত ভূগর্ভে ম্যাগমার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়। কিন্তু তা বড়জোর এই গ্রহের মোট জলের কিয়দংশ মাত্র। তাহলে এই বাকি জল এল কোথা থেকে?

খ) **গ্রহাণুপুঞ্জ :**

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই গ্রহে জলের আরেক উৎস গ্রহাণুপুঞ্জ। সৌরজগতের বাইরের মহাকাশে জল, জলীয় বাষ্প ও বরফের অস্তিত্বের প্রাচুর্য আছে। তাই সেখান থেকে আসা গ্রহাণুগুলো সহজেই আমাদের জলের যোগান দিতে পারে। প্রায় ৪ থেকে ৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে সৌরমণ্ডলের বহির্গ্রহগুলির কক্ষপথে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। তাই তাদের অভিকর্ষজ টানের ক্ষেত্রেও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এরফলে বহির্বিশ্ব থেকে বেশ কিছু গ্রহাণুপুঞ্জের আবির্ভাব ঘটে সৌরমণ্ডলে। মনে করা হয় এইসব গ্রহাণুপুঞ্জও পার্থিব জলের অন্যতম উৎস। সাম্প্রতিক কালে 'Analysis of asteroid Ryugu samples' শীর্ষক অভিযানে হায়াবুসা-২ মহাকাশযানের আনা নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে গ্রহাণুতে পাথরের ভিতরে যে প্রকার জল থাকে তার সঙ্গে পার্থিব জলের যথেষ্ট মিল আছে। বিজ্ঞানীরা একপ্রকার উল্কাকে Cl chondrites নামে চিহ্নিত করেছেন এবং মনে করেছেন এইপ্রকার উল্কার মাধ্যমেই পৃথিবীর ৩০% জল এসে থাকতে পারে।

নাসার মহাকাশযান 'SIRISRE' ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Bennu নামক গ্রহাণু থেকে পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে। সেই নমুনা পরীক্ষায় তাতেও জলের উপস্থিতি উপরের ভাবনাকে সমর্থন করে।

গ) **থেইয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ :**

বিজ্ঞানীদের আরও একটি ভাবনা হল পৃথিবীর সঙ্গে থেইয়া (Theia) নামক মহাজাগতিক বস্তুর সংঘর্ষ। আনুমানিক ৪.৪ বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলের মতো আকারের একটি মহাজাগতিক বস্তুকণা ও পৃথিবীর ভয়ংকর সংঘাত হয়। এতে খানিক বস্তু ছিটকে গিয়ে পরে সংহত হয়ে আমাদের একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের উৎপত্তি ঘটায়। বিজ্ঞানীরা আরও মনে করেন যে থেইয়ার দেহাংশ এখনো ভূগর্ভে আছে। আফ্রিকা ও প্রশান্ত

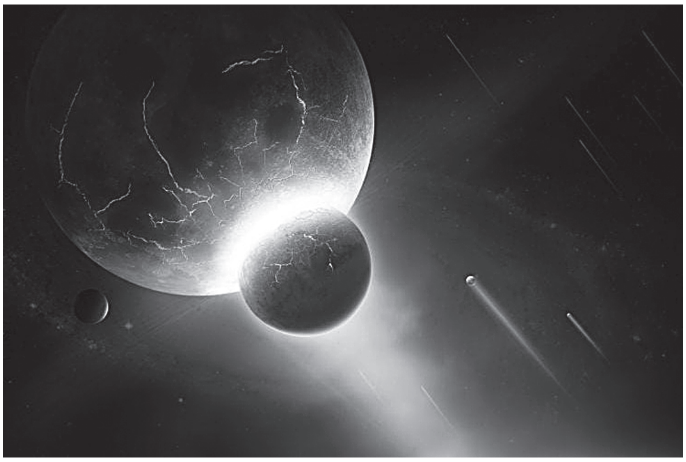

*থেইয়া ও পৃথিবীর সংঘর্ষ (কাল্পনিক চিত্র)*

মহাসাগরের নিচে অবস্থিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিলাস্তরকে এক্ষেত্রে থেইয়ার অবশেষ রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যাইহোক এসবের সঙ্গে কিছু বিজ্ঞানী এও মনে করেন যে সেইসময় থেইয়া নামক বস্তুটি বিপুল পরিমাণে জলের জোগান পৃথিবীকে দিয়েছিল।

ঘ) **জলের সৃষ্টি :**

আরেকটি তত্ত্বে মনে করা হয় যে পৃথিবী হয়ত নিজের জল নিজেই বানিয়ে নিয়েছে। অত্যন্ত শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা গেছে যে সৌরজগতের বাইরে সদ্যোজাত গ্রহকে ঘিরে রয়েছে আণবিক হাইড্রোজেন। এক্ষেত্রে কিছু বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে এই আণবিক হাইড্রোজেন অতীত পৃথিবীর ম্যাগমা সমুদ্রের সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রভূত পরিমাণে জল সৃষ্টি করে থাকতেই পারে এবং এভাবেই হয়ত আমাদের প্রিয় গ্রহ হয়ে উঠেছে এক 'Watery planet'।

*পৃথিবীতে জলের বন্টন*

**পৃথিবীতে জলের উপস্থিতি :**

আমরা পৃথিবীর মোট জলকে ১০০% ধরলে তার ৯৭% লবণাক্ত জল। এক্ষেত্রে ক্লোরাইড, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি লবণ মিশে জলকে লবণাক্ত করে তোলে। এই ৯৭% লবণ জল সাধারণ ভাবে মানুষের কাছে ব্যবহারযোগ্য নয়। তবে লবণ জলকেও লবণ মুক্ত করে ব্যবহার করাই যায়। কিন্তু তাতে বিপুল পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়। বাকি ৩% জল মিষ্টি এবং মানুষের কাছে ব্যবহারযোগ্য। এর মধ্যে ২.১% জমা থাকে পৃথিবীর শীতল অংশে বরফ রূপে। এই বরফ গলে গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার বা ২০ ফুট বেড়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সন্নিহিত অঞ্চলে এবং উচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলিতে সঞ্চিত আছে এই

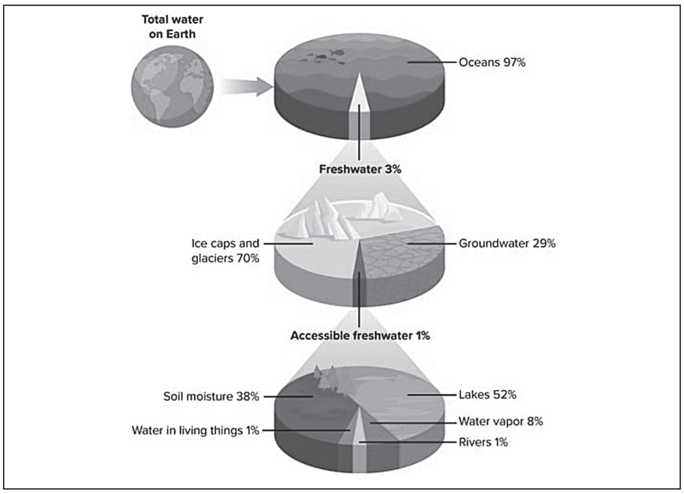

*পৃথিবীতে জল বন্টন*

বরফ। ০.৯% মিষ্টি জল জমা আছে ভূগর্ভে ভৌমজল রূপে। ভূপৃষ্ঠের নিচে যে শিলাস্তরে ভৌমজল সঞ্চিত থাকে তাকে অ্যাকুইফার বলা হয়। এই ভৌমজল আমাদের ব্যবহৃত জলের প্রধান উৎস।

তাছাড়া মোট মিষ্টি জলের অতি সামান্য অংশ ভূপৃষ্ঠে হ্রদ, জলাশয়, নদী, খাল, বিলে জমা থাকে। সেখান থেকেও আমরা আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি।

**পৃথিবীর জলচক্র :**

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় রূপে পৃথিবীতে অবস্থিত জল নির্দিষ্ট পথে চক্রাকারে আবর্তিত হয়, একে জলচক্র (Hydrological Cycle) বলে। উষ্ণতার প্রভাবে সমুদ্র, নদী, জলাশয়, মাটি প্রভৃতি থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়। একে বাষ্পীভবন (Evaporation) বলা হয়। আবার উদ্ভিদ দেহ থেকে সরাসরি জলীয় বাষ্প বাতাসে মেশে, যা বাষ্পীয়প্রস্বেদন (Evapotranspiration) নামে পরিচিত। জলীয় বাষ্প অধিক উচ্চতায় শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় এবং জলকণা ও তুষারকণা সৃষ্টি করে। এভাবে মেঘ উৎপন্ন হয়। মেঘ থেকে বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে অধঃক্ষেপণ (Precipitation) রূপে ওই জল আবার ভূপৃষ্ঠে ফেরত আসে। তার কিছু অংশ শীতল অঞ্চলে বরফ রূপে জমে থাকে। একাংশ ভূগর্ভে প্রবেশ (Percolation) করে এবং ভৌম জলস্তরকে (Ground Water) সমৃদ্ধ করে। একটি অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায় যাকে ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ (Surface Run off) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে জল পুনরায় সমুদ্র, হ্রদ বা জলাশয়ে ফিরে যায়। আবার মাটি থেকে জল সংগ্রহ করে তার কিছুটা বাষ্পীয় প্রস্বেদনের মাধ্যমেও উদ্ভিদ বাতাসে ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে পৃথিবীতে জলচক্র সম্পন্ন হয় এবং এই জীবমণ্ডলের তাবৎ জীবকূলের জীবনযাপনে সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে একটা কথা ভুললে চলবে না যে জলচক্রের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপে জলের যাওয়া আসা সম্পূর্ণ রূপে সৌরশক্তির উপর নির্ভরশীল এবং সূর্যই সর্বপ্রকার শক্তি সরবরাহ করে।

**পৃথিবীতে জলের বন্টন :**

২০০০ সালে FAO এর রিপোর্ট অনুযায়ী (প্রকাশ : ২০০৩, Rome) পৃথিবীতে মোট জলের পরিমাণ ৪৩৭৫০ $km^3$/year কিন্তু এই জলরাশির বন্টন সর্বত্র সমান নয়। যদি মহাদেশের ভিত্তিতে দেখা হয় তাহলে জলসম্পদের বিচারে দুই আমেরিকা মিলে ৪৫% অধিকার করে। এরপর এশিয়া ২৮%, ইউরোপ ১৫.৫%, আফ্রিকা ৯% ও ওশিয়ানিয়া ২% দখল করে।

এবার যদি বসবাসকারী মানুষের মাথাপিছু হিসেব করা হয় তাহলে জলসম্পদের পরিমাণ আমেরিকায় ২৪০০০ $m^3$/year, ইউরোপে ৯৩০০ $m^3$/year, আফ্রিকায় ৫০০০ $m^3$/year ও এশিয়ায় ৩৪০০ $m^3$/year। মোট জলসম্পদের বিচারে ২০০০ সালের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলি হল যথাক্রমে ব্রাজিল, রাশিয়া, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, কলম্বিয়া, ইউ.এস.এ., পেরু ও ভারত। অপর দিকে জলসম্পদের দিক থেকে দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইজরায়েল, জর্ডন, লিবিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, বাহারিন, কুয়েত প্রভৃতি। এখানে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ভারতে মোট জলসম্পদ অধিক দেখালেও মাথাপিছু জলসম্পদের দিক থেকে তা যথেষ্ট কম।

ভারত মোট ভূপৃষ্ঠের ২.৪৫% স্থান এবং মোট পার্থিব জলসম্পদের ৪% স্থান দখল করে। অথচ পৃথিবীর ১৬% এর বেশি মানুষ বাস করে এই দেশে। ফলত এই বিপুল পরিমাণ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ক্রমবর্ধমান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিকল্পনাহীন কৃষি ও শিল্পের বিকাশ, নগরায়ণ ইত্যাদি পরিবেশের সাথে সাথে জলসম্পদেরও দ্রুতহারে অবনমন ঘটাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু, শিল্প ও কৃষিজাত দূষক, রাসায়নিক জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট করছে। আমাদের জীবনরেখা নদীগুলি দূষিত হয়ে পড়ছে। এই মুহূর্তে যমুনা, সবরমতি, ভাইগাই, কোয়ুম, গোমতী, আদার, মুসী এমনকি স্থানবিশেষে গঙ্গার দূষণমাত্রাও আশঙ্কাজনক। ভৌমজলের ক্ষেত্রেও আর্সেনিক, ফ্লোরিন এবং অন্যান্য ভারি ধাতুর দূষণ অনেক ক্ষেত্রেই মাত্রাছাড়া। এই ক্রমবর্ধমান দূষণ এদেশে প্রাপ্ত জলের ব্যবহারের সুযোগ আরও সংকুচিত করে চলেছে। তাই আমাদের অধিক উল্লাসের কোনো সুযোগ নেই।

*যমুনা নদীতে জল দূষণ*

আগামী বিশ্ব যে সকল কারণে অস্তিত্বসংকটের মুখোমুখি দাঁড়াবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন তার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হল জলসংকট। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে বিশ্বে মিষ্টি জলের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। ক্রমবর্ধমান সভ্যতার হিংস্র আগ্রাসন খুব দ্রুত চারপাশের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। ভৌমজলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, শিল্পায়ন, নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি সমস্যার কারণে মিষ্টি জলের যোগান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ভারতের মতো জনবহুল দেশে এইসব সমস্যা আরও প্রকট। তাই অবিলম্বে আমাদের জীবনযাত্রা, ভাবনা ও সভ্যতার অভিমুখে বড় পরিবর্তন না এলে আগামী দিনগুলি নিঃসন্দেহে ঘোর অনিশ্চয়তায় ভরা।

**তথ্যসূত্র**


1 Review of World Water Resources by Country-2003 (FAO of the United Nations)
2 How did Earth gets its water? –Jason Davis
3 Most of the Earth's water came from a cosmic collision that formed the moon. –David Szondy
4 Earth's Water Resources–ASLO

দেবাশিস সেনগুপ্ত

# আজকের দৃষ্টিতে পূর্ব ভারতের তিনটি বড় নদী পরিকল্পনা

*সবুজ বিপ্লবের অগ্রদূত ডিভিসি প্রকল্প দামোদর উপত্যকায় অসুস্থায়ী সেচ ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এনেছে, ফলে সেচ সেবিত এলাকায় ভূগর্ভের জলস্তর নেমে চলেছে মারাত্মক ভাবে। বন্যার জোর কমেছে, কিন্তু থাকছে অনেকদিন। ফরাক্কা ব্যারাজ বানানো হয়েছিল গঙ্গা নদীর গতি পরিবর্তনের চরিত্র না বুঝে। তাতে কলকাতা বন্দর রক্ষা পায়নি, বরং ব্যারাজের ফলে উজানে ও ভাটিতে ভাঙন বেড়েছে, পদ্মা অববাহিকায় পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে। তিস্তা ব্যারাজে সেচ পরিকল্পনা নদীর প্রবাহের সাপেক্ষে অবাস্তব রকমের বড় ছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে সুখা মরশুমে সব সেচ বন্ধ করলেই মঙ্গল।*

**দামোদর প্রকল্প**

দামোদর নদ পূর্ব ভারতের বড় নদনদীগুলোর মধ্যে একটা। ছোটনাগপুরের পালামৌ পাহাড় থেকে বেরিয়ে পূর্ব ও দক্ষিণে বয়ে গিয়ে দামোদর হুগলি নদীতে মিশেছে। প্রায় তেইশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার জল বয়ে যায় এই নদী দিয়ে। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থেকে এই নদীর দক্ষিণমুখী দুই ধারা—আমতা আর মুণ্ডেশ্বরী (চিত্র ১)।

ঝাড়খণ্ডে দামোদরের উচ্চ অববাহিকা নানা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে জামালপুরের উজানে মধ্য অববাহিকাতেও মাটির নিচে আছে কয়লা। ভাটিতে মধ্য অববাহিকা আবার খুব উর্বর। উচ্চ অববাহিকায় নদীর ঢাল প্রতি কিলোমিটারে গড়ে ১৯ মিটার, আর নিম্ন অববাহিকায় গড়ে মাত্র ১৯ সেন্টিমিটার।[১] উচ্চ অববাহিকায় জোর বৃষ্টি হলে নিম্ন অববাহিকায় বয়ে আসা জলস্রোত নদীর খাত দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে যেতে পারে না, দুপাশের জমি ভাসিয়ে দেয়। জমিকে উর্বরতাও দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা জি টি রোডের গুরুত্ব বোঝা গেছিল। বন্যা থেকে সেই রাস্তাকে বাঁচাতে দামোদরের পূর্ব তীর বরাবর বাঁধ দেওয়া হয়। তবু বার বার বন্যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে থাকে।

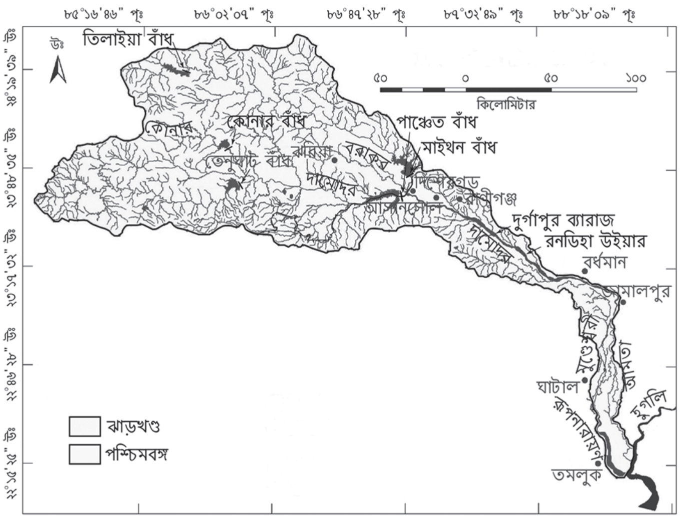


চিত্র ১। দামোদর অববাহিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হওয়ার মুখে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ আর উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নের উদ্যোগ শুরু হল। সরকারি তদন্ত কমিটিতে সামিল হয়েছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির সাহায্য চাইল। সেখানকার ইঞ্জিনিয়ার ভুর্ডুইন সাহেব এসে বাঁধ-জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্যারাজের সাহায্যে সেচব্যবস্থা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি মিলিয়ে জমাটি পরিকল্পনা দিয়ে গেলেন। তারপর দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীন দেশের সরকার সংসদে আইন করে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) গঠন করল। অর্থাভাবে ভুডুইনের সব প্রস্তাব মানা না গেলেও একে একে চারটে বাঁধ দেওয়া হল তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেতে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হল বোকারো, চন্দ্রপুরা, দুর্গাপুর ও মেজিয়াতে, আর দুর্গাপুরে হল ব্যারাজ (বাঁধ নয়, নদীর গতিপথে সারি সারি গেটের সাহায্যে জলতল সামান্য উঁচু করে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা)। ব্যারাজের ঠিক উজানে নদীর গতিপথের বাঁদিকের একটা খাল দিয়ে জল যায় ত্রিবাণীর কাছে ভাগীরথী পর্যন্ত, আর ডানদিকের আর একটা খাল গেছে হাওড়ায় মুণ্ডেশ্বরী নদী পর্যন্ত। তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। মাইথনে একটা গ্যাস টারবাইনও আছে। এছাড়া তেনুঘাটে বিহার সরকারের একটা বাঁধ আছে বোকারো শিল্পাঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য। নিচের সারণিতে বাঁধগুলোর বিবরণ দেওয়া হল।

| স্থান | নদী | উদ্বোধন (সাল) | উচ্চতা (মিটার) | জলাধারের ধারণ ক্ষমতা (ঘন কিলোমিটার) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ব্যবহার অযোগ্য | ব্যবহারযোগ্য |
| তিলাইয়া | বরাকর | ১৯৫৩ | ৩০.২ | ০.০৭৫ | ০.৩১৯ |
| কোনার | কোনার | ১৯৫৫ | ৪৮.৮ | ০.০৬০ | ০.২৭৬ |
| মাইথন | বরাকর | ১৯৫৭ | ৫০.০ | ০.২০৭ | ১.১৫৫ |
| পাঞ্চেত | দামোদর | ১৯৫৯ | ৪৫.০ | ০.১৭০ | ১.৩২৭ |
| তেনুঘাট | দামোদর | ১৯৭৪ | ৫৫.০ | — | ০.২২৪ |

ডিভিসির আগেও দামোদরের থেকে সেচের কিছু ব্যবস্থা ছিল, যা পরে ডিভিসির অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে ছিল দুর্গাপুরের থেকে কিছুটা ভাটিতে রনডিহাতে ১৯৩২ সালে তৈরি উইয়ার (ব্যারাজের থেকে ছোট ব্যবস্থা, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য)। বন্যানিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হিসেবে ঠিক হল, রনডিহার প্রবাহ মাত্রা কোনো মতেই আড়াই লক্ষ কিউমেক (সেকেন্ডে আড়াই লক্ষ ঘনমিটার)-এর বেশি হতে দেওয়া যাবে না।

ডিভিসির জলাধারগুলো অনেকটা ভর্তি করে নেওয়া হয় বর্ষা পেরনোর আগেই, যাতে অকারণে খালি না থেকে যায়। আবার মুশকিল হল, বর্ষার শেষে জলাধার পুরোপুরি ভর্তি থাকলে তখন অতিবৃষ্টির জল বাঁধে ধরে রেখে বন্যা সামলানো যাবে না। ডিভিসির জলাধারগুলোর ব্যবহারযোগ্য ধারণক্ষমতার অর্ধেকেরও বেশি ফাঁকা রাখার কথা বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য। তবু লাগাতার বৃষ্টি হতে থাকলে ডিভিসি একসময় জল ছাড়তে বাধ্য হয়।

রনডিহার তথ্য অনুযায়ী, ডিভিসির বাঁধগুলো চালু হবার পরে দামোদরে বছরের সর্বাধিক প্রবাহ অনেকটাই কমেছে, তবে তা বরাবর লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকে নি (চিত্র ২)। ডিভিসি তথ্য দেখিয়ে বলেছে, প্রতিটা বন্যাই হয়েছে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, আর জলাধারগুলো না

থাকলে বন্যা আরও ব্যাপক হত। কথাটা ঠিক, তবে অংশত। অতিবৃষ্টি হয় কালেভদ্রে। তাই কখনো কখনো ঝুঁকি সত্ত্বেও সেচের চাহিদা মেটাতে অল্পদিনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত জল ভরে নেওয়ার তাগিদ থাকে। বাস্তবে কতটা ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে তার তথ্য নেই। তবে অর্ধশতাব্দীতে পাঁচ বার বড় বন্যার ঘটনা ঘটেছে, এটা সত্যি। তাছাড়া, বাঁধগুলো চালু হবার পর বন্যা কম এলাকা জুড়ে হলেও বেশিদিন স্থায়ী হচ্ছে। কারণ বড় বন্যা এড়াতে যে জলটা ধরে রাখা হল, সেটাও দু'চারদিন পরে ছেড়ে দিতে হচ্ছে পরবর্তী অতিবৃষ্টির প্রস্তুতি হিসেবে।

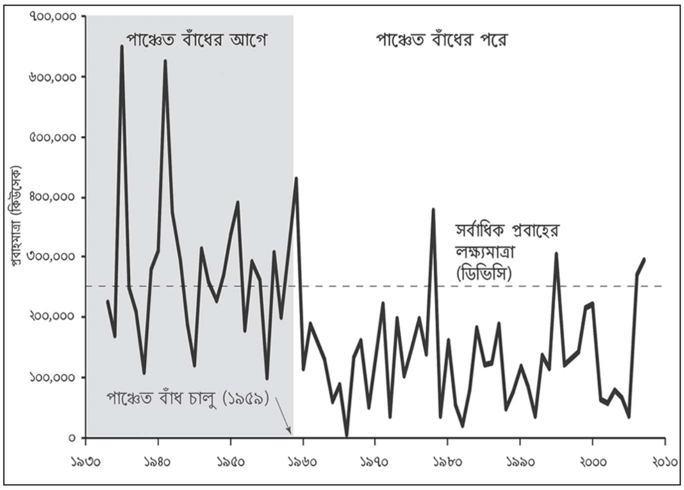


চিত্র ২। বনডিহাতে এক এক বছরের সর্বাধিক প্রবাহ

ডিভিসির আগে দামোদরের জলে ৭৫,০০০ হেক্টর জমিতে বর্ষাকালীন চাষ হত। ডিভিসির হওয়ার পর সেচ পৌঁছেছে ৩,৩৪,২৭৪ হেক্টর জমিতে।[২] অবশ্য এটা কাগজে কলমে। একটা সরকারি রিপোর্ট অনুসারে খালপথে বয়ে নিয়ে যেতে ভারতে ষাট শতাংশের বেশি জল নষ্ট হয়।

বর্ষার চাষ বর্ষার জলেই অনেকটা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বৃষ্টি হয় দফায় দফায়, তার ফাঁকে শুকনো দিন যায় অনেক। তখন সেচের প্রয়োজন হয় একসঙ্গে অনেকটা। ডিভিসি সেই চাহিদা পুরো মেটাতে পারে না। কিন্তু সেচের অভাবে যত্নে বোনা ফসল শুকিয়ে যেতে দেওয়া যায় না, সেচের অন্য ব্যবস্থা করতে হয় তখন। পুকুরের জল যাদের নাগালে নেই, তাদের ভূগর্ভের জলই ভরসা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলার সম্মিলিত হিসাবে বর্ষা-পূর্ববর্তী ভূগর্ভের জলস্তর বছরে ২৩ সেন্টিমিটার করে, আর বর্ষা-পরবর্তী ভূগর্ভের জলস্তর বছরে ৩০ সেন্টিমিটার করে নেমে যাচ্ছে।[৩] ডিভিসির সেচের এলাকায় জলস্তরের এতটা অধোগতি, যার হার পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ জেলার থেকে বেশি, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ডিভিসির জলের যোগান সেচের চাহিদা মেটাতে পারছে না।

ডিভিসির বহুমুখী নদী পরিকল্পনার একটা অংশ ছিল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। তিলাইয়া, মাইথন আর পাঞ্চেত বাঁধের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৪৭.২ মেগাওয়াট মাত্র। সেচ আর বন্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর রাখতে গিয়ে এই ক্ষমতা বেশি বাড়ানো যায় নি। তবে এই ক্ষমতাও যে পুরোমাত্রায় কাজে লাগছে তা নয়। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ডিভিসি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে, ২৩.৯ কোটি ইউনিট, যা সারা বছরে মাত্র দশ সপ্তাহ পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনের সমতুল্য। তবে কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন অনেকটাই করে ডিভিসি। সব মিলিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা ৬৫৪০ মেগাওয়াট; গড় উৎপাদন হয় বছরে ন'মাসের মতো।[৪] এখন ডিভিসির বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন আর দামোদর উপত্যকার শিল্পাঞ্চলে জল সরবরাহ করা। সেচের জল কম পড়ে, কিন্তু এই কাজগুলো জলের অভাবে থমকে যাচ্ছে বলে শোনা যায় না।

ডিভিসি প্রকল্পের শুরুতেই এর বিরোধিতা করেছিলেন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার কপিল ভট্টাচার্য। তিনি বলেছিলেন, কয়েক বছর অন্তর দামোদরের বন্যার ধাক্কায় হুগলি নদীর পলি ধুয়ে যায় আর তার নাব্যতা রক্ষা পায়। ডিভিসির পর থেকে দামোদরের বন্যার তীব্রতা কমেছে ঠিকই, কিন্তু হুগলির নাব্যতাও কমে চলেছে। ফরাক্কা ব্যারাজের সামান্য জল দিয়ে কাজ উদ্ধার হচ্ছে না। তা ছাড়া বন্যার সঙ্গে যে পলি এসে বিস্তীর্ণ অববাহিকাকে উর্বরতা দিত, তা এখন বাঁধের পাদমূলে জমে জলাধার ভরিয়ে তুলছে। এই অবস্থায় বাঁধের গেট খোলা বন্ধ করাই মুশকিল হয়, যদি না প্রচুর খরচ করে ড্রেজিং করা হয়। ওদিকে নিম্ন অববাহিকায় বর্ষার পর সেচের জল সরবরাহ করতে গিয়ে দামোদরে জল প্রায় থাকেই না। শুকনো নদীর বুকে দাপিয়ে বেড়ায় বালি তোলার ট্রাক।

ডিভিসি যখন হয়েছিল, তখন উচ্ছেদ বা পরিবেশের ক্ষতি নিয়ে উচ্চবাচ্য করত না কেউ। বিপুল বনাঞ্চল ধ্বংস করে তৈরি হয়েছিল এক একটা বাঁধ ও জলাধার। ৩০৫টা গ্রাম থেকে প্রায় লাখখানেক আদিবাসীকে উচ্ছেদ হতে হয়েছিল। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যা হয়েছিল, তাতে উচ্ছেদের ষাট বছর পরেও তাদের ক্ষোভ মেটে নি। সরল জীবনধারা তারা একেবারেই হারিয়েছে উন্নয়নের ঠেলায়। ২০০৭ সাল থেকে পুনর্বাসনের বিষয়ে ডিভিসি একটু মানবিক নীতি নিয়েছে, তবে তা পুরনো উচ্ছেদের বেলায় খাটবে না।

পরিবেশের সর্বনাশ করে, এত মানুষকে নির্মূল করে দেশবাসীকে সুখের স্বর্গে পৌঁছনো গেল কি? সেচের প্রসারে চাষ বেড়েছে, বিদ্যুৎ হয়েছে, কিছু শিল্প হয়েছে, বন্যার থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে কিছু মানুষ। সুবিধা যারা পেয়েছে, আগের অবস্থাটা তাদের কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু চাষ বাড়াতে গিয়ে ভূগর্ভের জলভাণ্ডার কমে চলেছে ভয়ানক ভাবে। এখন সেচ অনেকটা না কমালেই নয়, অথচ কমালেও বিপদ। বিদ্যুৎ ও শিল্পসামগ্রী আগে যতটা হলে চলে যেত, এখন তার চেয়ে অনেক বেশিমাত্রায় না পেলে চলবেই না। তার উৎপাদনে জল ব্যবহারও বাড়ছে।

এই মরণফাঁদের থেকে বেরোতে গেলে সেচের উপর অতিনির্ভরতা ছেড়ে বিকল্প সুস্থায়ী চাষের উপায় খুঁজতে হবে। ভূগর্ভের জল হল হাজার বছর ধরে প্রকৃতির ফিল্টারে একটু একটু করে শুদ্ধ হওয়া পানযোগ্য জল। সেই জলকে সেচের জন্য ব্যবহার করে ফুরিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। শিল্প উৎপাদনেও রাশ টানতেই হবে। সেটা একদিনে হবে না। লাগাতার বেড়ে চলা প্রয়োজনকে ক্রমশ কমিয়ে আনতে পারলে তবে সামলে ওঠার একটা সুযোগ হবে।

**ফরাক্কা ব্যারাজ**

ডানদিকে ঝাড়খণ্ড আর বাঁদিকে বিহারকে রেখে গঙ্গা নদী পশ্চিমবঙ্গে এসে বেশ কিছুদূর ঝাড়খণ্ডের সীমানা দিয়েই বয়ে গেছে। শেষে রাজমহল পাহাড়কে ডানদিকে রেখে রাজ্যের ভিতরে ১১২ কিলোমিটার পথ চলে

গঙ্গা দু'ভাগ হয়েছে। মূল ধারা পদ্মা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ধরে ৬০ কিলোমিটার গিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। অন্য ধারা ভাগীরথী মায়াপুরে জলঙ্গী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে হুগলি নাম নিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

মুর্শিদাবাদের মিঠিপুরের কাছে ভাগীরথীর উৎসমুখ কোনকালেই খুব একটা নাব্য ছিল না। ইংরেজ আমলের যাবতীয় তথ্য বলছে গঙ্গার সঙ্গে ভাগীরথীর যোগ থাকত কেবল বর্ষাকালে (চিত্র ৩)। কলকাতার 'গঙ্গা' হুগলি নদী মূলত ময়ূরাক্ষী, দামোদর, রূপনারায়ণ ইত্যাদি উপনদীর জলে পুষ্ট।

চিত্র ৩। মিঠিপুরের কাছে গঙ্গা থেকে ভাগীরথীর মজে যাওয়া উৎসমুখ

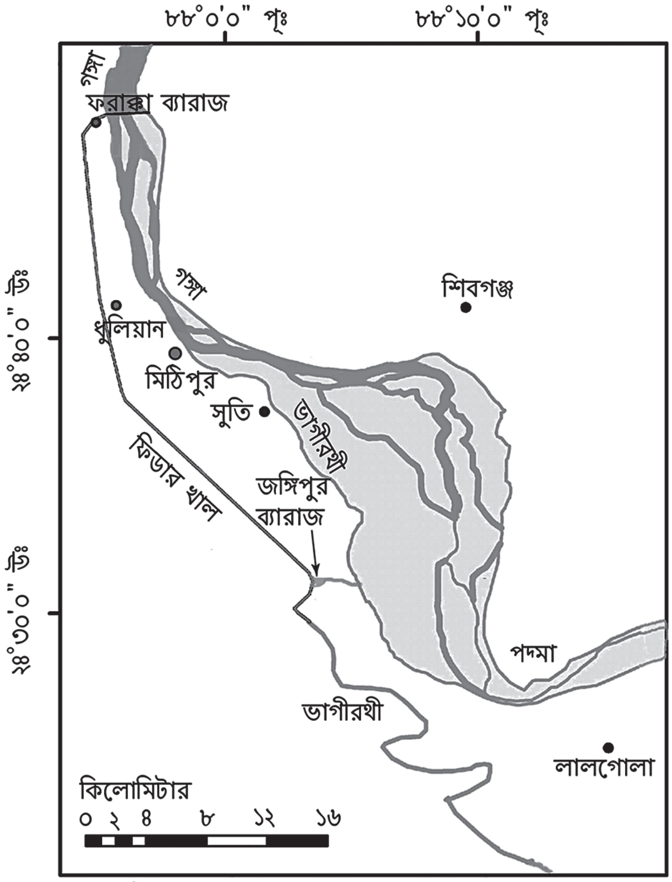


চিত্র ৪। ফরাক্কা ব্যারাজ ও ফিডার খালের নকশা

গঙ্গার ব-দ্বীপে জমির ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে। বদ্বীপের প্রথম শাখানদী ভাগীরথী-হুগলি অবশ্য দক্ষিণমুখী। তবে তার ঢাল এতটাই কম যে নদী বার বার এঁকেবেঁকে যায়। স্রোত অতি ধীর। জোয়ারের ঠেলায় দ্রুত ঢুকে আসা পলি ভাটার ধীর স্রোতে সমুদ্রে ফিরতে পারে না, নদীর খাতে আটকে যায়। এহেন নদীর বন্দর কলকাতায় জাহাজ ঢোকা বেশ কষ্টকর। সময়ের সঙ্গে সে সমস্যা আরও বেড়েছে। আধুনিক মালবাহী জাহাজ কলকাতা কেন, ভাটিতে হলদিয়া বন্দর পর্যন্ত পৌঁছতেই নাজেহাল হয়।

মিঠিপুরের উজান থেকে গঙ্গার জলপ্রবাহ ভাগীরথী-হুগলির দিকে ঘুরিয়ে তার নাব্যতা ফেরানোর প্রস্তাব সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকেই বিবেচনা হয়ে আসছিল। স্বাধীনতার পর সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, মিঠিপুরের ৪০ কিলোমিটার উজানে ব্যারাজ তৈরি হবে (চিত্র ৪)। ব্যারাজের উপর দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে রেল আর সড়ক যোগাযোগও হবে। সেই কাজ ১৯৬২ সালে শুরু হয়ে ১৯৭১ সালে শেষ হয়। তবে ৩৮ কিলোমিটার লম্বা ফিডার ক্যানাল দিয়ে ভাগীরথীতে সংযোগ আনতে আরও চার বছর লেগে যায়। ১৯৭৫ সালে ভারত-বাংলাদেশ ফরাক্কা চুক্তি করে ৪০,০০০ কিউসেক (সেকেন্ডে ৪০,০০০ ঘনফুট, বা ১১৩২ কিউমেক) প্রবাহ ভাগীরথীতে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। পরে তিনবার অদলবদল করে সেই চুক্তিতে ব্যবস্থা করা হয়, যাতে শুখা মরশুমে গঙ্গায় জল কম থাকলে সেই ঘাটতি দুই দেশের মধ্যে দশ দিনের পর্যায়ক্রমে ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়।

জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ জল হুগলি নদীর মোহনায় ঢোকে, তা ফিডার খাল থেকে আসা জলের ১৬০ গুণ বেশি। কলকাতা বন্দরের কাছেও এই বৈষম্য বিপুল। জোয়ারে বয়ে আসা পলিকে বাড়তি ঠেলা দিয়ে সমুদ্রে নিয়ে ফেলার সাধ্য নেই ফিডার খালের ওই জলের। সুতরাং ফরাক্কা ব্যারাজের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। হুগলির নাব্যতা ফেরে নি। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের হিসাবে, প্রাক-ফরাক্কা যুগে বছরে ৬৪ লক্ষ ঘনমিটার পলি ড্রেজিং করে তোলা হত, আর এখন বছরে ২৫০ লক্ষ ঘনমিটার পলি তুলতে হয়।[৫] তা সত্ত্বেও কলকাতায় বড় জাহাজ ঢোকার রাস্তা খোলা যায় নি। এমনকী হলদিয়াতে জাহাজ ঢোকার পথও ড্রেজিং করে কোনমতে খোলা রাখতে হচ্ছে। অবশ্য ফরাক্কা ব্যারাজ হবার ফলে পলতায় গঙ্গার যে জল শোধন হয়ে কলকাতা শহরে যায়, তাতে লবণের ভাগ কিছুটা কমেছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ ভাল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই কাজটা একটা ব্রিজ বানিয়েও হতে পারত, অনেক কম খরচায়।

ব্যারাজ করে যে কলকাতা বন্দরকে বাঁচানো যাবে না, সেকথা আগেই বলেছিলেন সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার কপিল ভট্টাচার্য। তাঁর মত ছিল, দামোদরের বন্যার জল হুগলি নদীর পলি কিছুটা দূর করে, আর সেই কাজ ফিডার খালের নিয়মিত প্রবাহ দিয়ে হতে পারে না। কিন্তু সরকার দেশবিদেশের অন্য বিশেষজ্ঞদের কথা শুনেছিল।

ফরাক্কা প্রকল্প নিয়ে পূর্ব বাংলার সরকার (বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে ও পরে) বহু আপত্তি জানিয়েছিল। ব্যারাজ হয়ে বাংলাদেশের ক্ষতি

হয়েছে প্রচুর। শুখা মরশুমে অর্ধেকের বেশি প্রবাহ একটা নদী থেকে সরিয়ে নেওয়ার অর্থ শুধু তার নাব্যতা কমে যাওয়া নয়, ভাটিতে পরিবেশের এক বড় পরিবর্তন। শুকিয়ে যাওয়া পদ্মার অববাহিকায় বর্ষার আগে ভূগর্ভের জলস্তর নেমে যায়। পদ্মা-যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) সঙ্গমের উজানে পদ্মার দক্ষিণ দিকে থেকে গড়াই (মধুমতী) নামে একটা শাখানদী বেরোয়, যা ফরাক্কা-পরবর্তী কালে শুকিয়ে শুধু বর্ষাকালের নদী হয়ে গেছে।[৬] মোহনার কাছে তার শাখানদীগুলো জোয়ার-ভাটা সর্বস্ব। সমুদ্রের নোনাজলের প্রভাবে চাষের জমি ক্রমশ নোনা হয়ে যাওয়া একটা চলতি সমস্যা। ফরাক্কা ব্যারাজের জন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গবাসীকেও। মালদা আর মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাঙনের সমস্যা অনেক বেড়ে গেছে।

গঙ্গার মতো বিশাল নদীর পলি বহন আর ভাঙনের বিষয়গুলো বিশেষজ্ঞরা ঠিক বোঝেন নি।  আর বোঝেন নি নদীর গতিপথ বদলের চরিত্র। গঙ্গার ব-দ্বীপ এখনও গঠন হয়ে চলেছে। হিমালয় থেকে নদী-উপনদীগুলো প্রচুর পলি বয়ে আনে। ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকেও। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জোয়ারের জল আর বর্ষার বন্যা সেই পলিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়। ঢালের বদল হয়। একবার নয়, বার বার। মাঝে মাঝে নদীর গতিপথও বদলে যায় কোন-কোন বন্যায়। এই রকম ছোট ছোট পথ পরিবর্তনকে কয়েকশো বছরের নিরিখে দেখলে মনে হবে নদী যেন একটা নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে ডাইনে-বামে যাওয়া আসা করছে পেন্ডুলামের মত। এই পরিসরকে বলা হয় মিয়ান্ডার বেল্ট।

গঙ্গা আর পদ্মার ভাঙন এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ারই অংশ। বর্ষায় নদীর ফুলে ওঠা জল একদিকের পাড়ে আঘাত করতে করতে তাকে দুর্বল করে। একই সঙ্গে পাড়ের কয়েক মিটার গভীরে বালির স্তর স্রোতের ধাক্কায় সরে নদীতে চলে যায় অনেকটা। পাড়ের নিচে নদীর জল ঢুকে আবার বিচিত্র পথে মাটির তলা দিয়েই নদীতে ফিরে যায়। ফেরার পথটাও জলের সঙ্গে রীতিমতো তরল হয়ে সেই যাত্রায় যোগ দেয়। তখন তার উপরে যা-কিছু আছে— গাছপালা কোঠা দালান— সবসুদ্ধ নদীর গর্ভে যায়। সে বছর উল্টো পাড়ে ভাঙন সাধারণত হয় না, বরং অন্য পাড়ে বা নদীর মধ্যে অগভীর দ্বীপে পলি জমতে থাকে। নতুন চর গজায়। মিয়ান্ডার বেল্টের মধ্যে নদী এইভাবেই এদিক ওদিক সরে বেড়ায় ভাঙতে ভাঙতে আর গড়তে গড়তে।

গঙ্গার মিয়ান্ডার বেল্টে রাস্তাঘাট, রেল লাইন থেকে শুরু করে ফরাক্কা ব্যারাজ—সবই তৈরি হয়েছে এইসব প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোকে উপেক্ষা করে। এমন সক্রিয় একটা নদী তার গতিপথে একটা ব্যারাজকে কতদিন সহ্য করবে বলা মুশকিল। জলের সঙ্গে মিশে থাকা পলি ব্যারাজে প্রতিহত হয়। অনুমান, বছরে তিরিশ কোটি টনেরও বেশি পলি জমা পড়ে ব্যারাজের উজানে। এর ফলে ব্যারাজের উত্তর দিকের অনেকগুলো গেট অকেজো হয়ে গেছে। এত পলি ড্রেজিং করে দূর করা যায় না। ফলে উজানে জলতল বাড়তে থাকে। তার চাপে আরও ভাঙন হয়। 'ব্যারাজের কারণে গঙ্গার মিয়ান্ডার বেল্ট' চওড়া হয়ে থাকতে পারে। বছর কুড়ি আগে সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, গঙ্গা বাঁদিকে সরতে সরতে প্রাক্তন শাখানদী পাগলার মজে যাওয়া খাতের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়ে বিকল্প পথে পদ্মায় পৌঁছে যাবে ফরাক্কা ব্যারাজ এড়িয়ে। ২০০৮ সাল থেকে আবার গঙ্গা ডানদিকে সরছে। সেযাত্রা এড়ানো গেলেও কয়েক দশকের মধ্যে এমন বিপদ আবার উপস্থিত হতে পারে। জঙ্গিপুরের ভাটিতেও পদ্মা আর ভাগীরথী জুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মালদার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের দিকে নতুন চর গজিয়েছে। তেমনি মুর্শিদাবাদের ভাঙনের সঙ্গে চর গজিয়েছে বাংলাদেশের দিকে। প্রথা অনুযায়ী ভাঙনের উদ্বাস্তুরা নতুন চরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, কিন্তু এক দেশে ভাঙন আর অন্য দেশে চর গজালে বিবাদ বিসম্বাদের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়।

সরকারি উদ্যোগে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা হয়েছে পাড়ের উপর বোল্ডার ফেলে আর নদীর আড়াআড়ি স্পার তৈরি করে। কিন্তু এই সব কন্ট্রাক্টরি কাজকর্মে কাজের কাজ কিছু হয় নি, শুধু সরকারি টাকা জলে গেছে আক্ষরিক অর্থে। সেচ দপ্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল নদীকে তার নিজের খেয়ালে চলতে দিয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য টাকাটা ব্যবহার হলে কাজের কাজ হত। পুনর্বাসনের প্রশ্নটা সোজা নয়। নতুন চরে যোগাযোগ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর অভাব, নতুন কিছু গড়তে গেলে তার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত, জমির মালিকানা নিয়ে আইনি জটিলতা, ইত্যাদি। অন্য রাজ্য বা দেশ জড়িত থাকলে জটিলতা আরও বেশি। তবু নদীর সঙ্গে যুদ্ধ ছেড়ে সরকার মানুষের দিকে তাকালে হয়তো কিছু সুবিধা হতে পারে।

ফরাক্কা ব্যারাজ বানানো হয়েছিল পূর্ব বাংলার প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে। ১৯৭৫ সাল থেকে মালদা আর মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছে, আর কলকাতায় যা ঘটানো যায় নি এত চেষ্টা করেও, তার পূর্বাভাস সেই সময় থাকলে পশ্চিম বাংলারও আপত্তি কিছু কম হত না।

## তিস্তা ব্যারাজ

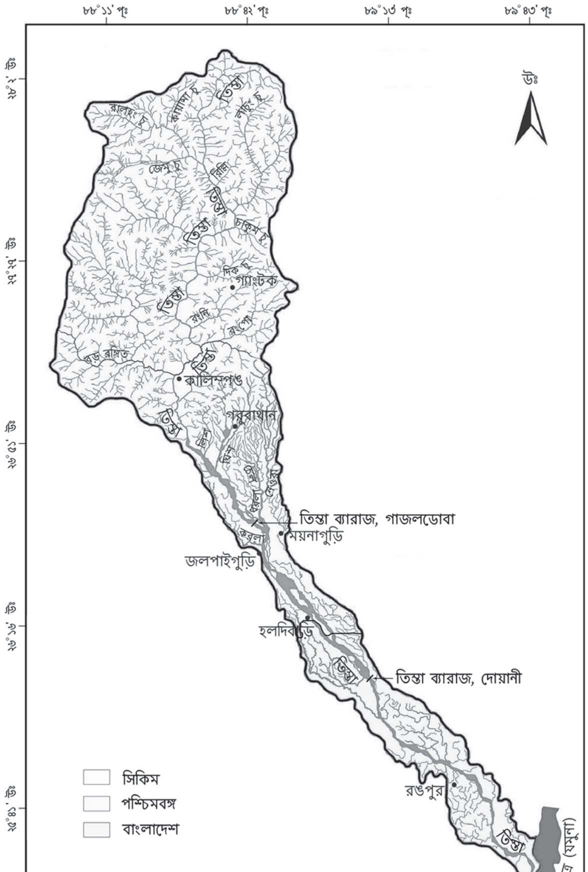


চিত্র ৫। তিস্তা অববাহিকা

গোটা সিকিম রাজ্যের থেকে জল বয়ে এনে তিস্তা নদী সিকিম-পশ্চিমবঙ্গ সীমানা বরাবর এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে তিস্তা বাজারের কাছে। সেখান থেকে কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে ১০৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বুড়িগ্রামের কাছে বাংলাদেশে ঢুকেছে। তারপর ১২১ কিলোমিটার এগিয়ে তিস্তা চিলমারির কাছে ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা নদীতে মিশেছে (চিত্র ৫)। এই নদী অববাহিকার বিস্তৃতি প্রায় ১২, ৩৭০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে বাংলাদেশে আছে ১৬.৫ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২৬.৬ শতাংশ আর সিকিমে ৫৬.৯ শতাংশ। ২০১১ সালের হিসাবে অববাহিকার জনসংখ্যা ৪৬,৪৮,২৩৭; এর মধ্যে বাংলাদেশে বাস করে ৪৬.৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৪০.০ শতাংশ আর সিকিমে ১৩.১ শতাংশ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ২০01 সালের জনগণনার হিসেবে বাংলাদেশের অংশে ১০৬৯ জন, পশ্চিমবঙ্গের অংশে ৫৬৪ জন আর সিকিমে ৮৭ জন মাত্র।[৭] এই তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, ফানেল আকৃতির তিস্তা অববাহিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ভাটির ছোট এক অংশে হলেও জনসংখ্যার নিরিখে সেই অংশ খুব কম নয়।

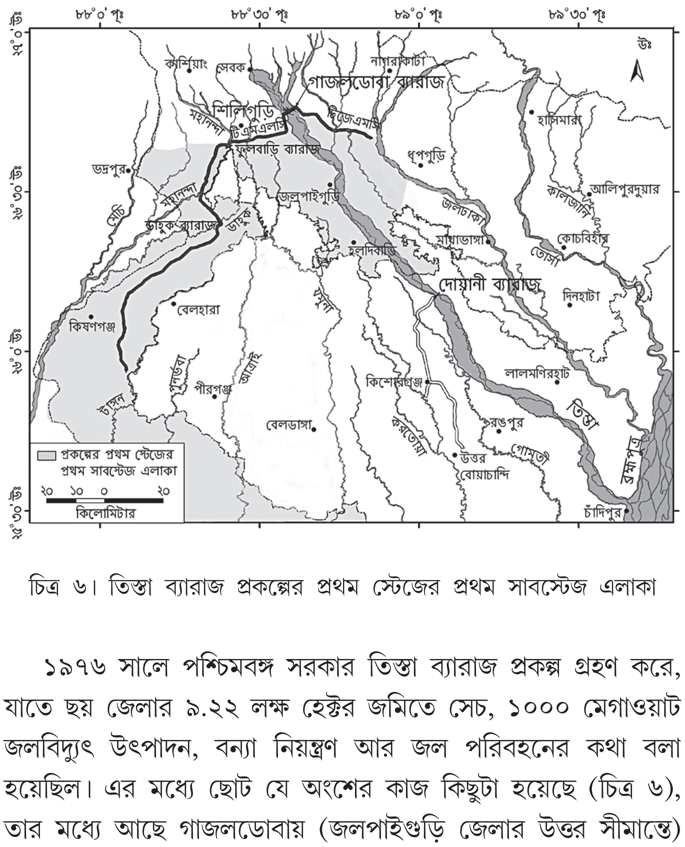


চিত্র ৬। তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের প্রথম স্টেজের প্রথম সাবস্টেজ এলাকা

১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প গ্রহণ করে, যাতে ছয় জেলার ৯.২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ, ১০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ আর জল পরিবহনের কথা বলা হয়েছিল। এর মধ্যে ছোট যে অংশের কাজ কিছুটা হয়েছে (চিত্র ৬), তার মধ্যে আছে গাজলডোবায় (জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর সীমান্তে) তিস্তা ব্যারাজ, নদীর গতিপথের বাঁদিকে জলঢাকা নদী পর্যন্ত একটা খাল, ডানদিকে মহানন্দা নদী পর্যন্ত একটা খাল, মহানন্দা থেকে ডাউক, নাগর ও টাঙ্গন নদীকে যুক্ত করার আরও তিনটে খাল, আর প্রতিটা সংযোগস্থলে ব্যারাজ।[৮] ডানদিকের খালে জল পাঠানো শুরু হয় ১৯৯৭ সালে, বাঁদিকের খালে ২০১২ সালে। ছবিতে যে অংশ দেখানো নেই, তার কাজ শুরু হয় নি, সম্ভবত হবেও না।

সেচ প্রকল্প অসম্পূর্ণ থাকার একটা বড় কারণ পরিকল্পনায় গলদ। প্রকল্পের এলাকার মাটিতে ৯.২২ লক্ষ হেক্টর জমি জুড়ে যে চাষই হোক, তার সেচের পুরো চাহিদা মেটানোর মত জল তিস্তায় থাকে শুধু বর্ষাকালে। তবে অত জল বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ওই খালগুলোর নেই। দুই দিকের খালের বহনক্ষমতা যোগ দিয়ে বড় জোর ৫২০ কিউমেক জল যেতে পারে। বাস্তবে পলি পড়ার জন্য টেনেটুনে আড়াইশো কিউমেক জল যায়। যাত্রাপথের অপচয় ধরলে সেই জল দিয়ে লাখখানেক হেক্টর জমির চাষ হতে পারে। অবশ্য উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে কোন চাহিদাই পুরো মেটানো হবে না, জল যেটুকু আছে সবটা বিপুল এলাকা জুড়ে হাল্কা করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তেমন হলে কাগজে কলমে সেচসেবিত জমির পরিমাণ যথেচ্ছ বাড়িয়ে ধরা যায়। সেই কাজটা পরিকল্পনা মাফিক করা যায় নি - সেচখালের জমি অধিগ্রহণ পুরোটা করা যায় নি বলে। উচ্ছেদ ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিবাদ, প্রকল্পের যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ, ইত্যাদি নানা কারণে জমি পেতে অসুবিধা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০১৩-১৪ সালের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী, ততদিনে সেচের সুযোগ তৈরি হয়েছে ১.৯৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে আর সেচ পৌঁছেছে মাত্র ৫৯ হাজার হেক্টর জমিতে।[৯] অনুমান করা যায়, এইটুকু জমিরও (মূল পরিকল্পনার ছয় শতাংশ) সেচের পুরো চাহিদা মেটে নি। কারণ ওই অডিট রিপোর্ট বলছে, শুখা মরশুমে তিস্তায় আড়াইশো কিউমেক জল থাকেই না, থাকে তার চারভাগের একভাগ।

সেচের জল যেটুকু গেছে, তাতে চাষ হয়েছে কেমন? অডিট রিপোর্ট বলছে, খালের জল পৌঁছেছে এমন অনেক জমিতে ছোট ছোট চা-বাগান হয়েছে বা আনারস চাষ হচ্ছে, যাতে ওই জল কাজে লাগে না। আবার রাজগঞ্জ আর জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ১৩ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকায় বোরো চাষ হয়ে চলেছে ব্যারাজ চালু হবার পর থেকে।[১০] তার আগে ওই অঞ্চলের মাটিতে অত্যধিক জলনির্ভর এই চাষ হতই না। বলা বাহুল্য, ওখানে বোরো চাষের পুরো চাহিদা খালের জলে মেটে না, তাই ভূগর্ভের জল ব্যবহার হচ্ছে বেশি করে।

তিস্তা নদী থেকে দূরে খালের জলে তিন জায়গায় কৃত্রিম জলপ্রপাতের মাধ্যমে মোট ৬৭.৫ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে টারবাইন ঘোরানোর মতো জলের চাপ থাকে না সাধারণত। ২০২০-২১ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৭.১৭ কোটি ইউনিট, যা সারা বছরে মাত্র দেড়মাস জেনারেটর চালু থাকলে হতে পারে।[১১] ডিভিসির মতোই এখানেও চূড়ান্ত অপচয় হয়ে চলেছে। স্বস্তির কথা এই, মূল প্রস্তাবে যে ১০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন করার কথা ছিল তার বাকি অংশ বাতিল করা হয়েছে।

পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে তিস্তা ব্যারাজ কর্তৃপক্ষ তিস্তার টেনে আনা জল মহানন্দা ব্যারাজ থেকে শিলিগুড়ি শহরে সরবরাহ করার অনুমতি দিয়েছে শহর কর্তৃপক্ষকে। মহানন্দা নদী শুকিয়ে যাওয়াতে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে অডিট রিপোর্ট বলছে, শিলিগুড়ির সরবরাহ সারাক্ষণ চালু রাখতে গিয়ে খালের রক্ষণাবেক্ষণের ফুরসত পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকী ব্যারাজের জলস্তরও বাড়তি এক মিটার উঠিয়ে অযথা ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে তাদের তিস্তা ব্যারাজ বানিয়েছে লালমণিরহাট জেলার দোয়ানীতে। উদ্দেশ্য ৭.৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা। প্রথম পর্যায়ে ১.১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি জমিতে সেচ করার মতো জল তিস্তায় এমনিতেই

থাকে না শুখা মরশুমে। যেটুকু থাকে, তার বারো আনা গাজলডোবায় উধাও হয়ে যায় ব্যারাজ চালু হবার পর থেকে। সেই নিয়ে দুই দেশে বিবাদ চলছে বহু বছর ধরে।

ফরাক্কা ব্যারাজ চালু হয়েছিল বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে, আন্তর্জাতিক নদীর জন্য যেমনটা হওয়ার কথা। তিস্তার ক্ষেত্রে সেটা হয় নি। বরং ভুলে ভরা পরিকল্পনা আর অজস্র অপচয় সত্ত্বেও এটাকে ২০০৯-১০ সালে জাতীয় প্রকল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেছে চুক্তি করে জল ভাগাভাগি করতে গেলে তাদের চাষিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

শুখা মরশুমে নদী থেকে জল সরালে নদী ও তার অববাহিকার বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হয়, একথা আজ সবাই জানে। আরও বেশি ক্ষতি হয় এক নদী থেকে আর এক নদীর অববাহিকায় জল টেনে নিয়ে গেলে। গাজলডোবার তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প হল এক নদী অববাহিকা থেকে দূরের পাঁচটা জেলার পাঁচটা নদী অববাহিকায় জল টেনে নিয়ে যাওয়ার হঠকারি প্রকল্প। দোয়ানীর ব্যারাজেরও উদ্দেশ্য একই রকম। বাংলাদেশ ও ভারত মিলিয়ে তিস্তা অববাহিকার চুরাশি শতাংশ মানুষ বাস করেন গাজলডোবা ব্যারাজের ভাটিতে, মোটামুটি ৯,৭০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায়। তিস্তা নদী শুকিয়ে যাওয়া মানে তাঁদের পরিবেশ ধ্বংস হওয়া। এই অপূরণীয় ক্ষতির বিনিময়ে কার কতটুকু লাভ হচ্ছে বলা শক্ত। সেচ পৌঁছেছে যে জমিতে, তার এক ভগ্নাংশ মাত্র— মোটামুটি ৪০০ বর্গ কিলোমিটার (৪০ হাজার হেক্টর) - নদী অববাহিকার মধ্যে। বাকিটা অন্য নদীর অববাহিকায়। অববাহিকার ওই সেচসেবিত অংশের এক তৃতীয়াংশে সেচের টানে টানে অসুস্থায়ী বোরো চাষ শুরু হয়েছে, আবার অন্যত্র সেচ কাজে না লাগিয়ে অন্য কিছু হচ্ছে। তবে সেচের সুবিধা কমবেশি যে যেখানে ভোগ করছেন, প্রকল্পের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থ জড়িয়ে গেছে। সে সুবিধা তাঁরা ছাড়তে চাইবেন না স্বভাবতই। কোচবিহারে কোনও সেচই পৌছয় নি, পৌঁছেছে শুধু পরিবেশ বিপর্যয় আর জমি অধিগ্রহণ। বাংলাদেশেও সেচ হয়েছে নামমাত্র, আর চোখের সামনে প্রতি বর্ষার পর জ্যান্ত নদী রাতারাতি শুকিয়ে যেতে দেখে পুঞ্জীভূত হয়েছে ক্ষোভ।

যে-কোন বড় প্রকল্পে প্রচুর অর্থব্যয় হয়। উপলক্ষ্য জনকল্যাণ হলেও সেই খরচের টানেই অনেক প্রকল্প হয়ে থাকে। এমনই দুটো অবাস্তব প্রকল্পের ফল হল তিস্তার শুখা মরশুমের জল নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বিবাদ। সেই সময় বৃষ্টি না হয় পশ্চিমবঙ্গে, না বাংলাদেশে। যেটুকু জল নদীতে থাকে, তা মূলত সিকিম থেকে বয়ে আসা বরফ-গলা জল। সেই জল অববাহিকার বাস্তুতন্ত্রকে সাম্যে রাখার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যথেচ্ছ সেচ করার পক্ষে নয়। দুই দেশের সরকারই প্রকল্প শুরু করে ফেলেছে। তার চায় প্রকল্পের কল্যাণরূপ তুলে ধরতে। আশা জাগাতে। যে আশা পূরণ হবার নয়।

যে দৃষ্টি থেকে মনে হয় দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত করা মানে একটা নদীর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা আর সেই সুবাদে পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনা, সে দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাওয়া দরকার। শুখা মরশুমে সেচ অনেকখানি কমিয়ে, প্রায় পুরো জলটাই তিস্তা দিয়ে বইতে দিলে এই বিপর্যয় রোধ হতে পারে। তবে সেই জলকে শুধু গাজলডোবা ব্যারাজ নয়, দোয়ানী ব্যারাজও পেরোতে দিতে হবে যতদূর সম্ভব। নদীর যাত্রাপথ বরাবর পরিবেশ অনুকূল প্রবাহ বজায় থাকলে বাস্তুতন্ত্র রক্ষা পাবে, বাংলাদেশে ভূগর্ভের জলস্তর নেমে যাবে না, সেই সঙ্গে রক্ষা পাবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের জলস্তর।

নদীর পরিবেশ রক্ষা করা মানে জলজ প্রাণীদের স্বার্থকে মানবসমাজের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখা নয়। তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বাতাসে নানান গ্যাসের পরিমাণ, ঋতুচক্র, জলচক্র, বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদির এক নিতান্ত ছোট পরিসর মানবজীবনের অনুকূল। এটা কোন সরকারি প্রকল্প দিয়ে তৈরি হয় নি। বরং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিচিত্র সব প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় এই পরিসর রচিত হয়েছে— যার অনেকটাই আমরা জানি না। ক্ষুদ্র পলি কণা, অতি ক্ষুদ্র জীবাণুও এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। মানুষের ক্রিয়াকলাপে এই প্রক্রিয়াগুলো বিঘ্নিত হতে হতে পরিস্থিতি একসময় হুড়মুড় করে বদলাতে পারে। তখন সরকারি বাজেট, বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত জ্ঞান, সবই ফেল করে যায়। সেই অবস্থা হবার আগে বড় মাপের ছেলেমানুষিগুলো নিয়ে সংযত হতে পারলে মঙ্গল।

১. এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত অধিকাংশ তথ্য দেবাশিস সেনগুপ্ত, পরমেশ গোস্বামী ও কল্যাণ রুদ্রের লেখা 'জল' (অ্যাভেনেল প্রেস, ২০১৩) বই থেকে নেওয়া। তাই আলাদা করে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে শুধু সেইসব তথ্যের জন্য যা ওই বইয়ে নেই।

২. ডিভিসি অ্যানুয়াল রিপোর্ট (https://www.dvc.gov.in/storage/app/press_release/1709874751080324.pdf) ২০২২-২৩, পৃ. ১২।

৩. স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধের জন্য করা বিশ্লেষণ।

৪. ডিভিসি অ্যানুয়াল রিপোর্ট (https://www.dvc.gov.in/storage/app/press_release/1709874751080324.pdf) ২০২২-২৩, পৃ. ১০।

৫. বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩ (https://www.business-standard.com/article/economy-policy/kopt-to-buy-land-to-deposit-silt-104111101060_1.html)।

৬. বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২১ এপ্রিল ২০২৪ (https://www.tbsnews.net/bangladesh/environment/water-scarcity-grips-kushtia-gorai-river-dries-832751)।

৭. জনসংখ্যার হিসেব এই প্রবন্ধের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২০১১ জনগণনার তথ্য থেকে।

৮. তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের ওয়েবসাইট https://www.wbiwd.gov.in/index.php/applications/teesta)।

৯. সিএজি রিপোর্ট অন ইকনমিক সেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৫, পৃ. ৩৯-৪৮ (https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2016West_Bengal_Economic_Sector_Report_4_of_2015.pdf)।

১০. ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাবস্ট্রাক্ট, জলপাইগুড়ি।

১১. ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলাটরি কমিশনের কাছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির অ্যানুয়াল পারফর্মেন্স রিভিউ ২০২১-২২ উপলক্ষে জমা দেওয়া রিপোর্ট, পৃ. ১৩ (https://www.wbsedcl.in/irj/go/km/docs/internet/new_website/pdf/APR/Volumn-I_%20Data%20Format.pdf)।

প্র কা শ দা স বি শ্বা স

# জলের জন্য সমর্পিত চার যোদ্ধা

*এ কথাটা হামেশাই শোনা যায় যে, যদি কখনো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে তবে তা হবে শুধুমাত্র জলের জন্য। ইতিমধ্যেই তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। জল নিয়ে দেশে দেশে বিরোধ, এমন কি একই দেশের রাজ্যে রাজ্যে বিরোধের কথাও সুবিদিত। মিষ্টি জলের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, অন্যদিকে তার সুলভতা ক্রমহ্রাসমান। জলকে সুলভ ভেবে কেউ দেদার অপচয় করছে, অন্যদিকে কারো জুটছে না তৃষ্ণার জলটুকুও। এ অসাম্যের কারণ লুকিয়ে আছে জল ব্যবহারের দর্শনের মধ্যে। চিরাচরিত অভ্যাস ছেড়ে নতুন কোন প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হলে তা যে সর্বদা শুভদায়ক হবে এমনটা নাও হতে পারে। জল সংকট কমাতে দেশের কোনায় কোনায় কাজ করে চলেছেন কিছু স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ। জলাভূমি রক্ষা, জল সংরক্ষণ, জলের অপচয় রোধ তাদের জীবনের মূল মন্ত্র। এদের আমরা জল যোদ্ধা বলতে পারি। এমনই চারজন জল যোদ্ধার জীবন ও সংগ্রামের কাহিনী আমাদের আজকের আলোচ্য।*

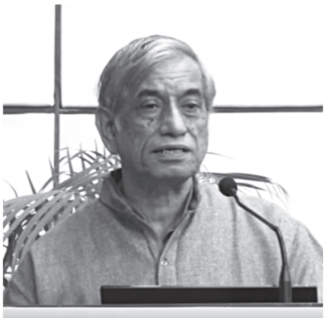

*অনুপম মিশ্র*

## অনুপম মিশ্র

ভারতবর্ষে যাঁরা জল সংরক্ষণ, জল বিষয়ক পরম্পরাগত জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন নিয়ে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অনুপম মিশ্রের নাম সর্বাগ্রণ্য। তিনি শুধু যে নিজে কাজ করেছেন তাই নয় তাঁর কাজ বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে অন্যদের। পরবর্তীকালে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জল সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করেছেন সবাইকেই বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি।

অনুপম মিশ্রের জন্ম ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন, মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায়। তাঁর পিতা ভবানীপ্রসাদ মিশ্র ছিলেন গান্ধী অনুরাগী এবং হিন্দি ভাষার বিশিষ্ট কবি। 'বানি হ্যায় রশি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৭২ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ভবানীপ্রসাদ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র দ্বিমাসিক গান্ধী মার্গ-ও সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছুদিন।

গান্ধীময় পরিবারের সন্তান অনুপম ছোটবেলা থেকেই গান্ধী অনুরাগী। গ্রাম স্বরাজ বা স্বয়ম্ভর গ্রামের স্বপ্ন দেখে এসেছেন বালক বয়স থেকেই। সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনুপমও যোগ দেন গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানে। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজির পাশাপাশি জানতেন উত্তর ভারতের বেশ কিছু স্থানীয় ভাষাও। হিন্দি সিনেমার ভক্ত অনুপম ছিলেন খুব ভালো ফটোগ্রাফারও। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে করতেই প্রতিষ্ঠানের তরফে তিনি একটি বড় দায়িত্ব পান। সেসময় চম্বল ছিল একটি উপদ্রুত এলাকা। সেখানকার ডাকাতদের ভয়ে কাঁপত গোটা মধ্য ভারত। নৃশংসতায় তারা ছিল অতীব ভয়ংকর। সরকারি ধরপাকড় তাদের দমাতে পারেনি। নিত্যনতুন দলের আবির্ভাব এবং কর্মকাণ্ডে ব্যতিব্যস্ত প্রশাসন তাদের সঙ্গে প্রশাসনের মধ্যস্থতার দায়িত্ব দেয় গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানকে। প্রতিষ্ঠানের তরফে সেই দায়িত্ব সফলভাবে সামলান অনুপম ও তাঁর সঙ্গীরা। তাঁদের মধ্যস্থতায় চম্বলের কুখ্যাত ডাকাতেরা অস্ত্র সংবরণ ক"রে প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করে। চম্বলের এই সফল উদ্যোগের পর তাঁকে আমরা দেখি বর্তমান উত্তরাখণ্ডের একটি পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক হিসাবে। ১৯৭৩ এ তদানীন্তন উত্তরপ্রদেশের চামোলী জেলায় সূচনা হয় চিপকো আন্দোলনের। খেলাধূলার সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী একটি সংস্থা সরকারি পারমিট নিয়ে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু করলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাতে বাধা দেন এবং তার ফলশ্রুতিতেই শুরু হয় চিপকো মুভমেন্ট। একটি গ্রামের সেই আন্দোলনের কথা অনুপমের লেখার সূত্রেই প্রচারে আসে। সহ-লেখক সত্যেন্দ্র ত্রিপাঠির সঙ্গে অনুপম যৌথভাবে লেখেন 'চিপকো মুভমেন্ট, উত্তরাখণ্ড ওমেন্স বিড টু সেভ ফরেস্ট ওয়েল'। এই বইয়ের সূত্রেই ভারত তথা বিশ্ববাসী জানতে পারে সেই গৌরবময় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত।

এরপরই আমরা অনুপমকে দেখি রাজস্থানের কর্মক্ষেত্রে। গত শতাব্দীর আটের দশকের সূচনায় রাজস্থানে গোচারণক্ষেত্র রক্ষার একটি আন্দোলনের সূচনা হয়। পুরোনো দিনে এই গোচারণ ক্ষেত্রগুলি ধর্মীয় বিধান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু মানুষের ক্রমবর্ধমান লোভের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ ক"রে এই গোচারণ ক্ষেত্রগুলি যখন বিনষ্ট হতে থাকে তখন গ্রামীণ সমাজেও নেমে আসে বিপর্যয়। অপসৃয়মান গোচারণ ক্ষেত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে গ্রামীণ মানুষের দুর্দশা। অনুপম যুক্ত হয়ে পড়েন গোচারণভূমি রক্ষার আন্দোলনে। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর খরা দেখা দেয় রাজস্থানে। অনুপম অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে খরার কষ্ট তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে সরকারি জল সরবরাহের উপর নির্ভরশীল শহর, গঞ্জগুলিতে খরার কষ্ট অবর্ণনীয়। অনুপম তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝলেন সরকারি জল ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোন গন্ডগোল আছে। সেই রহস্যভেদের লক্ষ্যে শুরু হল তাঁর গবেষণা। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে কাজ করার সুবাদে অল্পদিনেই তিনি বুঝে নিলেন আধুনিক জল সরবরাহের ব্যবস্থাপনায় কোন প্রযুক্তিগত সমস্যা নেই, সমস্যাটা লুকিয়ে আছে জল ব্যবহারের দর্শনের মধ্যে। আধুনিক জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জল ব্যবহারের পরম্পরাগত কৌশলের মূলেই কুঠারাঘাত করেছে। জল সংরক্ষণ ও জল ব্যবহারের চিরাচরিত আচরণ ভুলে যাওয়াই রয়েছে সমস্যার মূলে। অন্যদিকে প্রত্যন্ত এলাকা, যেখানে সরকারি জল সরবরাহ ব্যবস্থার সুযোগ নেই, তারা আঁকড়ে থেকেছে জল সংরক্ষণ ও জল ব্যবহারের পরম্পরাগত কৌশল, তাই সেখানে খরার কষ্ট অনেকটাই কম।

রাজস্থানের এই অভিজ্ঞতা চোখ খুলে দিল অনুপমের। তিনি বুঝলেন জল সংরক্ষণের এই পরম্পরাগত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেলে সমূহ বিপদ। এখনই তার পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন না হলে তা চিরতরে হারিয়ে যাবে। শুরু হল তাঁর নতুন অন্বেষণ। ঘুরলেন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে। আর তাঁর দেখা গ্রামে গ্রামে অনুসৃত জল সংরক্ষণের নানা দেশজ উপায়ের বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকল নানা পত্র পত্রিকা, জার্নালে। ১৯৯২-এ তাঁর কাজ আরো এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে দেওয়া হলো কে কে বিড়লা ফেলোশিপ। বছর আটেকের

নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও গবেষণার পর ১৯৯৩-এ এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রকাশিত হল তাঁর দীর্ঘ অন্বেষণের ফসল 'আজ ভি খরে হ্যায় তালাব' —ইংরেজি অনুবাদে বলতে গেলে বলতে হয় পন্ডস আর স্টিল রেলিভেন্ট। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া সেই বই ছিল কপিরাইট মুক্ত। যে কেউ সে বই ছাপতে পারত কোন অনুমতি ছাড়াই। নানা ভাষার বিভিন্ন প্রকাশনীর অন্তত ৪০ টি সংস্করণ বের হয় বইটির। ১৯ টি ভাষায় অনূদিত হয় বইটি। মহাত্মা গান্ধীর মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথের পর পর এটি দ্বিতীয় ভারতীয় বই যা বেরিয়েছিল ব্রেইল হরফেও।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বইটি ১৩ টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে। বইটির বিষয়বস্তু সম্প্রচারিত হয় আকাশবাণীর ১১ টি কেন্দ্র থেকে। অল ইন্ডিয়া রেডিও তৈরি করে একটি সিডি। বইটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্ণাটক সরকার ৫০০০ পুকুর পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ গঠন করে। কয়েক বছরের মধ্যে বইটির লাখ দুয়েক কপি বিক্রি হয়। শুধু কপি বিক্রি হওয়ায় নয় বইটি হয়ে ওঠে জল সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গাইড বুক। তাঁর পরবর্তী বই 'রাজস্থান কি রজত বুন্দে' (দা রেডিয়েন্ট রেনড্রপস অফ রাজস্থান) বের হয় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। এ বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় পশ্চিম রাজস্থান এলাকার জল সংরক্ষণ। প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটাকে কি পরম মমতায় সেখানকার লোকেরা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে, তার অনুপঙ্খ বিবরণ রয়েছে এই বইটিতে। এই বইটিও বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।তাঁর লেখা অন্য বই গুলো হলো 'সাফ মাথে কা সমাজ', 'কুণ্ড, রীতে ঘট ভরনে কী রীত, 'গোচর কা প্রসাদ বাঁটতা লাপোডিয়া', 'না যা স্বামী পরদেশা' ইত্যাদি।

শুধু জল সংরক্ষণ নয়; নদী, তার ইতিহাস, নদীর দুপারের মানুষজন কিভাবে সহবাস করে নদীর সঙ্গে তাও ছিল অনুপম মিশ্রের চর্চার বিষয়। এ বিষয়েও তাঁর গভীর ভাবনাচিন্তা, মননশীলতার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়, তাঁর দেওয়া অজস্র সাক্ষাৎকারে। জীবনের বেশিরভাগ সময় দিল্লিতে কাটানো অনুপম দিল্লির দূষণক্লিষ্ট যমুনা নিয়ে কি ভাবতেন তার পরিচয় আছে রানা দাশগুপ্তের বই ক্যাপিটাল, দ্য ইরাপশান অফ দিল্লী-তে। ২০০৮ সালে বিহারের ভয়াবহ বন্যার চার বছর আগে ২০০৪ সালে বন্যার সম্ভবনা নিয়ে তাঁর লেখা 'ত্যারনে ওয়ালা সমাজ ডুব রহা হ্যায়'ও সর্বার্থেই ব্যতিক্রমী।

শুধু কি লিখেছেন দেশবাসীকে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝাতে, পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে গেছেন অনুপম। যদি নাও লিখতেন, শুধু বক্তা হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব কম হত না। রিও ডি জেনেইরোর বসুন্ধরা সম্মেলন বা প্যারিস সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। অপ্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণে তাঁর আসক্তি ছিল না। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম নাইরোবি থেকে তাঁকে ভারতের স্বনিযুক্ত এনজিও গুলির উপর বিস্তারিত সমীক্ষা করার ভার দেওয়া হয়েছিল। জল সংরক্ষণ ও পরিবেশ নিয়ে কাজের স্বীকৃতিতে তিনি বেশ কিছু সম্মানে সম্মানিত হন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের ইন্দিরা গান্ধী পর্যাবরণ পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৭-০৮ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকার দেয় অমর শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। ২০১১ সালে পান যমুনালাল বাজাজ অ্যাওয়ার্ড।

পোশাক আশাকে অত্যন্ত সাদাসিধা অনুপম মিশ্র ব্যক্তিগত জীবনে মেনে চলতেন গান্ধীর দর্শন। বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য নয়, প্রয়োজন অনুসারে তা আহরণ চলতে পারে। কর্মচঞ্চল এই মানুষটির স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না। ভুগতেন নানা অসুখ-বিসুখে। ছেলেবেলায় ভুগেছিলেন যক্ষার আক্রমণে। হৃদযন্ত্রের পাশাপাশি ছিল স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যাও। জীবনের শেষ পর্যায়ে আক্রান্ত হন ক্যান্সারে। সেই রোগেই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

## রাজেন্দ্র সিংহ

*রাজেন্দ্র সিংহ*

ভারতবর্ষের জল সংরক্ষণ নিয়ে যাঁরা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছেন তাঁদের অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব হলেন রাজেন্দ্র সিং, যিনি ওয়াটারম্যান অফ ইন্ডিয়া নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশের মিরাট সন্নিহিত বাগপত জেলার দৌলা গ্রামে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট তাঁর জন্ম হয়। পিতা-মাতার সাত সন্তানের মধ্যে তিনিই সবার বড়। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জমি জায়গা চাষবাস করেই তাঁদের সংসার চলত। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করা কালীন তাঁর জীবন পাল্টে দেয় ১৯৭৪ সালের এক ঘটনা। সে বছর গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের এক স্বেচ্ছাসেবক রমেশ শর্মা তাঁদের বাড়ি আসেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা। তাঁর নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিষ্কার করে, গ্রামে স্থাপন করে গ্রন্থাগার। স্থানীয় ছোটখাটো বিবাদ বিঃসংবাদ মীমাংসার জন্য চালু হয় সালিশি ব্যবস্থা। মদ্যপান বিরোধী প্রচারে তাঁর গড়া স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে ছিলেন যুবক রাজেন্দ্রও।

স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক প্রতাপ সিংহ ছিলেন রাজনীতি সচেতন প্রগতিশীল ব্যক্তি। ক্লাসের পর রাজনীতির জগতে অনাচার দুর্নীতি নিয়ে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁর শিক্ষা রাজেন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। স্কুলের পড়া শেষ করে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনার জন্য রাজেন্দ্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ভারহুট কলেজে ভর্তি হন।

সে সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের ভ্রষ্টাচার বিরোধী আন্দোলন সারা ভারতবর্ষের যুবমনে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। রাজেন্দ্রও যোগ দেন সেই আন্দোলনে। জয়প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত ছাত্র যুব সংঘর্ষ বাহিনীর স্থানীয় নেতা হিসেবে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় অকংগ্রেসী সরকার। জয়প্রকাশ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা কমে যায়। রাজেন্দ্রও সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। আয়ুর্বেদের স্নাতক ডিগ্রি (BAMS) নিয়ে তিনি তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করেন।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্ষেত্রের ন্যাশনাল সার্ভিস ভলান্টিয়ার হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। রাজস্থানের দৌসা জেলার বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গুলি দেখভালের দায়িত্ব বর্তায় তাঁর উপর। সেখানে থাকাকালীনই তিনি জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পদাধিকারীদের প্রতিষ্ঠান তরুণ ভারত সঙ্ঘ -এ যোগ দেন।

কালক্রমে তিনি প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তবে প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না খোদ সম্পাদকই। সংগঠনের অভ্যন্তরে এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বোর্ডের সবাই একযোগে পদত্যাগ করে প্রতিষ্ঠানটি তাঁর হাতে তুলে দেন। রাজেন্দ্র এবার পূর্ণোদ্যমে লাগলেন মানুষের কাজে। ভবঘুরে একদল কামারদের নিয়ে কাজ করলেন প্রথমে। তবে তাতে তিনি সন্তুষ্ট হননি। পূর্ণ সময়ের সমাজকর্মী হবার লক্ষ্যে ১৯৮৪ তে ছাড়লেন চাকরি। নতুন কিছু করার লক্ষ্যে একদিন ঘরদোরের যাবতীয় জিনিসপত্র ২৩০০০ টাকায় বেঁচে সংঘের চার সদস্যকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশ্যে। ১৯৮৫-এর ২ অক্টোবর তাঁরা পৌছলেন আলওয়ার জেলার থানাগাজির কিশোরী গ্রামে। বাসের অন্তিম গন্তব্য ছিল সেটাই। পাশের গ্রাম ভিকমপুর আশ্রয় দিল পাঁচ বন্ধুকে। পার্শবর্তী গোয়ালপাড়া গ্রামে শুরু হল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। আর তার সাথেই চেষ্টা চলল এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের।

আলওয়ার একসময় ছিল তার শস্য বাজারের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু যখন রাজেন্দ্ররা সেখানে পৌঁছলেন তখন সে রিক্ত, সর্বস্বান্ত। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে হয় না চাষাবাদ। যাদের সামর্থ্য আছে তারা চলে গেছে অন্য কোথাও। যাদের সে সামর্থ্য নেই তারা কোনো রকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছে। একদা সমৃদ্ধ গঞ্জ এলাকার এমন পরিণতি কেন তা খোঁজ করতে গিয়েই চমকপ্রদ তথ্য পেলেন রাজেন্দ্ররা। প্রবীণ লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে তারা জানতে পারলেন এলাকার লোকেরা ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরম্পরাগত জলের উৎস গুলির প্রতি অমনোযোগী হবার সময় থেকেই এলাকার দুর্দশা শুরু।

স্থানীয় প্রবীণ গ্রামবাসী মঙ্গুলাল মিনা রাজেন্দ্রদের বোঝালেন গ্রামীণ রাজস্থানে শিক্ষার চেয়ে জলের ব্যবস্থাপনা হতে পারে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সহজ উপায়। রাজেন্দ্ররা ভেবে দেখলেন মঙ্গুলাল ভুল বলেননি। এলাকায় কোনো জলাশয় নেই, সকলেই নির্ভর করে ভূগর্ভস্থ জলের ওপর। সেখানেও গভীর অনিশ্চয়তা; এবছর যে উৎসে জল মেলে পরের বছরই হয়তো সে উৎস জলহীন। ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্নবীকরণে কারো কোনো উৎসাহ নেই, ফলে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

প্রশাসনিক কর্তাদের ভাষায় আলওয়ার জল সম্পদে ডার্ক জোন। রাজেন্দ্রর নজরে পড়ল গোয়ালপাড়া গ্রামের একটি পরিত্যক্ত জোহাদ (মাটির চেক ড্যাম)-এর উপর, যা অপব্যবহারে মৃতপ্রায়। স্থানীয় কিছু উৎসাহী যুবককে নিয়ে রাজেন্দ্র নেমে পড়লেন জোহাদ সংস্কারের কাজে। পলি তুলে তাকে নবকলেবর দেওয়া হল। ফল পাওয়া গেল পরের বর্ষাতে। গ্রামের শুকনো কূয়োয় ভরে উঠল জল। উৎসাহী গ্রামবাসীরা তিন বছর ধরে পরিচর্যা করে ১৫ ফিট গভীর করে খুঁড়লেন জোহাদটি। ফলও মিলল হাতেনাতে। সংশ্লিষ্ট এলাকাটি প্রশাসনের খাতায় ডার্ক জোন থেকে ফিরে এলো হোয়াইট জোনে। বন বিভাগ তরুণ ভারত সঙ্ঘকে আহ্বান জানালেন তাদের বিখ্যাত পার্কটির ব্যবস্থাপনার জন্য।

উৎসাহিত রাজেন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা এক বিশাল পদযাত্রার মাধ্যমে আশেপাশের গ্রামগুলিকে উদ্বুদ্ধ করলেন জোহাদ সংস্কারের মতো পরম্পরাগত জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গুলির পুনরুজ্জীবনে। গোয়ালপাড়া থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরের গ্রাম ভানোটা কোলওয়ালা তরুণ ভারত সংঘের স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় নিজেদের শ্রমদানে স্থানীয় মৃত নদী আরভরির উৎসে তৈরি করলেন একটি মস্ত জোহাদ। ছোট ছোট অনেক জোহাদের পাশাপাশি আরাবল্লী পাহাড়ে তৈরি হলো ২৪৪ মিটার লম্বা ৭ মিটার উচ্চতার কংক্রিটের জোহাদ। এরকম ছোট বড় জোহাদ তৈরীর মাধ্যমে চলল মৃত নদীর প্রাণ ফেরানোর কাজ। বছর ষাটেক মৃত থাকার পর ১৯৯০-এ প্রাণ ফিরল নদীর। নদীতে দেখা দিল জল। তবে কাঙ্খিত ফলাফল মিলল না। নদীর জল কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

তরুণ ভারত সংঘের সদস্যেরা আবিষ্কার করলেন জল হারিয়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে আরাবল্লী সংলগ্ন পরিত্যক্ত খনিগুলি, যা খনন কার্যের শেষে ভরাট না করেই চলে গেছে ভারপ্রাপ্ত লোকেরা। জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হলো এর বিরুদ্ধে। কোর্টের চাপে ১৯৯২-এর মে মাসে সরকার সারিস্কা সংলগ্ন ৪৭০ টি খনির কাজ বন্ধ করে দিল। বছরখানেকের মধ্যে সারিস্কা অভয়ারণ্যের মধ্যে ১১৫ টি মাটি ও কংক্রিটের এবং আশেপাশের এলাকায় ৬০০টি জোহাদ নির্মাণ সম্পূর্ণ করল তরুণ ভারত সংঘের স্বেচ্ছাসেবী ও গ্রামবাসীরা। ১৯৯৫ এর মধ্যেই আরভরি পরিণত হল এক প্রানোচ্ছল নদীতে। রাজস্থানের প্রত্যন্ত এলাকার এই খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। ২০০০ এর মার্চে পুনরুজ্জীবিত নদীকে দেওয়া হল আন্তর্জাতিক নদী পুরস্কার। রাষ্ট্রপতি আর কে নারায়ন এলাকা পরিদর্শনে এসে গ্রামবাসীদের দিলেন ডাউন টু আর্থ - যোসেফ সি জন অ্যাওয়ার্ড।

শুধু আরভরিই নয়, তরুণ ভারত সংঘের সহায়তায় গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রমে রুপারেল, সারসা, বাগানি এবং জাহাঝাউলির মত আরো কয়েকটি মৃত নদীও ফিরে পেল প্রাণ। এলাকার নদী প্রাণ ফিরে পেতে গ্রাম ছাড়া মানুষেরা আবার গ্রামে ফিরল। নতুন উদ্যমে শুরু হল চাষবাস। জয়পুর, দাউসা, সোয়াই, মাধোপুর, ভরতপুর, কারাউলি জেলাগুলিতেও শুরু হল তরুণ ভারত সংঘের কর্মকাণ্ড। খরা প্রবণ জেলার তকমা থেকে বেরিয়ে এল এই জেলাগুলো। এখন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু এলাকা নিয়ে প্রায় ৬৫০০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে রাজেন্দ্র সিংহের তরুণ ভারত সংঘের কর্মকাণ্ড। শুধু রাজস্থানের ১১টা জেলাতে ৮৫০ টি গ্রামে ৪৫০০-এর মতো জোহাদ গড়েছে তরুণ ভারত সংঘ, যা তাকে এনে দিয়েছে রামন ম্যাগসেসাই অ্যাওয়ার্ড। শুধু জল সংরক্ষণ নয়, তরুণ ভারত সংঘ কাজ করেছে পুনর্বনায়ন (reforestation), এমনকি অভয়ারণ্য নিয়েও। ভৈরোদেব লোক বন্যজীব অভয়ারণ্য তরুণ ভারত সংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আরভরি নদীর ধারে ভানোটা কোলওয়ালা গ্রামের পাশে ১২ বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা এই অভয়ারণ্য আজ প্রকৃতিপ্রেমিকদের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থল। রাজস্থানের গ্রামে গ্রামে তরুণ ভারত সংঘের গড়ে তোলা পানি পঞ্চায়েত আজ তাদের বাঁচাচ্ছে জল সংকটের হাত থেকে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কমিউনিটি কন্ট্রোলের স্লোগানই তাঁদের এই সাফল্যের মূলমন্ত্র। রাজেন্দ্রর নেতৃত্বে তরুণ ভারত সংঘের এই কর্মযজ্ঞ ২০০৫ সালে তাঁকে এনে দেয় যমুনালাল বাজাজ পুরস্কার। ২০০৮ সালে দি গার্ডিয়ান পত্রিকা তাঁকে বিশ্ব বাঁচানোর কাজে নিয়োজিত প্রথম ৫০ ব্যক্তির তালিকায় স্থান দেয়।

ভাগীরথীর উপর বিতর্কিত লোহারীনাগ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও সোচ্চার বিরোধিতা করেছিলেন রাজেন্দ্র। পানি পার্লামেন্টের পরিকল্পনা করে মুম্বাইয়ের বিপন্ন মিঠি নদীকে বিপদমুক্ত করার কাজেও হাত লাগিয়েছিলেন তিনি। গোদাবরী নদীকে দূষণমুক্ত করতেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন রাজেন্দ্র। তাঁর জীবন ও সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্র চৌহান জলপুরুষ কি কাহিনী নামে একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছেন। ষাটোর্ধ রাজেন্দ্র আজও জল সংরক্ষণের কাজে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন।

## ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

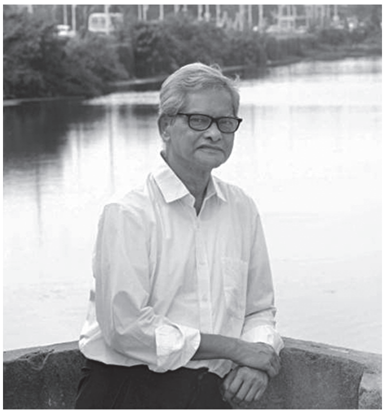

*ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ*

পেশায় মানুষটি ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরে। তা অমন চাকরি তো অনেকেই করেন! চাকরি করেন বলেই পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? পরিবেশ দপ্তরে চাকরি করেন অথচ পরিবেশ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নন এমন লোকের কি কোন অভাব আছে। অথচ এর বিপরীত মানুষও আছে। যারা কর্মজীবনের পেশাগত দায়িত্বকে প্যাশান হিসেবে নিয়ে বদলে দিতে চান স্থবিরতার অচলায়তন। এমনই একজন স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ হলেন জলযোদ্ধা ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ - পূর্ব কলকাতার জলাভূমির সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য ভাবে।

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল পূর্ব কলকাতার জলাভূমির প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল ও আর্থিক উপকারিতা। সেই সূত্রে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে তিনি হাতের তালুর মত চিনতেন। সেখানকার মানুষদের পরম্পরাগত লোকজ্ঞান দেখে তিনি শুধু যে আশ্চর্য হয়েছিলেন তাই নয় সেই লোকজ্ঞানকে বিশ্বের জ্ঞানী গুণী মহলে তুলে ধরে তিনি সারা বিশ্বকেও আশ্চর্যান্বিত করেছেন।

সারা বিশ্বেই গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত আচরণীয় বর্জ্য জল ও কারখানার বর্জ্য জল নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। এই জল যাতে মিষ্টি জলের উৎসে মিশে তাকে দূষিত করতে না পারে তা নিয়ে কত না পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা। আর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা আর ব্যবস্থাপনার মানেই হলো করদাতাদের অর্থের দেদার খরচ। বড়লোক দেশ সে ঝুঁকি এবং ব্যয় সামলাতে পারে কিন্তু গরিব দেশ? এখানেই পথ দেখালেন ডক্টর ঘোষ। কলকাতা শহর পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার আচরণীয় বর্জ্য জল যায় পূর্ব দিকে। নাগরিক প্রয়োজনে ব্রিটিশদের তৈরি করা খাল যেমন বাগবাজার খাল, সার্কুলার ক্যানেল, শিয়ালদা রেল ব্রিজের তলার খাল প্রভৃতিরও অন্তিম গন্তব্য সেই পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। একদা এদিক দিয়েই বয়ে যেত বিদ্যাধরী, আদি গঙ্গা। কালের প্রহারে সেসব নদী হয় মৃত, নয় মৃতপ্রায়। শুধু রয়ে গেছে সেই সব প্রবাহের বহু পরিত্যক্ত খাত। এসব নিয়েই পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। ডক্টর ঘোষ দেখালেন সেখানেই পরম্পরাগত লোকজ্ঞানের ব্যবহার করে কিভাবে চলছে প্রাকৃতিক উপায়ে বর্জ্য জলের পরিশোধন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম কুড়ি বছরের জন্য এই জলাভূমি এলাকা ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে লিজ নিয়ে এখানে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু করেন জমিদার ভবনাথ সেন। স্থানীয় মানুষদের লোকজ্ঞানকে কাজে লাগাবার সে এক চমৎকার প্রয়োগশালায়।

আবর্জনা থেকে সম্পদ তৈরির সেই প্রয়োগশালা কেমন? উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে মুদিয়ালি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রের কথা। গৃহস্থালির এবং কারখানার বর্জ্য জল নোংরা, কালো, দুর্গন্ধযুক্ত। তাতে মিশে থাকে নানা ভারী ধাতু, তেল জাতীয় পদার্থ। এই বর্জ্য জলের বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বা বিওডি খুব বেশি জল খুব বেশি আম্লিক, পি এইচ ৩.০ থেকে ৪.০। দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা জল প্রথমে রাখা হয় একটা পুকুরে। এখানে জলে চুন মিশিয়ে ৭-১০ দিন ধরে রাখা হয়।

পুকুরের কচুরিপানা ভারী ধাতু জাতীয় বিষ শোষণ করে, নল ঘাস শুষে নেয় তেল জাতীয় পদার্থকে। এই পুকুরে থাকে শোল, ল্যাটার মতো নানা ধরনের 'কাট' মাছ। এরপর প্রথম পুকুর থেকে জল পাঠানো হয় দ্বিতীয় পুকুরে। জল যাওয়ার নালাতেও থাকে কচুরিপানা নলঘাস। দ্বিতীয় পুকুরে নিবিড় মৎস্য চাষের ব্যবস্থা থাকে। রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, তেলাপিয়া, লাইলনটিকার মত বহু প্রজাতির মাছ এখানে চাষ হয়। নিবিড় মৎস্য চাষ হলেও মাছেদের কোন খাবার দিতে হয় না। দূষিত জল থেকেই তারা খাদ্য আহরণ করে। দ্বিতীয় পুকুর থেকে জল যায় তৃতীয় পুকুরে সেখানেও একই পদ্ধতিতে জল শোধন এবং মৎস্য চাষ হয়। ডক্টর ঘোষ পরীক্ষা করে দেখান তৃতীয় পুকুরের জল সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত যা পরিশুদ্ধ করে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। কৃত্রিম উপায়ে যে জল শোধন করতে হলে লাখ লাখ টাকা ব্যয় হত সেই জল প্রকৃতি কিভাবে নিজেই শোধন করে নেয় তার ইতিবৃত্ত সারা বিশ্বের পণ্ডিতদের নজরে আনেন ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ।

সল্টলেক উপনগরী তৈরি হবার পরও গত শতাব্দীর আশির দশকেও পূর্ব কলকাতার জলাভূমির আয়তন ছিল ১২৫০০ হেক্টর। ছোট বড় পুকুর ভেড়ি ছিল ২৬৪ টি। ২০১৪ সালে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২০২টিতে। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বিস্তৃত সমীক্ষা করে তা রাষ্ট্রপুঞ্জের নজরে আনেন ধ্রুবজ্যোতিবাবু। ১৯৯০ সালে ভারতবর্ষের প্রথম রামসার সাইটের মর্যাদা লাভ করে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। জলাভূমি রক্ষার একক প্রহরী হিসাবে অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে ডক্টর ঘোষ রাষ্ট্রপুঞ্জের গ্লোবাল ৫০০ পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীকালে আইসিএন থেকে লাভ করেন লুক হফম্যান পুরস্কার।

ডঃ ঘোষ যখন পূর্ব কলকাতার জলভূমির গুরুত্ব পন্ডিত মহলে প্রতিষ্ঠিত করছেন তার আগেই সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নজর পড়েছে এই জলাভূমির উপর। এই জলাভূমি বুঝিয়েই গড়ে উঠেছে লবণ হ্রদ, রাজারহাট, সেক্টর ফাইভ, কেষ্টপুর, বানতলা চর্মনগরী-র মত উপনগরী। সরকারি এইসব উদ্যোগ ছাড়াও স্থানীয় মাটি মাফিয়াদের লুব্ধ দৃষ্টি এই জলাভূমির উপর। জলাভূমি ভরাট করে কংক্রিটের নির্মাণ খুবই লাভদায়ক!

ডক্টর ঘোষ সতর্ক করেছেন মাদ্রাজের উদাহরণ টেনে। একদা মাদ্রাজের উপকণ্ঠে ছিল প্রায় কুড়ি হাজার হেক্টর জলাভূমি। নগরায়নের চাপে তা আজ ইতিহাসের পাতায়। ২০১৬ সালে এক প্রবল সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যায় এলাকাটা শ্মশানের রূপ নিয়েছিল। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি ও সংলগ্ন এলাকা শুধু যে কলকাতাকে টাটকা সবজি ও প্রাণীজ প্রোটিনের যোগান দেয় তা নয়, একই সঙ্গে তা এক প্রাকৃতিক সুরক্ষা বলয়, যা সামুদ্রিক ঝড়ের প্রকোপ থেকে শহর কলকাতাকে রক্ষা করে। শহরের নিকাশি ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই জলাভূমি। এই জলাভূমি বিলুপ্ত হলে কলকাতা শহরে জমা জল নিকাশের উপায় থাকবে না। জল জমে থাকবে দীর্ঘকাল, ছড়াবে নানা চর্মরোগ, জলবাহিত অসুখ-বিসুখ।

ডঃ ঘোষের একক লড়াই সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তা ঘুম ভাঙাতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসনের। জমি মাফিয়াদের কাছ থেকে হুমকি পেয়েছেন বারংবার। তবু লড়াইয়ের ময়দান ছাড়েননি তিনি। লিখেছেন 'ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার', 'গুমোট ভাঙার গান', 'ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট মার্জিং থিয়োরি এন্ড প্র্যাক্টিস', 'দি ট্রাশ ডিগারস'- এর মত অবিস্মরণীয় কিছু বই। জলাভূমি ও জল সংরক্ষণের এই অক্লান্ত যোদ্ধা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন।

**নিরুপমা অধিকারী**

সময়টা ২০০১ এর ফেব্রুয়ারি। সদ্য ফসল উঠেছে। কাজের প্রয়োজনে এক সাংবাদিক এসেছেন পুরুলিয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রাম ডাকাকেন্দু-তে। সাংবাদিক গ্রামে গিয়ে দেখলেন গ্রাম জনহীন। অথর্ব আর কায়িক শ্রমে অক্ষম বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ছাড়া আর সবাই গ্রাম ছেড়ে গেছেন কাজের সন্ধানে। পুরুলিয়ার লোকজন ঐতিহ্যগতভাবে বছরে দুবার চাষের কাজে বর্ধমান যান। একবার আমন ধান কাটার মরশুমে আর একবার বোরো ধান কাটার মরশুমে। আমন ধান কাটার পর পৌষ সংক্রান্তির আগেই তারা ঘরে ফেরেন, কেননা পুরুলিয়ার সবচেয়ে বড় লোক উৎসব টুসুর সময় পারতপক্ষে কেউই বাড়ির বাইরে থাকেন না। আপামর পুরুলিয়াবাসী মেতে উঠেন টুসু উৎসবে। সেবার টুসুর সময়েও কেউ ফেরেননি। ঘরে খাবার নেই উৎসব হবে কি করে!

*নিরুপমা অধিকারী*

সাংবাদিক অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন পাশের গ্রাম বিজয়ডিতে অন্য ছবি। সেখানকার মানুষ দূর্দশায় পড়লেও সে দূর্দশা ডাকাকেন্দুর মানুষদের মত নয়। পাশাপাশি দুটি গ্রামের তুলনা করতে গিয়ে সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, দুটি গ্রামের অর্থনৈতিক বৈষম্যের পিছনে রয়েছে বিজয়ডি গ্রামের এক বড় পুকুর। তিনি উপলব্ধি করেন চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও বিজয়ডি গ্রামের আপাত স্বাচ্ছন্দের পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে সেই পুকুরের। পরিচিত মহলে সেই অভিজ্ঞতার আলোচনা কালে তাঁরই এক পরিচিত লেখক বন্ধু তাঁর হাতে তুলে দেন অনুপম মিশ্রের বিখ্যাত বই আজ ভি খরে হ্যায় তালাব। হিন্দি তালাব শব্দের অর্থ পুকুর। শিরোনামটির অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায় আজও মজুত আছে পুকুর। বইটি পড়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় সেই সাংবাদিকের। যুগ যুগ ধরে পুকুর কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে মানব সভ্যতাকে তার বিবরণ পড়ে তিনি এতই অনুপ্রাণিত হন যে পুকুর রক্ষা তথা জলাভূমি সংস্কার ও জল সংরক্ষণই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

এই সাংবাদিক নিরুপমা অধিকারী, পুরুলিয়া জেলায় যিনি পরিচিত ছিলেন জলদিদি নামে। তাঁর জন্ম ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি, পিতার কর্মস্থল আদ্রায়। তাঁদের স্থায়ী নিবাস পুরুলিয়া জেলারই ডুলমি নডিহায়। পিতা তিনকড়ি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। পিতা-মাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে নিরুপমা দ্বিতীয়। পিতার বদলির চাকরির সুবাদে তাঁর মেয়েবেলা কেটেছে নানা জায়গায়। স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে তাঁর স্কুল, বন্ধু বান্ধব। কলেজের পাঠ পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজে। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের উপর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করে তিনি যুক্ত হন সাংবাদিকতায়। আর সেই সূত্রেই অর্জন করেন ডাকাকেন্দু ও বিজয়ডির অভিজ্ঞতটা।

পারিবারিক বন্ধু বিশিষ্ট হিন্দি কবি শ্যাম অবিনাশের সূত্রে অনুপম মিশ্রের লেখার সঙ্গে পরিচয় হবার সুবাদে তিনি অনুভব করেন যে এ বই আনতে হবে বাঙালি পাঠকের গোচরে, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে পুকুরের তথা জলাভূমির গুরুত্ব, জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। অনুপম মিশ্রের অনুমতি নিয়ে হাত দিলেন অনুবাদে। ২০০২ সালের মে মাসে 'আজও পুকুর আমাদের' শিরোনামে বের হল সেই অনুবাদ।

শুধু বই অনুবাদ করেই দায় শেষ করেননি তিনি। বুঝতে চাইলেন পুরুলিয়ার জল সমস্যার উৎস কোথায় আর তা থেকে পরিত্রাণেরই বা উপায় কি। শুরু হলো এক অন্য অন্বেষণ। রুখা সুখা পুরুলিয়ার জল সংকট রোধে জলের অপচয় রোধ আর জল সংরক্ষণ নিয়ে শুরু হলো এক অন্য আন্দোলন। নিরুপমার কথায় "বর্তমান জল সমস্যায় অন্যতম উৎকৃষ্ট উপাদান বোধ হয় পুকুর-ই। যদিও এখন পুকুর বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে এই দৃশ্য সুলভ পুকুর খোঁড়া হচ্ছে এই দৃশ্যের তুলনায় অথচ ভারতে হাজার হাজার বছর এই পুকুর-ই সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে বৃষ্টির জল ধরে রেখে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরও বজায় রেখেছিল পুকুরই। এই ব্যবস্থা ছিল সমাজ সিদ্ধ ও স্বয়ংসিদ্ধ"।

পুরুলিয়া বললেই যে কম বৃষ্টিপাতের গল্প শোনা যায় নিরুপমা সেই গল্পের গোড়া ধরেই টান দিলেন। নিরুপমা স্পষ্ট করে বললেন পুরুলিয়ার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৩২ থেকে ১৩৫ সেন্টিমিটার। ভারতবর্ষের অর্ধেক এলাকায় যা বৃষ্টিপাত হয় তার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃষ্টি হয় পুরুলিয়ায়। ইতিহাস থেকে তুলে আনলেন ১৩০৫, ১৩৫৩, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে পুরুলিয়ার ভয়াবহ বন্যার কথা। প্রশ্ন রাখলেন পর্যাপ্ত বৃষ্টি যদি না হয় তবে বন্যা হল কিভাবে? উত্তরটাও নিজেই দিলেন। পুরুলিয়ায় যে বৃষ্টিপাত হয় তা পর্যাপ্ত হলেও তার প্রায় সবটাই নদী বেয়ে চলে যায় নিম্নভূমিতে।পুরুলিয়ার ভূস্তর এমনই যে তা জল ধরে রাখতে পারে না। ফলে ভূগর্ভস্থ জলের টানাটানি চলতেই থাকে। অভিজ্ঞতা থেকেই একথা জানতেন পুরুলিয়ার মানুষেরা। তাই তারা ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভর না করে নির্ভর করতেন ভূপৃষ্ঠস্থ জলের উপর। সারা বছর জলের চাহিদা মেটাতে কাটানো হতো অজস্র পুকুর। সারা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা জোড়গুলো জল যুগিয়ে সামাল দিত খরার সময়কালীন জলের সমস্যা। সেকালের মানুষেরা দীঘি কাটানো পুণ্যের কাজ বিবেচনা করতেন। রাজা জমিদারেরা তো বটেই এমনকি সাধারণ মানুষেরাও নিজের সাধ্য মতন দীঘি কাটাতেন। ঔপনিবেশিক সময়কালে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল এই পরম্পরাগত অভ্যাস। পুরুলিয়ার মানুষেরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারে। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে মজে যেতে থাকলো পুকুর, জলাশয়, জোড় বাঁধগুলি। বৃক্ষবিহীন প্লাবনভূমি থেকে ক্ষয়ে আসা মাটি ভরাট করে তুলতে থাকল নদীতল। প্রয়োজনীয় দেখভালের অভাবে শুকিয়ে যেতে থাকলো গ্রামীণ পুরুলিয়ার প্রাণস্বরূপা জোড়গুলি।

পরম্পরাগত জ্ঞান হারিয়ে যেতে জাঁকিয়ে বসল জলকষ্ট। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘায়ত হতে থাকলো জলকষ্টের সময়কাল।

নিরুপমা লিখেছেন রাজস্থানের জয়সলমীরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬ থেকে ১৮ সেন্টিমিটার। সেই জলই পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করে যদি তারা তাদের সাম্বৎসরিক জলের চাহিদা মেটাতে পারে তবে বার্ষিক ১৩২ থেকে ১৩৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের পুরুলিয়া কেন জলকষ্টে ভুগবে? শুধু পুরুলিয়ার গ্রামই সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করা নয়, চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিরুপমা ছুটে গেছেন রাজস্থানে। তরুণ ভারত সংঘের অতিথি হয়ে ঘুরে দেখেছেন রাজস্থানের জল সংরক্ষণের পরম্পরাগত কৌশল। রাজস্থানের গ্রামে গ্রামে ঐতিহ্যবাহী জল সংরক্ষণাগার কুন্ড ও তার ব্যবহার দেখে দেখে তিনি এতই অনুপ্রাণিত হন যে পুরুলিয়ায় ফিরেই তিনি অনুবাদ করেন অনুপম মিশ্রের আর একটি বিখ্যাত বই 'কুণ্ড, রীতে ঘট ভরনে কী রীত'। 'কুণ্ড ঐতিহ্যময় জলের ঐতিহ্য' নামে সেই বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে। রাজস্থানে ভ্রমণকালেই কুণ্ড তৈরি ও তার ব্যবহার দেখে তিনি সংঘশক্তির ক্ষমতা নতুন করে উপলব্ধি করেন। বইটির ভূমিকায় তাই তিনি লেখেন 'আমরা কেটে ছেঁটে আজ 'আমি'-তে স্থির। সর্বত্র আজ এই আমির প্রাধান্য। জল সমস্যায় এই আমি আমাদের কোন সংকটময় পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই জল সমস্যার সমাধান আমি দিয়ে কখনোই হওয়া সম্ভব নয় 'আমি'কেই 'আমাদের' পথ দেখায় এই ঐতিহ্যময় জলের ঐতিহ্য'।

ইতিমধ্যেই পারিবারিক উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন প্রকাশনী সংস্থা আশাবরী। সেই প্রকাশনা থেকে বের হতে থাকে পরিবেশ বিষয়ক নানা বইপত্র। একদিকে নিজে যেমন অনুবাদ করেছেন অন্যদিকে তেমনি অন্যদের দিয়ে অনুবাদ করিয়েছেন, লিখিয়েছেন প্রয়োজনীয় বই। প্রকাশ করেছেন আশাবরী থেকে।

অন্যদিকে পুরুলিয়ার গ্রামে গঞ্জেও চলছিল জল সচেতনতা গড়ার কাজ। পুরুলিয়া শহরের প্রাণ স্বরুপা সাহেববাঁধ যখন প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিপন্ন; একদা নির্মল জলদাত্রী বাঁধের জল যখন পঙ্কিল, পূতিগন্ধময় তখন সাহেববাঁধের সংস্কার নিয়ে জনমত গড়ে তোলেন নিরুপমা ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। অজস্র সভা-সমিতি মিছিল পদযাত্রায় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় সাহেববাঁধ সংস্কারে। ফিরে আসে সাহেববাঁধের হারানো ঐতিহ্য। সিঁদুরপুর, জাহাজপুর, রামকৃষ্ণপুর-এর মত পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরুপমা গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন গ্রামের পুকুর গুলির সংস্কারে, সঙ্গে পেয়েছেন একদল সমমনস্ক লোককে। সব সময় গ্রামের লোকেদের বোঝানোর কাজটাও সহজ ছিল না। তবে নাছোড় মনোভাবে জয় করেছেন সমস্ত প্রতিকূলতাকে। গ্রামে গ্রামে ঘোরার পাশাপাশি "কট দেম ইয়ং" আপ্তবাক্য মেনে পৌঁছে গেছেন স্কুলে স্কুলে। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বুঝিয়েছেন জল সংরক্ষণের গুরুত্ব। জলের অপচয় রোধ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন তাদের। পি এইচ ই ইঞ্জিনিয়ারদের একাধিক সভায় তিনি তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন জল সংরক্ষণের পরম্পরাগত কৌশল, যাতে তারাও হয়ে উঠতে পারেন এক একজন জলযোদ্ধা।

রাজস্থানের সম্ভব সামাজিক সংগঠনের আহবানে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে আবার রাজস্থানে যান নিরূপমা। সেখানে দেখেন কি একাগ্রতার সঙ্গে প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটাকে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টির ফোঁটা তো নয় যেন রজত বিন্দু। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ভাষা পরিষদ তাঁকে দিয়ে অনুপম মিশ্রের 'রাজস্থান কি রজত বুন্দে' বইটির অনুবাদ করিয়েছিল। পরে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে আশাবরী থেকে বের হয় বইটি। পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে, সভা সমিতিতে তিনি তাঁর রাজস্থানে দেখে আসা অভিজ্ঞতার কথা শোনাতেন।

যৌথ উদ্যোগ কিভাবে একটা গ্রামকে বদলে দিতে পারে তার জন্য টেনে আনতেন লাপোড়িয়ার দৃষ্টান্ত। খরা ক্লিষ্ট একটি গ্রাম, যে গ্রাম থেকে বাঁচার জন্য মানুষ পালিয়ে যেত ৮০ কিমি দূরের জয়পুর শহরে। শহরে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করেও স্বপ্নেও ভাবত না গ্রামে ফেরার কথা, সেই গ্রাম কিভাবে ঘুরে দাঁড়ালো যৌথ উদ্যোগে, সে কথায় ফলাও করে বলতেন নিরুপমা। জনৈক লক্ষণ সিংহের নেতৃত্বে গ্রাম বিকাশ নবযুবক মন্ডল কিভাবে প্রাণ ফেরাল মৃত গ্রামে, সে কাহিনী অনুপ্রাণিত করার মতোই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গোচারণ ভূমিতে প্রাণ ফিরিয়ে লাপোড়িয়া হয়ে ওঠে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর। দুশ পরিবারের ছোট গ্রাম লাপোড়িয়া গ্রামের চাহিদা মেটানোর পরও জয়পুর ডেয়ারীকে যদি প্রতিদিন ১৬০০ লিটার দুধ বেচতে পারে তবে পুরুলিয়াই বা তা পারবে না কেন, সেই প্রশ্নটা উস্কে দিতেন নিরুপমা। অনুপম মিশ্রের 'গোচর কা প্রসাদ বাঁটতা লাপোড়িয়া'-র বাংলা অনুবাদও করেন নিরুপমা। 'লাপোড়িয়া একটি দৃষ্টান্ত' নামে সেই পুস্তিকা আশাবরী থেকে বের হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে।

পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী অযোধ্যা পাহাড়কে বাঁচানোর আন্দোলনেও সামিল হয়েছিলেন নিরুপমা। হুটমুরার হরিমতি বালিকা বিদ্যালয়ে জল সমস্যার সমাধানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সকে নিয়ে একটি রূপায়নযোগ্য প্রকল্প তৈরি করেছিলেন তিনি। গ্রীন স্কুল প্রজেক্টে পুরুলিয়ার ছোট্ট স্কুল রামকৃষ্ণপুর-এর বিজয়ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি চমৎকার প্রকল্প রচনা করে অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফান্ড, ইউনিসেফকে। জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে অজস্র সভা-সমিতি সেমিনারে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে চলছিল সাংবাদিকতা, লেখালেখি ও প্রকাশনার কাজ। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর আর একটি বই 'যেও না তুমি পরদেশ'। এটিও অনুপম মিশ্রের বিখ্যাত বই 'না যা স্বামী পরদেশা' বইটির অনুবাদ।

বিদ্যালয় নামের এক পত্রিকায় লিখেছেন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আশাবরী ও পরশমনি সংস্থাদ্বয়ের মাধ্যমে নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজেও অংশ নিতেন সক্রিয় ভাবে। বহু দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে অর্থ সাহায্য করে তাদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেছেন তিনি। বীরহোড় জনজাতি নিয়েও কিছু গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন তিনি। এতসব সামাজিক কাজের চাপে সময় পাননি সংসার পাতার। সামাজিক কাজকর্মকেই সাংসারিক কাজ বিবেচনা করে জীবনভর সেই দায় পালন করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর সামাজিক কাজকর্মের স্বীকৃতিতে ২০০৩ এ আলওয়ার রাজস্থান থেকে পেয়েছিলেন পর্যাবরণ প্রেমী পুরস্কার। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর হিউম্যান ভ্যালু সংস্থার এনভিরণমেন্ট পুরস্কার। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ দুঃসহ করোনা কালে

শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মাত্র ৫৯ বছরে প্রয়াত হন পুরুলিয়ার অবিস্মরণীয় জলদিদি নিরুপমা। তাঁর মৃত্যুর পর জি এন মুখার্জি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট তাঁকে মরণোত্তর জি এন মুখার্জি স্মারক সম্মানে ভূষিত করে।

শুধু এই চারজনই নয় বা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীজুড়ে, নানা কোনায় কোনায় জল সংরক্ষণ নিয়ে অসাধারণ কাজ করে চলেছেন কিছু স্বপ্নদর্শী মানুষ। তাদের কথা বলা যাবে অন্য কখনো, অন্য কোথাও।

## সহায়ক সূত্র


১। দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২৩ মার্চ, ২০১০।

২। আউটলুক, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

৩। দি ওয়াটারম্যান অফ রাজস্থান, ফ্রন্টলাইন, ১৮-৩১ আগষ্ট, ২০০১।

৪। দি গার্ডিয়ান, ৫ জানুয়ারি, ২০০৮।

৫। জলাভূমির যোদ্ধা ড ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ — দীপক কুমার দাঁ, এবং কি কে ও কেন, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮।

৬। যেন ভুলে না যাই (তৃতীয় খণ্ড) — প্রকাশ দাস বিশ্বাস, বহরমপুর, ২০২২।


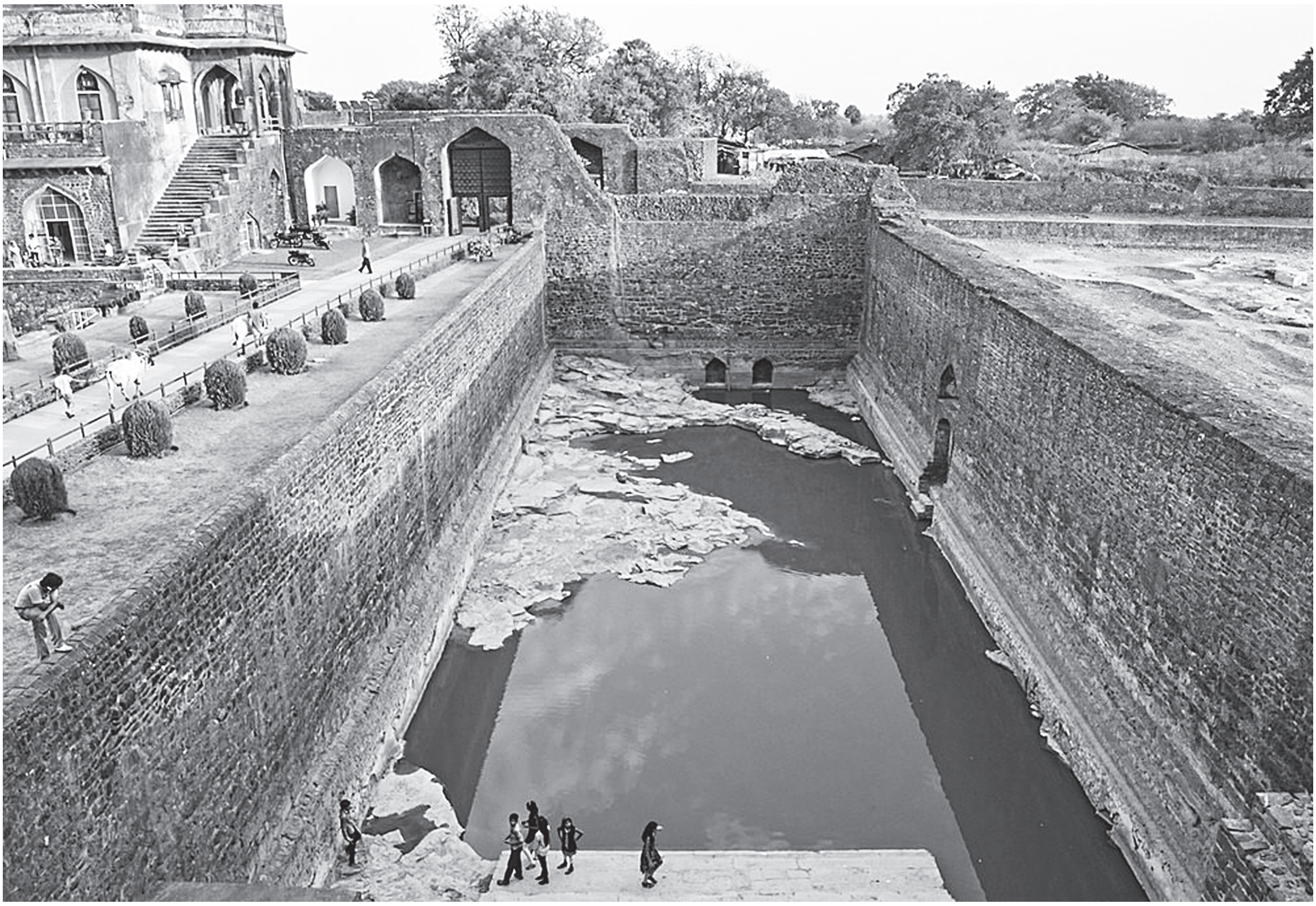

*প্রাচীনকালে জল সংরক্ষণের পদ্ধতি*

# কবিতা

জগন্ময় মজুমদার

## নতুন জল

রোদের সাথে হাওয়ার ঝগড়া হলে
জেতে রোদ, হারে না হাওয়া।
পোড়া শরীরের শ্বাসে প্রশ্বাসে হাওয়া আনে প্রাণ

মাটি এ গল্প জানলে জলের সঙ্গে তর্কে যেত না
বলতো না, আমি বড়ো।

জল মোটেও সরল নয়, বলে,
আমার অন্য নাম জীবন, জীবন কিন্তু জটিল।

ওদিকে মরুৎ এবং ব্যোম দুই ভাই বোন
একটি বোতল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে।

বোন বলছে, ওই জল খাবি না তুই, বাসি জল
ভাই বলছে, দিদি, তুই কিছুই জানিস না
ভূগর্ভের সবচেয়ে নীচের জল সবচেয়ে পুরোনো
এবং নূতন
যা আমরা প্রতিদিন করি পান।

মো. : ৯৪৩২৫২৩৮৯০

বিজ্ঞানবন্ধু ভট্টাচার্য

## বলতো দেখি

সেদিন হঠাৎ সকালবেলা ঘুম ভেঙেছে সবে
বলছে বাবা 'দাঁড়াও এবার মজাটা টের পাবে',
কিসের মজা! কেমন মজা! ভাবছি মনে মনে
মা চেঁচালো— 'বলছো কী-সব কথা অলক্ষুণে'!
অলক্ষুণে নয় গো, শোনো বলছি সেটাই যা বাস্তব
দেখতে থাকো, নেই বেশি দিন উঠবেই কলরব।
এখনো তাও সহজে পাও আর তো পাবে না
কদিন পরেই চাপড়ে কপাল রইবে বেদনা।

কচলিয়ে চোখ চেষ্টা করি কথাগুলো বুঝতে
বলছেটা কি বাবা আমার! চাইছি কারণ খুঁজতে।

'চৈত্র সবে শুরু হলো, দারুণ দহন দিনগুলোতে
হবেই হবে জলের অভাব দেখবে কেমন চারদিকেতে!
মাটির তলায় জল নেই আর নিচ্ছে শুষে বহুজাতিক
তোমরা পাবে মরুভূমির শুকনো বালি সেই চিকচিক!'

'বাঁচতে যদি চাও এখনই জল অপচয় বন্ধ করো
সম্পদের-ই মতো করে,জল ধরো আর জল-ই ভরো।
জঙ্গল আর জলাশয়-ই সঞ্চিত সেই জলের আধার
জল না পেলে বাঁচবে নাকি!যতই থাকুক অঢেল খাবার!
আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী আমরা সবাই
এখনো কি থাকবে নীরব! চলো সবাই রুখে দাঁড়াই'।

মো. : ৯৮৩১০৩১৬৪১

সুনীল শর্মাচার্য

## প্রকৃতি ও জল

প্রকৃতি ছেড়ে মানুষ যেতে পারে না,
নদী, পাহাড়, বন ঘিরে অস্তিত্ব!
জল ফুরিয়ে গেলে গাছপালা, জীব শূন্য!
হাহাকার ওঠে; জল একান্ত জীবন...
অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন
মিলেমিশে আমাদের বাঁচার উপকরণ;
পৃথিবীতে জল বেড়ে যায়, পানীয় জল কমে
প্রকৃতির গহন কোণে ধরে আছে

মো. : ৯০৩৮৪৪৪৬২৩

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

## মেঘের মর্জি

আমি এবার কৃষ্ণবর্ণ ছেড়ে
ফর্সা মাখব
আষাঢ়েই আসব কি না
কথা দেব না
শ্রাবণকেও খরা ঘোষণা
করতে পারি—
মর্জি হলে খুব ভেজাবো
অসময়ের জলে:

মানুষও শিখে নেবে খর রোদের ক্রিম
তার গায়ে কবেই তো লেগে গেছে
আত্মরতির তাপ—
সে প্রপাতের শরীর ঘেঁষে গড়ে তোলে
সুখচর শীতল আবাস:
প্রপাতও দু'দশ পা দৌড়ে গিয়ে
গলা শুকিয়ে কাঠ!

সর্বত্র আগুন জ্বলে
জলের শুশ্রূষা নেই আর

মো. : ৯৮৩৬৯৩১৯৩৫

অমৃতাভ দে

## ধ্বংস দেখে এই পৃথিবীর

এই পৃথিবী উষ্ণ হলে
আমরা কি আর বাঁচব তবে?
প্রবল ঝড়ে, জলোচ্ছ্বাসে
এই পৃথিবী ধ্বংস হবে।
ধ্বংস হবে তোমার আমার
এই পৃথিবীর স্বপ্ন জানি
জেনেও তো বেশ খুব সহজেই
ধ্বংসকে আজ ডেকেই আনি।

গাছ কেটেছি বন কেটেছি
বাঁধ দিয়েছি নদীর বুকে
এসব যদি চলবে তবে
কেমন করে বাঁচবো সুখে?

অক্সিজেনের অভাব দেখো
জলের অভাব হবেও জানি
শুকনো নদী, শুকনো বিলে
ডুববে সবার স্বপ্নখানি।

যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ হবে
বলছে সবাই তীব্র স্বরে
জলের জন্য লড়াই হলে
বাঁচবে মানুষ কেমন করে?

জল যে জীবন,জল ছাড়া প্রাণ
কেমন করে থাকবে বলো
জল অপচয় বন্ধ করে
এই পৃথিবী বাঁচাই চলো।

বাঁচাই চলো স্বপ্ননদী
স্বপ্ন দেখুক ফুল-পাখিরা
বৃষ্টি ভিজুক লাজুক বিকেল
গল্প লিখুক জলপরীরা।

প্লাস্টিকে আর থার্মোকলে
এই পৃথিবী ভরাট হলে
খুব অসহায় বন্ধুনদী
চোখ বুজে কী থাকলে চলে!

কোথায় যাব? কোথায় যাব?
এই পৃথিবীর অসুখ ভারী
বিপদ জেনে, বিপদ দেখে
ভুলটা যেন বুঝতে পারি

বুঝতে পেরেও চুপটি করে
থাকছি বসে ঘরের কোণে
ধ্বংস দেখে এই পৃথিবীর
হাসবো আমি আপন মনে।

মো. : ৮৬৪০০৪৮১৪২

সু রা জ পা ল

# জীবনের জন্য জল

শৈশবে জেনেছিলাম, পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। বাল্যে জানলাম, তিন ভাগ জলের সিংহভাগই সমুদ্রের নোনাজল। মাত্র ২.৫ শতাংশই পানযোগ্য বা মিষ্টিজল। আরেক ধাপ পার কৈশোরে আবার পড়লাম, পানযোগ্য জলের ০.৩ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জল, যা সহজলভ্য জলাভূমি-পুকুর-খাল-বিল-হ্রদ-নদী-নালায় পাওয়া যায়। গায়েগতরে যত বেড়ে উঠেছি জল নিয়ে নতুন নতুন তথ্যে জলের গুরুত্ব বুঝতে শিখেছি, হয়েছি জল সচেতন। সামিল হয়েছি জল বাঁচানোর লড়াইতে। বিজ্ঞান বলে, জীবদেহের ৬০ থেকে ৯৫ শতাংশই জল। পৃথিবীর প্রাণের সৃষ্টিও জলে, তাই জলই জীবন। কিন্তু এই জলের যোগান তো আর অফুরন্ত নয়। বৃষ্টির জলে বছর বছর যতখানি পূরণ হয়, তার চেয়ে বেশি হারে খরচ করলে ভূগর্ভস্থ জল ফুরিয়ে যেতে বাধ্য। এই অভিজ্ঞতা খরাপ্রবণ অঞ্চলের মানুষ মাত্রই জানেন। বছর কুড়ি আগেও জল সংকট বোঝাতে রাজস্থান কিংবা আফ্রিকার উদাহরণ টানা হত। আজ ঘরের কাছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মা-বোনেদেরও জল সংগ্রহে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হচ্ছে। শহরের দিকে দেখলে জলের পাত্র নিয়ে পৌরসভার ট্যাঙ্ক আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে সাধারণ মানুষ। মফঃস্বল ও গ্রামগুলোতে আর্সেনিক-ফ্লোরাইড দূষণের মাত্রা এতটাই বেড়ে গেছে পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা বেআইনি জারের জলই ভরসা। মুদিখানা দোকান থেকে ওষুধের দোকান, বাস-ট্রেনে নানা কোম্পানির বোতলজাত জল গ্যাঁটের কড়ি খসিয়ে গলধঃকরণ করা এখন যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অথচ পঞ্চাশোর্ধ কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন, প্রত্যেকেই বলবেন, জল যে কখনো কিনে খেতে হবে এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। পানের জলের পাশাপাশি স্নান-রান্নাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জলও যদি কিনতে হয় তাহলে কী হতে পারে একবারও ভেবেছেন? কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান করার সময় কখনও কি ভাবছেন আপনি যেটা অবিবেচকের মতো ব্যবহার করছেন সবটাই পানীয় জল। দৈনিক কতখানি জল খরচ করছি, আমরা কি তার আদৌ কোনো হিসেবে রাখছি?

জল সংরক্ষণের বার্তা জনমানসে ছড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন সময়ে চমৎকার কিছু বই, পত্রিকা, পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কোনোটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কোনোটি যৌথ উদ্যোগে। এরকমই কিছু বইয়ের সঙ্গে স্বল্প পরিসরে পরিচয় করিয়ে দিতেই এই লেখা। প্রথমেই মনে আসে, এভেনেল প্রেস থেকে প্রকাশিত দেবাশিস সেনগুপ্ত, পরমেশ গোস্বামী ও কল্যাণ রুদ্রের লিখিত "জল" বইটি-র কথা। ২৭৮ পাতার বইটি শুরুই জল সংকট দিয়ে। যেখানে বলা হয়েছে, জনসংখ্যার চাপ নয়, জলের অপচয়ই জল সংকটের মূল কারণ। বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা বেড়েছে চার গুণ, অথচ জলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে আট গুণ। বইটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলসম্পদের পরিমাণের অনবদ্য একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভারত ও প্রতিবেশী দেশগুলোর বাৎসরিক প্রাপ্তিযোগ্য জলের পরিমাণ ও মাথাপিছু জলের পরিমাণের দিকে চোখ বোলালে দেখা যায়, মাথাপিছু হিসেবে ভারতবর্ষের অবস্থা মোটেই নিরাপদ জায়গায় নেই। চিনের অবস্থাও খুব একটা স্বস্তির নয়। রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদের ভিত্তি বৃষ্টিপাত। তবে সারাবছর বা রাজ্যের সর্বত্র বৃষ্টিপাত তো একরকম হয় না। আবার, যেটুকু বা বৃষ্টিপাত হয় তার বেশিরভাগটাই সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে বয়ে যেতে দেওয়া হয়। এর মধ্যেও সবচেয়ে বেশি জল ধরে রাখে যে জেলাটি সেটি পুরুলিয়া। সারণী থেকে আরেকটা আকর্ষণীয় জিনিস দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি জেলাতেই অভ্যন্তরীণ জলের

তুলনায় উজান থেকে বয়ে আসা জলের পরিমাণই বেশি। কিন্তু উজান থেকে বয়ে আসা জল তো আর জেলার সর্বত্র পৌঁছতে পারে না। ফলে অভ্যন্তরীণ জলসম্পদই প্রয়োজনে প্রধান ভূমিকা নেয়। সেদিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘ কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভের জলে সেচের কাজে ব্যবহার এত বেশি হারে বেড়েছে যে জলভাণ্ডার দ্রুত ক্ষয় হয়ে চলেছে। অধিকাংশ ব্লকেই ভূগর্ভের জলতল অনেকটা করে নেমে গেছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর হলেও সেখানেও শুখা মরশুমে জলের অভাব টের পাওয়া যাচ্ছে।

বাঁধ ও নদী প্রকল্পের ইতিহাস, বাঁধের রকমফের, বাঁধ থেকে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, বাঁধের কারণে উচ্ছেদ-বন্যা-বিপর্যয় প্রত্যেকটি বিষয় ধরে ধরে এতটাই সহজ সরল ভাষায় সবিস্তারে ছবিসহ এ বইতে বর্ণনা হয়েছে যেকোনো বয়সের পাঠকের কাছেই তা সহজে বোধগম্য হয়। সাধারণত বাঁধ দেওয়া হয় চারটি উদ্দেশ্যে—জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল বিক্রি, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। বাঁধের ফলে পূর্বে যেখানে কৃষিকাজ হত না সেখানে ধান-গম ফলছে, বিদ্যুৎহীন স্থানে আলো পৌঁছচ্ছে এটা যেমন ঠিক, উল্টোদিকে বাঁধ নির্মাণের বিশাল খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, উচ্ছেদ হওয়া মানুষের ক্ষতিপূরণ মিলিয়ে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হচ্ছে অনেক বেশি। একে তো নদী তার অবিরাম গতি হারাচ্ছে। দুই, বাঁধ দেওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই পলির কারণে জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। প্রথমে বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি থাকলেও পলি বৃদ্ধির জন্য কয়েক বছরেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এমনকি যখন খরা মরশুমে জল প্রয়োজন তখন জল পাওয়া যাচ্ছে না আর বর্ষায় বাঁধগুলো কৃত্রিম বিধ্বংসী বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলো তো আমাদের মতই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, নিজের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া শুধু তো তাদের জীবন-জীবীকার সংকট তৈরি করছে না, মনটাও মরে যাচ্ছে। আমরা জানি, আদিবাসীদের অনেকেরই বাসস্থানের কাগজপত্র থাকে না, কোথায় কিভাবে নাম নথিভুক্ত করতে হয়, ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের রাস্তা কী সে খোঁজ তারা পায় না, ফলে ক্ষতিপূরণও পায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলো অনভ্যস্ত জীবনযাত্রায় নানা রোগের শিকার হচ্ছে। ঠিক এইজন্যই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো বড় বড় বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে আর আমাদের এখানে নতুন নতুন বাঁধ তৈরি হচ্ছে বা খাতা-কলমে পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে। বইটিতে ডিভিসি, ফরাক্কা, তিস্তা এবং নর্মদা ব্যারেজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে দেখানো হয়েছে, প্রতিটি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজ হুগলি নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। নদীখাত পলিমুক্ত হওয়া তো দূরস্থান, বরং পলি জমার হার বেড়েছে। যার জন্য দুই বাংলাকেই কঠিন মূল্য চোকাতে হচ্ছে। ডিভিসি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তিস্তার অবস্থাও তথৈবচ। সেচ ও পানের জলের মাধ্যমে যে বিশাল এলাকার কল্যাণের কথা বলা হয়েছিল সর্দার সরোবর প্রকল্পের প্রস্তাবে, এখন বোঝা যাচ্ছে তা অলীক ছিল। যেটুকু বা উপকার হচ্ছে তার ফলটা সবটাই পাচ্ছে অর্থবান মানুষ। যারা অর্থের ব্যবস্থা করতে পারছে রাষ্ট্র তাদেরই জলের ব্যবস্থা করছে। নদী সংযুক্তি আসলে যে নদীর সর্বনাশ, দেশের সর্বনাশ, জীবজগতের সর্বনাশ সে নিয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা এই বইতে স্থান পেয়েছে।

জল ব্যবহারের নিরিখে কোন দেশ কার্যত কোন অবস্থায় আছে তা দেখাতে সবচেয়ে বেশি জল ব্যবহারকারী কয়েকটি দেশের তালিকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ভারতবর্ষ। কৃষি, শিল্প ও গৃহস্থালী তিন ক্ষেত্রেই সারা পৃথিবী জুড়ে জলের ব্যবহার কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। সারণীতে দেখা যায়, কৃষিতে সবচেয়ে বেশি জল ব্যবহার করে ভারতবর্ষ, শিল্পে আমেরিকা আর গৃহস্থালির কাজের চিন। একটা বিষয় পরিষ্কার, গড়ে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য ধন জলের খরচও বাড়ছে। ওদিকে চিনদেশে দীর্ঘদিন ধরে জোরদার উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে সেখানে জনসম্পদের কি অবক্ষয় ঘটেছে তার বিবরণও এখানে রয়েছে। কৃষিতে জলসেচ, নগর ও উন্নয়নে জল, বেসরকারি জল ও বোতল, জল নিয়ে বিরোধ—প্রতিটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বইটিতে করা হয়েছে। বাদ পড়েনি জল নিয়ে ভারত সরকারের নীতির পর্যালোচনাও। যেমন, প্রথম জল নীতিতে ১৯৯১ সালের মধ্যে সকলের জন্য পানীয় জলের সুব্যবস্থা করার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা সবাই জানি। এত লেখার মধ্যে সবচেয়ে মনে ধরে ভারতের লোকায়ত জ্ঞান নিয়ে লেখাটি। ভাবতে অবাক লাগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করে যেখানকার মানুষরা জল সংরক্ষণ করে এসেছিল, আজ সেখানেও বড্ড জল সংকট। লাদাখে জিং, হিমাচলে কুল, রাজস্থানের খাদিন বা কুণ্ড বা রাপাট, গুজরাটের ভির্দা, মহারাষ্ট্রে বান্ধারা, কর্ণাটকে কাট্টে—তালিকা দীর্ঘ। এই ঐতিহ্যবাহী জলসংরক্ষণ পদ্ধতিগুলোই আমাদের জিয়নকাঠি কিন্তু এই কৌশলগুলো সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি বা কাজে লাগাচ্ছি। শুধু জল সমস্যা তুলে ধরা নয়, জল সমাধানের পথও বাতলে দেওয়া হয়েছে বইতে। সরকারিভাবে কী কী করা সম্ভব, ব্যক্তিগতভাবে আমরা কী কী করতে পারি, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো কী কী উদ্যোগ নিতে পারে সবটাই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একেবারে শেষের উল্লেখপঞ্জি এই বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যা বইটির প্রামাণিকতা বহুলাংশে বাড়িতে দেয়, আগ্রহীরাও আরও জানার-পড়ার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় বইটি জলের মেয়ের জলদর্শন যাত্রার নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে। এই যাত্রা শুরু হয়েছিল দিল্লির গান্ধী পীস ফাউন্ডেশন থেকে, শেষটাও সেখানেই। উদ্দেশ্য রাজস্থান ও গাড়োয়াল—এই দুই জায়গার লোকায়ত জল সংগ্রহ ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা দেখা এবং শেখা। জলযাত্রাটির আয়োজক ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন। এশিয়ার সাতটা দেশসহ ভারতের প্রতিনিধি মিলে মোট ৩৫ জন এই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। এঁদেরই একজন জয়া মিত্র। কৃষিপ্রধান প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে মৌসুমী জলবায়ুর দেশের মানুষরা বহুকাল ধরেই বৃষ্টির জলকে অত্যন্ত কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করার কৌশল জানতেন। এইসব উপায়গুলির কোনোটিই পরিবেশকে অথবা মনুষ্যজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তৈরি হয়নি বরং প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মের অন্তর্গত থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের এক অকল্পনীয় বড় দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু বর্তমানে দ্রুত নগরায়ণ, জল নষ্ট, নদী মজিয়ে ফেলা, কৃষি ও শিল্প সাম্রাজ্যবাদীদের ভূতলজল কুক্ষিগতকরণের কারণে শহরের পাশাপাশি গ্রামেও তীব্র জলাভাব দেখা যাচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়েই চেষ্টা চলছে বিকল্প জল ব্যবস্থা খুঁজে বের করার, সেই উপায় আবিষ্কারের—যাতে পরবর্তী প্রজন্মকে জলহীন, কৃষিহীন পৃথিবীতে থাকতে না হয়। এমন দিন যেন না আসে যখন চালের চেয়ে পানীয় জলের দাম বেশি হয়ে যায়।

কোথাও কোথাও গ্রামের মানুষ এখনো নিজের প্রাচীন জল সংরক্ষণের উপায়গুলো ভোলেনি। প্রাচীন অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ গ্রাম সমাজের এই সদস্যদের কাছের জয়া মিত্র গেছেন, শুনেছেন তাদের নিজস্ব সক্ষম জল পরিচালন ব্যবস্থার প্রকৌশলগুলি, আর তারপরেই লিখে ফেলেছেন চমৎকার বইখানা। অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে মায়াময় ভাষায় লেখা জলযাত্রার ভ্রমণ কথা পড়ে নিজেরও মানস ভ্রমণ হয়ে যায়। এতটাই তার আবেদন, আকর্ষণ। এ বই দেখায় বৃষ্টির জল সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে ভারতের জলের সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বলা হয়, রাজস্থান জলাভাবের দেশ। পাহাড়ি কাঁকুরে এই অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টিপাত কম। বছরে ২৫০-৩০০ মিলিমিটারের বেশি নয়। আবার সেই বৃষ্টির পুরোটাই হয়ে যায় এক-দেড় মাসের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার মানুষরা সেই কবে থেকে জোহড়, জোহড়ি, তালাব গড়ে তুলে তাদের জলের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে এসেছে। রাজস্থানী ভাষায় বৃষ্টিকে বলা হয় বুঁদ—বিন্দু, ফোঁটা। জল এতখানিই দুর্মূল্য, মহার্ঘ্য যে প্রতিটি বিন্দুকে আলাদা আলাদা স্বীকৃতি দিয়েছে তারা। বৃষ্টির প্রতিটি ফোটাকেই উবে যেতে বা গড়িয়ে যেতে না দিয়ে পরম যত্নে কুয়োতে সংরক্ষণ করেছেন। আমাদের এদিকে যেমন জল ভালো রাখার জন্যে কুয়োর মুখ খোলা রাখার নিয়ম, ওখানে কড়া সূর্যতাপে যেন জল শুকিয়ে না যায়, তাই কুয়োর মুখ ঢাকা দেওয়াই বিধি। লক্ষ্ণ সিং, গোপাল সিং, মঞ্জু প্যাটেল, গোদাবরী দেবী, সচিদানন্দ ভারতী-র মৃত জলাশয়-নদী-বনভূমি বাঁচিয়ে তোলার গল্প প্রেরণা দেয়। নিজের পার্শ্ববর্তী জলাশয়গুলির ইতিবৃত্ত জানার, বাঁচানোর আগ্রহ-উৎসাহ তৈরি করে। এ বই থেকেই জেনেছিলাম জলমানব অনুপম মিশ্রের কথা। পড়েছিলাম তাঁর "আজ ভি খারে হ্যায় তালাব", "রাজস্থান কি রজতবুঁদে" গ্রন্থ দুখানি। আশাবরী থেকে বইদুটির বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে। এছাড়া লোকনদী থেকে "অনুপম : এক সহজ জীবনের ভাষ্যকার" শিরোনামে একটি বইও আছে। গাড়োয়াল অঞ্চলের মানুষের আগুন দিয়ে আগুন নেভাবার ব্যবস্থা অবাক করে। আবার ঝর্ণা বলতেই আমরা পাহাড়চূড়ার বরফগলা জলের ধারা বুঝি। কিন্তু খুব উঁচু পাহাড়চূড়া ছাড়া, অধিকাংশ ঝর্ণাগুলিই যে বৃষ্টির জলে পুষ্ট তা কজন জানি। হিমালয়ের সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা, সমস্যা সবটাই উঠে আসে লেখিকার কলমে। তবে সবচেয়ে মনে ধরে গ্রামীণ আন্তরিকতা, সাদাসিধে জীবনধারা।

তৃতীয় বইটির মলাটে "বিপন্ন পরিবেশ" লেখা হলেও, নাগরিক মঞ্চ থেকে প্রকাশিত বইটির সব কথাই জল নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী থেকে ভারতের জলনীতি, কলকাতার পুকুর থেকে জেলার আর্সেনিক সবটাই বিরাট পরিসরে ধরা হয়েছে। জলসংকট, জলদূষণ ও জলের আইনের কথা তো আছেই। পশ্চিমবঙ্গের নদী অববাহিকা/উপ-অববাহিকায় মোট জল সম্পদের জোগান ও মোট ব্যবহারযোগ্য জল সম্পদের পরিমাণ কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালী ধরে ধরে দেখায় পীযূষ কান্তি বসুর লেখাটি। জলসম্পদের ভাগবাটোঁয়ারা নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের জল রাজনীতি"র কথাও এ বইতে বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাস বলে, প্রায় হাজার পাঁচেক পুকুরের শহর কলকাতা। অথচ পরিবেশ, নগর পরিকল্পনা, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যায় পুকুর নিয়ে চর্চা একেবারেই অনুপস্থিত। মোহিত রায়ের কলকাতার পুকুর শিরোনামের তথ্যসমৃদ্ধ লেখাটি এ বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। পুকুর পাড়ের মৎস্যজীবীদের জীবন ও পুকুরের অর্থনীতি আলোচনার পাশাপাশি পুকুর নিয়ে আন্দোলন, পুকুর সংক্রান্ত আইন কানুন ও প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের খোঁজখবরও এখানে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে "কলিকাতা পুকুর কথা" শিরোনামে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে মোহিত রায়ের একটি গবেষণামূলক বইও বেরিয়েছে। কলকাতার জল ও পৌরসভা নিয়ে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের লেখাটিও চমকপ্রদ। এই বইয়ের ভূ-জলে আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে লেখাগুলো সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। আর্সেনিক নিয়ে মোট তিনটি লেখা আছে, প্রতিটি লেখায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগণার ২২ ব্লকের ২১টিই, নদীয়ার সবগুলি ব্লকই আর্সেনিকপ্রবণ। ফলে ধান-সব্জি সবেতেই আর্সেনিক ছড়াচ্ছে। শঙ্কর রায়ের পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক আক্রান্ত ব্লকগুলির তালিকাটি রাজ্যের ভয়াবহ চিত্রটি তুলে ধরে, ভাবায়। শঙ্করবাবু সহজ উপায়ে আর্সেনিক সমস্যা মোকাবিলা করার বেশ কিছু নিদানও দিয়েছেন। জয়দেব দে দীর্ঘ সময় ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর লেখাটিতে অত্যন্ত সহজভাবে আর্সেনিক কী, আর্সেনিক দূষণের লক্ষণ কী, কী, আর্সেনিকের বিপদ, বাঁচার উপায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। জলে আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয়কারী বেশ কিছু সংস্থার নাম, যোগাযোগ নাম্বার তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে আর্সেনিক নিয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের মতামতও লেখাটিতে বর্ণিত হয়েছে। একদম শেষে রয়েছে সুপ্রিয় রায়চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ মুখার্জীর জলের আইন কানুন নিয়ে চমৎকার দুটি লেখা। নাগরিক মঞ্চ থেকেই "জলের কথা" শিরোনামে অনিন্দ্য ভুক্তের একটি পুস্তিকাও বেরিয়েছিল। সেখানে ফ্লোরাইড দূষণ নিয়ে সময়োপযোগী একটা লেখা আছে। লেখক বলেছেন, "ফ্লোরাইড আক্রান্ত রাজ্যগুলির নাম দেখলেই বোঝা যায় উন্নয়নের নামে কি অত্যাচার আমরা করেছি এই ধরিত্রীর উপর। ফ্লোরাইডের দূষণমুক্ত জল পেতে গেলে পুকুর বা নদীর জল বা নিতান্ত অগভীর নলকূপের জল ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

২০১৯-এর চেন্নাইয়ের জল সংকট আমরা দেখলাম। একটু দৃষ্টি প্রসারিত করলেই, দিল্লি-মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর সহ প্রতিটি বড় বড় শহরেই জলের ট্যাঙ্কারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন, আর মহল্লা যুদ্ধ আজ আর আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তথ্য বলছে, দেশের ৫০ শতাংশ নদীর জল পানযোগ্য নয়। শতদ্রু-যমুনা নদীর জল নিয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার বিরোধ চলছেই। অন্ধ্রপ্রদেশে ও তেলেঙ্গানার মধ্যে কৃষ্ণা নদীর জল নিয়ে অচলাবস্থাও অব্যাহত। এভাবেই জল সংকট বাড়তে থাকলে প্রথমেই আঘাত আসবে কৃষির ওপর, ভারতের ৬০ শতাংশ মানুষ যেখানে কৃষির ওপর নির্ভরশীল সেখানে জলের অভাবে প্রথমেই খাদ্য সংকট দেখা দেবে। ফসল কম হলে খাদ্যদ্রব্যের দাম হু-হু করে বাড়বে। শিল্প কারখানাগুলোতেও প্রভাব পড়বে। বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। জলবাহিত রোগ জন্ডিস, টাইফয়েড, ডাইরিয়া মহামারীর আকার ধারণ করবে। তাই প্রয়োজন জল সচেতন হওয়া, জল অপচয় রোধ করা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা, মিলেট জাতীয় খাদ্যশস্যের চাষ বাড়ানো এবং সবশেষে নদী-পুকুর-জলাশয়গুলি বাঁচিয়ে রাখা, অবিবর-নির্মলভাবে তাদের বইতে দেওয়া। মহাত্মা গান্ধী সেই কবে বলেছিলেন, 'প্রকৃতি প্রয়োজন মেটাতে দিয়েছে প্রচুর, লোভ মেটাতে নয়'। সুতরাং, আমরা 'প্রয়োজন' অনুসারে প্রকৃতিকে ব্যবহার করি, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হই, তার সঙ্গে মিশে থাকি।

# বাংলায় জল নিয়ে বই


১) জল। দেবাশিস সেনগুপ্ত, পরমেশ গোস্বামী ও কল্যাণ রুদ্র। প্রথম প্রকাশ—১ জানুয়ারি, ২০১৪। এভেনেল প্রেস।

২) জলের নাম ভালোবাসা। জয়া মিত্র। প্রথম প্রকাশ—কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০০১। বিনোদন বিচিত্রা পাবলিকেশনস্।

৩) জলের কথা। অনিন্দ্য ভুক্ত। প্রথম প্রকাশ—কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০১৮। নাগরিক মঞ্চ।

৪) আজকের গাঙচিল পত্রিকা : জল। প্রথম প্রকাশ—মার্চ, ২০২০। গাঙচিল।

৫) জীবনের জন্য জল। সুনীতি কুমার মণ্ডল। প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর, ২০১৪। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

৬) বিপন্ন পরিবেশ : জল। প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি, ২০০৩। নাগরিক মঞ্চ।

৭) আজও পুকুর আমাদের। অনুপম মিশ্র। বাংলা অনুবাদ—নিরুপমা অধিকারী। প্রথম বাংলা প্রকাশ—মে, ২০০২। আশাবরী।

৮) রাজস্থানের রজত বিন্দু। অনুপম মিশ্র। বাংলা অনুবাদ—নিরুপমা অধিকারী। প্রথম বাংলা প্রকাশ—ফেব্রুয়ারি, ২০০৭। আশাবরী।

৯) কলিকাতা পুকুর কথা : পরিবেশ ইতিহাস সমাজ। মোহিত রায়। প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি, ২০১৩। আনন্দ পাবলিশার্স।

১০) নদিয়ার নদী সংসদ কর্তৃক প্রচারিত বুলেটিন নদী সংবাদ। খাল-বিল-পুকুর সংখ্যা। ৭ম সংখ্যা। প্রকাশকাল—২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪। সম্পাদক—সুপ্রতিম কর্মকার। প্রকাশক—জ্যোতির্ময় সরস্বতী, শ্রীমা মহিলা সমিতি, দত্তপুলিয়া, নদীয়া।

১১) মিষ্টি জলের সঙ্কট ও প্রতিকার। দীপককুমার দাঁ। মে, ২০২৩। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ।

১২) প্রকৃতির কিডনি জলাভূমি। সন্তোষকুমার ঘোড়ই। প্রথম প্রকাশ—১ জানুয়ারি, ২০০৯। পারুল প্রকাশনী।

১৩) পানি ও মানবাধিকার। মুহম্মদ ইদ্রিস। প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি, ২০১২। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট।

১৪) নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতায় ব্র্যাকের অভিযাত্রা : একটি সমাজ রূপান্তরের গল্প। মোঃ আকরামুল ইসলাম ও মিলন কান্তি বড়ুয়া। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩।

১৫) সামটা : আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত একটি গ্রাম। মনজুয়ারা পারভীন। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩।

১৬) নিষ্পলক : প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষ। ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০২৪।

১৭) বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার পুস্তিকা : জল দূষণ ও তার প্রতিকার। প্রথম প্রকাশ—২০১৯। বিজ্ঞান অন্বেষক, বিজ্ঞান দরবার।

১৮) জল নদী জীবন সঙ্কট। কম্পাস। ৫৯ বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩।

১৯) জলের নানা কথা। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ২০০৫।

২০) জলের নাম জীবন। কৃষ্ণা সেন। মীনাক্ষী পাবলিশার্স, ২০০০।

২১) কলকাতার জলাভূমি, পরিবেশ সমস্যা ও উন্নয়ন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯৯৭।

২২) লাভের জল লোভের জলপি। সাইনাথ ও অন্যান্য। মন ফকিরা, ২০০৬।

২৩) জল দূষণ। কমল চক্রবর্তী। ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৯।

২৪) ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার। ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, ১৯৮৩।

২৫) জল প্রতি ফোঁটায় মুনাফা। শান্তনু দে। এন বি এ-২০০৪।

২৬) জল সরবরাহ প্রযুক্তিবিদ্যা। নিহার কান্তি সামন্ত। অশোক পুস্তকালয় ১৯৮৭।

২৭) আমাদের জল সম্পদ। পথিক গুহ (অনুবাদ)। এনবিটি ১৯৮১।

২৮) জল বন্ধু সম্পাদিত এন সি এস টি সি, ২০০৭।

২৯) জল ও জলাশয়। বিকাশ রায় ও শিশির সেন। প্রগতিশীল প্রকাশক ২০১০।

৩০) জলের রূপকথা। মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ। পুনশ্চ ১৯৮৯।

৩১) জলের কথা। প্রতুলচন্দ্র। শরৎ বুক হাউস, ১৯৮৪।

৩২) জলের কথা। কল্যাণ সিংহ। প্রতিভা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫।

৩৩) জলের কথা। অমিত চক্রবর্তী। শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫।

৩৪) জল বন্টন নলের বিশ্লেষণ। দ্বারিকা নাথ ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৩।

৩৫) জল দূষণ, শোধন ও নিয়ন্ত্রণ। দ্বারিকা নাথ ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২।

৩৬) মাছ, জল ও মৎস্যজীবী (১ম)। ড. সূর্যেন্দু দে। গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ, ২০০৭।

৩৭) জীবনের জন্য জল। সুনিতী কুমার মন্ডল। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,২০১৪।

৩৮) জল, জলাশয় ও জলাভূমি। সুমিত দাশগুপ্ত ও প্রেমময় ঘোষ (স.)। মনফকিরা, ২০১৫।

৩৯) জল। চুণীলাল বসু। সাহিত্যসভা। কলকাতা, ১৯০০।

৪০) জল। ড. অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : সন্ধ্যা কর। রূপম, কলকাতা।

৪১) তরল দর্পণে সমাজের মুখ। অনুপম মিশ্র। অনুবাদ : জয়া মিত্র। আশাবরী, পুরুলিয়া, ২০০৯।

৪২) জলবাহিত রোগ। ডা. রণবীর পাল। নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন। কলকাতা, ১৯৮৭।

৪৩) স্বাধীন ভারতে নদনদী পরিকল্পনা। কপিল ভট্টাচার্য। ১৯৮৬।

৪৪) জল চিকিৎসা। সুভাষ চট্টোপাধ্যায়। কলেজস্ট্রিট, ১৯৮৮।

৪৫) জল ও সমুদ্র। শচীনাথ মিত্র। শ্রীভূমি, ১৯৮৪।

## লেখক পরিচিতি

১. **বিমান নাথ**, ব্যাঙ্গালোরের রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং গবেষক, 9448475597, nath.biman@gmail.com
২. **তপন সাহা**, পরিবেশ বিজ্ঞানী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা-এর সাথে যুক্ত ও বিজ্ঞানকর্মী, 9433022145, tsaha1958@gmail.com
৩. **রাহুল রায়**, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিবেশকর্মী, 9433575364, rayrahul2263@yahoo.com
৪. **অরুণ কুমার পাল**, জল দপ্তরের বাস্তুকার, 9434736966, arunmurshidabad@gmail.com
৫. **অজয় কুমার মজুমদার**, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, 8918824281, majumdarajay@gmail.com
৬. **প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত**, ভূতাত্ত্বিক ও গবেষক, বিজ্ঞান লেখক, 9433714509, sengupta_pradip@yahoo.com
৭. **এ. কে. এম. বজলুল হক**, শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক, বিজ্ঞান ভাবনা ও ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সদস্য, বিজ্ঞানকর্মী, 94749100007, leot0179@gmail.com
৮. **মানস প্রতিম দাস**, অনুষ্ঠান প্রযোজক, আকাশবাণী, কলকাতা, বিজ্ঞান লেখক ও সম্প্রচারক, 9830312654, setmanas2020@gmail.com
৯. **অনুপম পাল**, দেশজ ফসল সংরক্ষণ ও টেঁকসই চাষের প্রবক্তা, প্রাক্তন অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা (পি), কৃষি অধিকার, প:ব: ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, 9432256490, anupampaul99@gmail.com
১০. **অর্কজিৎ সেন**, মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও বিজ্ঞান প্রচারক, 9635643404, senarkajit557@gmail.com
১১. **অসীম বসাক**, শিক্ষক, অভিনব ল্যাবরেটরি প্রণেতা বিজ্ঞান কথক (আকাশবাণী), বিজ্ঞান সেবক, 'ঘরে ঘরে রসায়ন' একক অভিনেতা, 9432773785, asimkrbasak@gmail.com
১২. **সৌমেন বিশ্বাস**, বিজ্ঞান ও পরিবেশকর্মী, মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ, 9734052868, soumen.biswas.sbi.1961@gmail.com
১৩. **রাজা রাউত**, বিজ্ঞান ও পরিবেশকর্মী, বন্যপ্রাণ গবেষক, সহকারী অধ্যাপক কালিম্পঙ মহাবিদ্যালয়, জিলা কালিম্পঙ, 9474417178, rajarouthbhbl@gmail.com
১৪. **বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**, উপঅধিকর্তা, ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ, প: ব: সরকার, অ্যান্টিবায়োটিকের আনবিক গঠন নিয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি উপাধি পেয়েছিলেন, ২০১৮ সালে প্রয়াত হন।
১৫. **সূর্যেন্দু দে**, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, জেমো এন এন হাই স্কুল, মুর্শিদাবাদ, গবেষক-মাছ, জল, মৎস্যজীবী, 9474922569, surjendudey@yahoo.com
১৬. **ঋতুশ্রী চক্রবর্তী**, হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল, নবম শ্রেণির ছাত্রী
১৭. **শতাব্দী দাশ**, মুখ্য বিজ্ঞানী, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, satabdidas1965@gmail.com, 9875483121
১৮. **সায়ন ভট্টাচার্য**, সহকারী অধ্যাপক, পরিবেশ বিদ্যাবিভাগ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, 9830950351, sayan.evs@gmail.com
১৯. **সোমা বসু**, প্রাক্তন অধ্যাপিকা, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, নেপাল, বিজ্ঞান অনুষ্ঠান প্রযোজক, রেডিও কলকাতা, বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক ও গবেষক, 9123350656, writersoma25germany@gmail.com
২০. **তপন দাস**, প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, 8944996755, tdcob25@gmail.com
২১. **পারমিতা রাহা**, শিক্ষিকা ও প্রাবন্ধিক, 8637077853, paramitakabyageocob@gmail.com
২২. **সুদীপ্তি মিশ্র হালদার**, কর্মী, পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ সাগর, ফুলবাড়ি, 9635454186, sudiptihalder@gmail.com
২৩. **নয়ন মুখার্জী**, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সম্পাদক, প:ব: বিজ্ঞান মঞ্চ, পুরুলিয়া জেলা, 8918035150
২৪. **নিশা নস্কর, লাবনী সরদার, মুসকান মোল্লা, সৃজা মন্ডল, দিপায়নী সর্দার, ফারহিন পারভিন, আফ্রিনা খাতুন,** (বারুইপুর গার্লস হাই স্কুল, উ.মা., ষষ্ঠ শ্রেণি)
২৫. **বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়**, সমাজ ও পরিবেশকর্মী, 8420529966, biswajit.envlaw@gmail.com
২৬. **প্রবীর বসু**, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকর্মী ও ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক, 9830676330, prabirchandrabasu54@gmail.com
২৭. **সুশীল বিশ্বাস**, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অতিথি শিক্ষক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, 9433915014
২৮. **তাপস সরকার**, সহ-অধিকর্তা, ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিমাল হেলথ্ অ্যান্ড ভেটিরিনারি বায়োলজিক্যালস প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ, প:ব: সরকার, 8017402774, dr.tapassarkar@yahoo.com
২৯. **প্রদীপ কুমার দাস**, অধ্যাপক, প:ব: প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলকাতা, 9432642502, pkdaskolphy@gmail.com
৩০. **তুষার কান্তি নাথ**, বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, 9635547188, tushar_kly@rediffmail.com
৩১. **ভবানী প্রসাদ সাহু**, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বিজ্ঞান লেখক, 8777598939
৩২. **নির্মাল্য দাশগুপ্ত**, শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক, 9143889823, nirmalya.1958@gmail.com
৩৩. **সতীনাথ ভট্টাচার্য**, বিশিষ্ট চিকিৎসক, লেখক ও পরিবেশকর্মী, 9474479255, satinath208@gmail.com
৩৪. **দেবাশিস সেনগুপ্ত**, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে রাশিবিজ্ঞানের গবেষক ও শিক্ষক, পরিবেশের নানা বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন গত দুই দশক ধরে, 7044746200, shairiksengupta@gmail.com
৩৫. **প্রকাশ দাস বিশ্বাস**, আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় গবেষক, মুর্শিদাবাদ জেলাবিষয়ক একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, 8016847366, prakashdasbiswas@gmail.com
৩৬. **সুরাজ পাল**, গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, 7908435926, surajpal58585@gmail.com
৩৭. **রাজদীপ ভট্টাচার্য**, শিক্ষক, কবি ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, 9836569850, rajdipb5678@gmail.com
৩৮. **পান্না মানি**, বিজ্ঞান প্রচারক ও পরিবেশ কর্মী, 9433869718, mani7777pannalal@gmail.com
৩৯. **জগন্ময় মজুমদার**, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কবি ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, 9432523890
৪০. **বিজ্ঞানবন্ধু ভট্টাচার্য**, পরিবেশকর্মী ও শব্দশ্রমিক, 9831031641
৪১. **সুনীল শর্মাচার্য**, কবি ও প্রাবন্ধিক, 9038444623
৪২. **প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়**, পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, 9836931935
৪৩. **অমৃতাভ দে**, শিক্ষক ও কৃষ্ণনগর পরিবেশ বন্ধুর সদস্য, 8640048142

সৌজন্যে google

# রামসার সাইট : ভারতের জলাশয়গুলির তালিকা

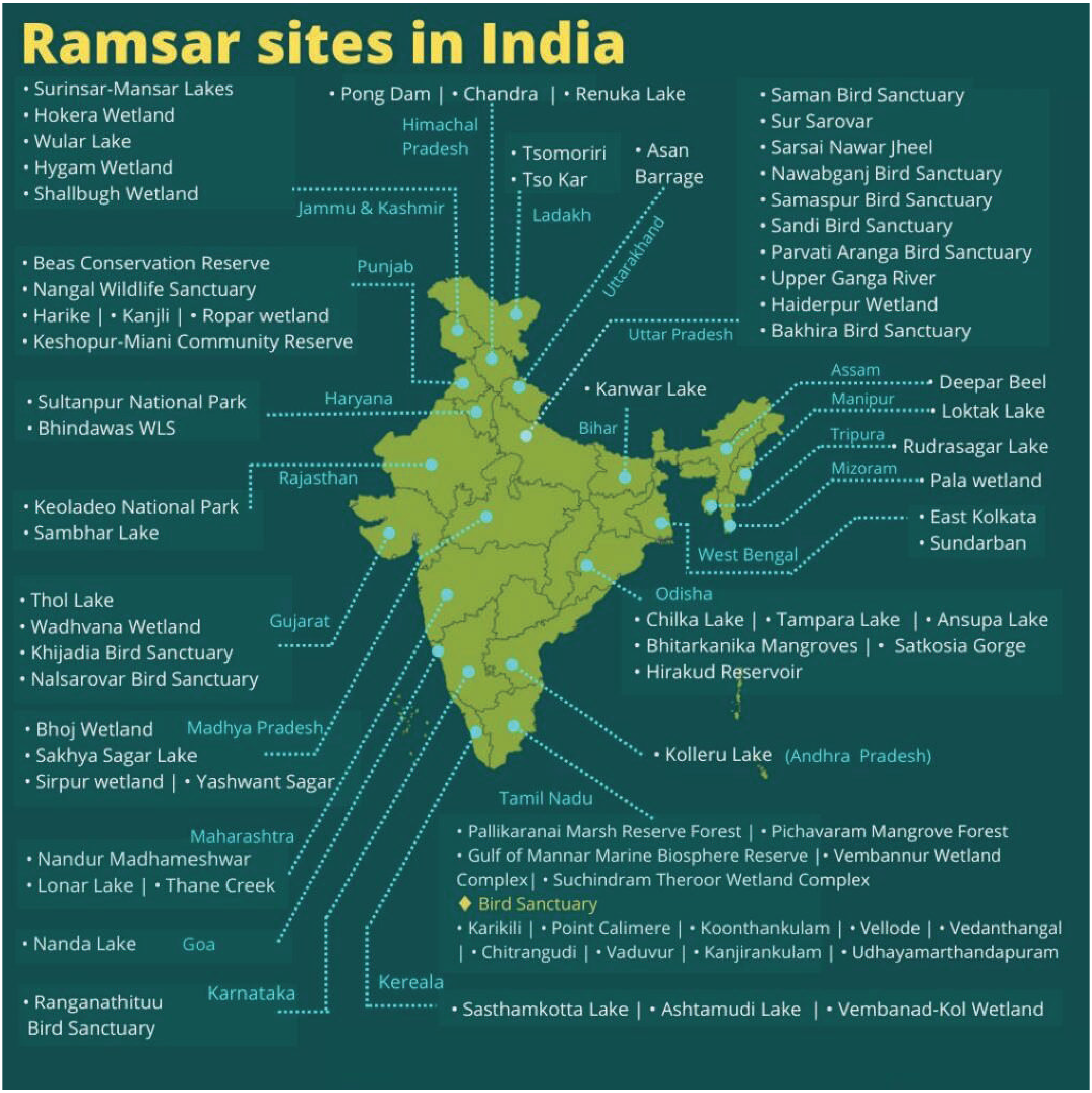

BIGYAN ANNESWAK VOL : 21 Issue No. 5,6 September - December 2024 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 100/-
ISSN 2582-5674

# প্রকৃতি সংরক্ষণের কয়েকটি বিকল্প ভাবনা

বৃষ্টির জল ধরে রাখার প্রয়োজন

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

মাজুলি লেক *(অসম, বিশ্বের সর্ববৃহৎ নদীদ্বীপ, ৩৫২ বর্গ কিমি.)*

গাছ, বনভূমি ও হিমালয় রক্ষা

ভূগর্ভস্থ জল তোলার বিপদ

প্যাংগং লেক — উচ্চতম লবণাক্ত হ্রদ, *(লাদাখ ৬৯৯.৩ বর্গ কিমি.)*